মুখর অতীত

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

বাণী-বিতান
৭৩।১এ, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি, এম্. এ.
৯৩।১।এ, বৈঠকখানা রোড্,
কলিকাতা

মূল্য দুই টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা

(ওঁ)

স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ

শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ ঘোষকে

আমার

"মুখর অতীত"

উপহার দিলাম।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১২, সিমলা ষ্ট্রীট,

১৯৪৫

মুখর অতীত

(১)

কলেজে যাইবার জন্য মিলি প্রস্তুত হইতেছিল, এমনই সময় পিয়ন আসিয়া একখানা পত্র লেটার বক্সে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

মাসীমা বারাণ্ডার এককোণে এতটুকু ঘেরা জায়গাতে রন্ধন করিতেছিলেন, পিয়নকে দেখিতে পাইয়া সোৎসুকে ডাকিলেন, "দেখ তো মিলি, কার পত্র এলো?"

এ ঘরের বাসিন্দাদের নামে পত্র প্রায় আসে না, তথাপি ঔৎসুক্য যায় না। মিলি তাড়াতাড়ি আসিয়া লেটার বক্স খুলিয়া এনভেলাপ বদ্ধ পত্রখানা বাহির করিল—দুই একবার এদিক ওদিক উল্টাইয়া দেখিয়া সে কভার ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিল এবং লেখকের নামটাকে আগেই দেখিয়া লইল।

পত্র লিখিয়াছেন মিলির জ্যেঠামহাশয় শম্ভুনাথ চৌধুরী, পাঁচ বৎসর পরে এই তাঁহার স্বহস্তে লিখিত পত্র। পারতপক্ষে তিনি নিজের হাতে কাহাকেও পত্র লিখেন না, বিশেষ আবশ্যক না হইলে তিনি কলমে হাত দেন না, অন্য কাহাকেও দিয়া লেখাপড়ার কাজ চালাইয়া লন। প্রতি মাসের দুই তারিখে নিয়মিতভাবে মিলির নামে যে পঞ্চাশটাকা করিয়া মনিঅর্ডার আসে সে লেখাও তাঁহার নিজের হাতের নয়, মিলি তাহা জানে।

মাসীমা বারাণ্ডা হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার পত্র এলো রে, কে কি লিখলে বল দেখি ?"

মিলি নিঃশব্দে পত্রখানা পড়িয়া গেল, তাহার মুখখানা বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল, পত্রখানা দুমড়াইয়া, মুচড়াইয়া সে বারাণ্ডায় মাসীমার পাশে ছুড়িয়া ফেলিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

মাসীমা অবাক হইয়া তাহার পানে খানিক তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর হাত ধুইয়া পত্রখানা কুড়াইয়া লইয়া সেখানাকে সমান করিলেন, খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যাওয়ায় একটা বর্ণও বুঝিতে পারিলেন না।

তিনি ডাকিলেন, "এ কার পত্র এলো রে মিলি, এমন করে মুচড়ে দুমড়ে ফেলে দিয়ে গেলি যে ?"

ঘরের ভিতর হইতে বিকৃতকণ্ঠে মিলি বলিল, "পত্র এসেছে গোকর্ণ হতে, জ্যেঠামণি অনেক দয়া করে নিজের হাতে পত্র লিখেছেন।"

মাসীমা আশ্চর্য্যভাবে বলিলেন, "এই তো পরশু দিনে তাঁর পাঠানো টাকা এলো, এর মধ্যে আবার পত্র লেখার মানেটা কি বুঝতে পারলুম না। তোর জ্যেঠামণি আজ পাঁচটা বছরের মধ্যে পত্র দেয়নি, আজকে নিজের হাতে বড় পত্র লিখলেন ?"

মিলি উত্তর দিল, "মানে আমার মাথা আর তোমার শ্রাদ্ধ মাসীমা—"

তাহার কণ্ঠ অবসাদগ্রস্ত অথচ বিরক্তিপূর্ণ।

মাসীমা তরকারির কড়াটা উনানের ধারে নামাইয়া রাখিয়া উঠিলেন, ঘরে দরজার পাশে উঁকি দিয়া দেখিলেন মিলি খাটের উপর শুইয়া পড়িয়া আছে।

মাসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, তুই শুয়ে আছিস যে বড়, কলেজে যাবি নে ?"

মিলি আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "না মাসীমা, আজ আর কলেজে যাব না, আর পড়াই যখন হবে না, আজ বাদে কাল পড়া যখন বন্ধ করতেই হবে, অনর্থক আর গিয়ে লাভ কি ?"

মাসীমা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, "পড়া হবে না কেন ? এই যে পড়া আছে বলে কোন সকালে কেবল ভাতে ভাত দিয়ে দুটো খেয়ে নিলি, তরকারি হওয়ার জন্যে পর্য্যন্ত দেরী করলিনে, তাড়াতাড়ি করে কাপড় জামা পরলি, এখনই আবার বলছিস—পড়া নেই,—অবাক করে দিলি যা হোক। তোর জ্যেঠামণির পত্রখানা এলো, কি লিখেছেন একবার পড়ে শুনাতে হয় তো,—আমি কি চোখে দেখতে পাই যে পড়বো ?"

মিলি উঠিয়া বসিল, বলিল, "ও আর পড়ে শুনাব কি, জ্যেঠামণি স্পষ্টই লিখেছেন আমার আর পড়াশুনো করে দরকার নেই, কারণ আমায় চাকরি করে খেতে হবে না। আর তিনি আমাকে এই মাসেই গোকর্ণে নিয়ে যেতে চান, এখানে আর রাখতে চান না।"

মাসীমা নীরবে অন্যমনস্কভাবে অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন ; মিলি উঠিয়া অর্দ্ধসমাপ্ত বেণীটাকে সমাপ্ত করিয়া লইল। কলেজে পড়া আর হোক বা নাই হোক, যে কয়দিন গোকর্ণে না যাওয়া হয় সে কয়দিন সে যাইবে। সুরমাদিকে একবার অবশ্য জানানো আবশ্যক—তাহার পড়া আর হইবে না, কলিকাতাতেও তাহার আর বাস করা চলিবে না, এখানকার সব শেষ করিয়া দিয়া সে চলিবে সেই দূর গ্রামে—যেখানে কেহই তাহার সাড়া পাইবে না।

কলিকাতার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ,—কথাটা মনে করিতেও চোখে জল আসে।

কোন্ সেই পল্লীগ্রাম—কবে সে দেখিয়াছে তাহা তাহার মনেও পড়ে না। যখন সে কলিকাতায় আসিয়াছে তখন সে নেহাৎ শিশু, চার কি পাঁচ

বৎসর মাত্র বয়স, তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই চৌদ্দ পনেরো বৎসর তাহার এই কলিকাতাতেই কাটিয়াছে। পাঁচ বৎসর বয়সে সে যে গ্রামে ছিল আজ তাহার কথা তাহার মনে নাই।

সেই গ্রামে আবার তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। যদি তাহার নিজের ক্ষমতা থাকিত, সে কিছুতেই গ্রামে ফিরিত না, জ্যেঠামণির পত্রের উত্তরে সে জানাইত সে গ্রামে যাইবে না, এখানেই থাকিবে। জ্যেঠামণিকে স্পষ্ট জানাইত—তাহাকে ছোটবেলা হইতে কলিকাতায় রাখিয়া, সহরের আবহাওয়ায় গড়িয়া তুলিয়া এখন পড়া বন্ধ করিয়া পল্লীগ্রামে ফিরাইয়া লইবার প্রস্তাব করা একেবারেই অনুচিত হইয়াছে।

এ কথা স্পষ্টভাবে জানাইবার ক্ষমতা আজ তাহার নাই। শিশুকাল হইতে সে এখানে আছে, জ্যেঠামণি প্রতিমাসে নিয়মিত টাকা পাঠান,—তবে তাহার খরচ নির্ব্বাহ হয়।

আট বৎসর বয়সে মিলি একবার তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়াছিল, উনিশ বৎসর বয়সে সেই মুহূর্ত্তের দেখা মানুষটিকে মিলি মনে করিতে পারে না। আজও সে কল্পনা করিল, মনে করিবার চেষ্টা করিল, একখানা পত্র লিখিবার জন্য ইচ্ছা হইল, কিন্তু হইয়া উঠিল না।

শেষ বিদায় লইবার জন্য সে আজ কলেজে গেল।

প্রফেসর স্থরমা দাস মিলিকে স্নেহ করিতেন, ভালোবাসিতেন। এই মেয়েটির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাঁহাকে তাহার পানে আকৃষ্ট করিয়াছিল, অনেকবার তিনি তাহাকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণও করিয়াছিলেন।

মিলির বিদায় লইবার কথা শুনিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন, বলিলেন, "আমার মনে হয়, তিনি তোমার বিয়ে দিতে চান, অবশ্য নিজের জাতি বর্ণের মধ্যে তোমার বিয়ে হয় সে ভালো কথাই, নচেৎ তোমাকে তিনি সম্পত্তি

হতে বঞ্চিত করবেন ; সেজন্যে হয়তো ভবিষ্যতে তোমায় অনুতাপও করতে হবে কম নয়। তবে আমার মতে বি. এ. ডিগ্রীটা নিয়ে বিয়ে করলেই ভালো হতো—কেননা তাতে তোমার পক্ষে যথেষ্ট উপকার—"

বাধা দিয়া মিলি বলিল, "তিনি বিয়ে দিতে চাইলেই আমাকে যে বিয়ে করতে হবে তার কোন হেতু নেই সুরমাদি।" আমি যদি বলি—বিয়ে করব না, তিনি জোর করে কিছু বিয়ে দিতে পারেন না, কারণ আমি তাঁর গাঁয়ের অশিক্ষিতা বা এতটুকু একটি মেয়ে নই। তাঁর বোঝা উচিত,—আমার উনিশ কুড়ি বছর বয়স হয়েছে, আমি সাবালিকা, ফোর্থ ইয়ারে পড়ি, কাজেই আমারও একটা স্বাধীন মত থাকতে পারে।"

শান্তকণ্ঠে সুরমা দাস বলিলেন, "নিশ্চয়ই, তবু কথাটা হচ্ছে কি—এই উনিশ কুড়ি বছর বয়সটাকে বিশ্বাস করতে প্রবীণেরা চান না, তাঁরা জোর করে প্রমাণ করবেন—এই বয়সটা অতি সাংঘাতিক—সোজা কথায় পাপ পুণ্যের সন্ধিক্ষণ বলা চলে। শিক্ষার অহঙ্কারটা মনে বিলক্ষণ জাগে অথচ বয়সটা থাকে যে কোনো পথে চলবার উপযুক্ত আবার হিতাহিত জ্ঞানটাও নাকি এ সময় থাকে না।"

মিলি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিও তাই বলেন ?"

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া সুরমা বলিলেন, "কেবল আমার মতামতের কোন মূল্য থাকতে পারে না মিলি। যদি বলি একদিন তোমারই মত বয়ঃসন্ধিক্ষণে আমিও ঠকেছি, তাতে নিশ্চয়ই তুমি আশ্চর্য্য হয়ে যাবে না। এই বয়সে যে ভুল আমি করেছিলুম, আজও তার জের বয়ে চলতে হচ্ছে, হবেও সারাজীবন তা আমি জানি। নিজেকে অসীম জ্ঞানী মনে করোনা মিলি, একদিন ঠকবে, সে ঠকা তোমার জীবনকে হয়তো কোনদিনই সুখশান্তিপ্রদ করতে পারবে না।"

মিলি কি বলিতে গেল, তাহাকে থামাইয়া দিয়া সুরমা বলিলেন, "না,

এতে তর্ক কোরো না। আমার কথা যদি শোন—বিয়ে কোরো, অনর্থক জীবনকে টানা হেঁচড়ার মধ্যে দিয়ে নিয়ে চলো না। আজকাল তোমাদের মধ্যে একটা ঢেউ এসেছে—বিয়ে করব না—এটা ভারি অন্যায়। মেয়েরা এমনি ধনুকভাঙ্গা পণ করে বলেই কেউ কেউ মেয়েদের উচ্চশিক্ষার দোষ দিয়ে থাকেন, সেটাকে নেহাৎ মিথ্যে বলা চলে না, মেয়েরা নিজেদের বুদ্ধির জন্যেই অপরাধিনী হয়। তোমারই মুখে শুনেছি তোমার জ্যেঠামণি নাকি মেয়েদের শিক্ষার বিরোধী ছিলেন, তোমার জিদে পড়ে তোমায় পড়বার অনুমতি দিয়েছেন। আশা করছি তাঁর মনের সেই সংস্কারটাকে বদ্ধমূল করে দেবে না, বরং তাঁকে দেখতে দেবে লেখাপড়া শিখে মেয়েরা দেশের দশের আর নিজের সংসারের কতখানি উপকার করতে পারে।"

মিলি বলিল, "কিন্তু আপনিতো বিয়ে করেননি সুরমাদি।"

সুরমা একটু হাসিলেন, সে হাসিতে আনন্দ ছিল না, ছিল বেদনা; তিনি বলিলেন, "আমার বিয়ে না করাটা তোমার পক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে পারে না মিলি। এমনও হতে পারে—কোন বিশেষ কারণে আমি বিয়ে করি নি, সেকারণ আমি তোমায় বলতে পারিনে। হয়তো এমন কোন দিন আসবে—যে দিন আমি নিজেই তোমায় জানাব, আজ তোমাকে জানানো আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। একথা শুধু জেনে রাখো—সকলেই কিছু জগতের উপকার করবার জন্যে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে না। এককালে হয়তো আমার মত অনেকেরই মনে সংসার পাতবার ইচ্ছা ছিল, জগতের নানা ঘাত প্রতিঘাতে সে আশা মরে গেছে। আনন্দের উৎসমুখে প্রকাণ্ড পাথর চাপা দিয়ে আমরাই চীৎকার করে বলি—বিবাহিত জীবন সুখের নয়, পরের অধীন হয়ে থাকতে হয়। লোকে সেকথা শুনে অবাক হয়ে আমাদের পানে চেয়ে থাকে,—আমাদের শিক্ষার নিন্দা করে, অথচ গোড়ার কথা কেউ জানে না।

একথা বলিতে বলিতে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন; হঠাৎ নিজকে সামলাইয়া লইলেন, বলিলেন, "যাক ও সব কথা, এখনই একখানা পত্র পেলেই কলেজ ছাড়বার দরকার নেই, হয়তো কোনরকমে কারও কথা শুনে পাড়াগাঁয়ের লোক—মাথা গরম করে বসেছেন। এখন যেমন পড়াশুনা করছো কর—ডিগ্রীটা নাও, তারপর যেয়ো।

বেচারা স্বরমাদি—

তাঁর মনে যে অনেকখানি বেদনা জমা হইয়া আছে তা তাঁহার কথাতেই বুঝা যায়, অথচ কেহ তাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিবে না।

নিয়মিত ক্লাস করিয়া মিলি বাড়ী ফিরিল।

(২)

জমিদার শম্ভুনাথ চৌধুরী।

একা তিনিই নহেন; বিশাল সম্পত্তি কয়েক ভাগে বিভক্ত হইয়া কয়েকটি জমিদার যাঁহারা গ্রামে আছেন, ইঁহাদের সকলের মধ্যে শম্ভুনাথ চৌধুরীর অংশ অনেক বেশী,—একাই তিনি অর্দ্ধাংশের মালিক, এবং গ্রামে তিনি বড়সরিক নামে খ্যাত।

শম্ভুনাথ চৌধুরীর ভ্রাতা আদিনাথ চৌধুরী, এই আদিনাথেরই একমাত্র কন্যা মিলি,—শম্ভুনাথের দেওয়া নাম মহামায়া, পত্রাদিতে তাঁহার দেওয়া নামই ব্যবহৃত হয়।

আদিনাথের নিজের অংশের সম্পত্তি কিছুই ছিল না, নানারূপ ব্যবসায় এবং মামলা মোকর্দ্দমায় জড়াইয়া পড়িয়া তিনি জীবদ্দশাতেই সমস্ত নষ্ট করিয়া ছিলেন এবং সেই সময়—কোনদিন যে শম্ভুনাথের কথায় কান দেন নাই, সেই শম্ভুনাথের দ্বারস্থ হন। শম্ভুনাথ ভ্রাতাকে ফিরাইয়া দেন নাই, তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রীকে তিনি আশ্রয় দেন।

অনেক চিকিৎসা সত্ত্বেও আদিনাথকে বাঁচানো যায় নাই। মিলি বা মহামায়ার বয়স যখন দুই বৎসর মাত্র, তখন আদিনাথ মারা যান। ইহারই তিন বৎসর পরে যখন মিলির মা মারা যান, তখন পাঁচ বৎসরের মেয়ে মিলিকে লইয়া শম্ভুনাথ মহাবিব্রত হইয়া পড়িলেন।

সংসারে স্ত্রীলোক কেহ নাই যে মিলিকে দেখাশুনা করে। শম্ভুনাথ এককালে বিবাহ করিয়াছিলেন, বিবাহের দুই বৎসর পরেই স্ত্রী মারা যান। চিরদিনের মুক্তিকামী মায়ের কথা রাখিতে বিবাহ করিয়াছিলেন মাত্র, স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, ইহার পরে আর কেহ কোনদিন তাঁহাকে বিবাহের কথা বলে নাই, শম্ভুনাথ স্ত্রীর মৃত্যুতে মুক্তিলাভ করিলেন।

সংসারে কোনদিনই তাঁহার আসক্তি ছিল না, পিতৃসম্পত্তি রক্ষা না করিলে নেহাৎ পিতৃকীর্ত্তিসমূহ নষ্ট হইয়া যাইবে সেই জন্যই তিনি ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলেন। মনে উদ্দেশ্য ছিল মিলি বড় হইলে তাহার বিবাহ দিয়া সংসারী করিয়া নিজে অবকাশ গ্রহণ করিবেন।

পাঁচ বৎসরের মেয়ে মিলিকে লইয়া তিনি অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার সম্পত্তির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী পিতৃপুরুষের কীর্ত্তিসমূহ অক্ষুণ্ণ রাখিবে যে তাহার ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ লক্ষ্য থাকিলেও এতটুকু একটী মেয়েকে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে মানুষ করা বা বাঁচাইয়া তোলাই তাঁহার পক্ষে বড় কষ্টকর হইয়াছিল। নিজের জন্য কোনদিনই তিনি চিন্তা করেন নাই, একান্ত পুরাতন ও বিশ্বস্ত ভৃত্য তারণের সেবা যত্নে তিনি স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইয়া দিতেন। সেই তারণ পর্য্যন্ত এই শিশুটিকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। কোন সময় তাহাকে খাওয়াইতে হয়, ঘুম পাড়াইতে হয়, মা মরা শিশুর আব্দার কিভাবে পূর্ণ করিতে হয়, সে সব না জানা থাকায় প্রভু ভৃত্য মহাবিব্রত হইয়া পড়িলেন।

অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল মিলির সম্পর্কীয়া এক বিধবা মাসীমা আছেন, তিনি কলিকাতায় থাকেন ও কয়েকটি ঠাকুর বাড়ীর কাজ করিয়া কোন রকমে নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। শম্ভুনাথ তাঁহাকে গোকর্ণে আনিবার প্রস্তাব করিলে তিনি রাজি হন নাই, অগত্যা বাধ্য হইয়া মাসিক পঞ্চাশটাকা দিবার অঙ্গীকারে শম্ভুনাথ মিলিকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অন্ততঃপক্ষে জমিদারি দেখাশুনার মত খানিকটা লেখাপড়া সে শিখিয়া লইবে তাহার পর তিনি তাহাকে গোকর্ণে ফিরাইয়া আনিবেন এই কথা রহিল।

মাসীমা তাহাকে স্কুলে দিলেন, সম্মানের সহিত সে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, আই, এ পাশ করিয়া একবৎসর বি, এ ক্লাসে পড়িবার পর হঠাৎ শম্ভুনাথ তাহাকে গ্রামে ফিরিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

মিলি জ্যেঠামণির আদেশ লইয়া পড়িতেছে, পড়ার খরচ নির্ব্বিবাদে তিনি বহন করিয়া চলিয়াছেন এবং চলিবেন। হঠাৎ যে তিনি এখন পড়া বন্ধ করিতে বলিবেন, এ-কল্পনা সে কোনদিন করে নাই, সেইজন্য সে যেন অকূলপাথারে পড়িয়া গিয়াছিল।

জ্যেঠামণি তাঁহার বর্ত্তমান ম্যানেজার নিমাইচন্দ্রকে কলিকাতায় পাঠাইতেছেন। নিজে তিনি কলিকাতায় আসিতে চান না, সেজন্য যখনই যে কোন দরকার পড়ে নিমাই বা আর কাহাকেও পাঠাইয়া দেন। নিমাই কলিকাতার কাজ সারিয়া আসিবার সময় মিলিকে লইয়া আসিবে, মিলি যেন আসার জন্য প্রস্তুত থাকে এ কথা তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন।

পত্রের উত্তর দিবার সময় থাকিলে মিলি লিখিত, কিন্তু তারিখ হিসাব করিয়া মিলি দেখিল—নিমাই পরশু দিনে কলিকাতায় আসিয়াছে, সম্ভব আজ বা কালই সে এ বাসায় আসিয়া পৌঁছাইবে।

গ্রাম্য জীবন যাপনে অনভ্যস্ত মিলি, গ্রামে যাইবার কথা শুনিয়াই সে অকূলপাথারে পড়িয়াছে।

জ্যেঠামণির উদ্দেশ্য তাহার বিবাহ দেওয়া—তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। পত্রের মধ্যেই নিমাইয়ের যে ভাবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তিনি করিয়াছেন তাহাতে অনুমান হয় তিনি তাহাকে বিশেষ রকম পছন্দ করেন।

নিমাইয়ের পরিচয়ও ছিল—

সে শম্ভুনাথের অকৃত্রিম বন্ধুপুত্র, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করিয়াছে। বরাবর তাহারা সুদূর পাঞ্জাবে কাটাইয়াছে, তাহার জন্মও পাঞ্জাবে, বাংলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলেও বাঙ্গালীর চালচলনে সে অনভ্যস্ত বলিলেই চলে। তাহার পিতৃপুরুষের নিবাস গোকর্ণে এবং সংসারে আছেন কেবল পিসিমা—যিনি তাহাকে মানুষ করিয়াছেন। বি. এ. পাশ করিয়া কিছুদিন সে কাজের চেষ্টায় বাহিরে ঘুরিয়াছিল, অবশেষে শম্ভুনাথ নিজেই তাহাকে জমিদারি কাজ শিখাইয়া তাহাকে ম্যানেজারের কাজে নিযুক্ত করিয়া নিজে ছুটি লইয়াছেন। তিনি নিজে এখন একটু ছুটি পাইয়াছেন, নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানের নাম করিতে অবকাশ পান। তবু তাঁহাকে সব ছাড়িয়াও জড়াইয়া পড়িতে হয়, কাগজপত্র দেখিতে হয়, প্রজাদের অভিযোগ শুনিতে হয়। তিনি সেইজন্যই মিলিকে আনিয়া তাহার উপর সব ভার ছাড়িয়া দিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে চান।

মিলির পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যায়।

তিনি ছুটি পাইবেন, আরাম পাইবেন, সেইজন্য মিলিকে পড়াশুনা ছাড়িয়া যাইতে হইবে সেই গ্রামে—যেখানে কেহ তাহাকে চিনিবে না, এমন কি সে নিজেও নিজেকে ভুলিয়া যাইবে। অভিমানে মিলির চোখে

জল আসে—তবে কি দরকার ছিল তাহার বি. এ পর্য্যন্ত পড়িবার—কি দরকার ছিল এত পরিশ্রম করিবার ?

মাসীমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন, চোখের জল মুছিয়া বলেন, "হাজার হোক—তিনি হচ্ছেন নিজের জ্যেঠা, আর আমি মাসীমা বই তো নই, তাও মায়ের আপন বোন নয়—জাঠতুতো বোন, আমার সঙ্গে তোর সম্পর্ক কিসের ? আমার যদি অবস্থা ভালো হতো—তা হলেও না হয় আমাকে মানুষ বলে গণ্য করা যেতো। হাতে করে মানুষই করি আর যাই করি, অবস্থা যখন ভালো নয়—তাঁরই হাততোলা দয়ার দান যখন নিতে হচ্ছে, তোর পরে আমার কিসের অধিকার আছে মিলি ?"

মিলি উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

বেচারা মাসীমা দরিদ্রা একটী বিধবা,—শম্ভুনাথ চৌধুরীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, একটা কথা বলিবার অধিকার পর্য্যন্ত তাঁহার নাই।

তবু শম্ভুনাথের পরিচয় তাঁহাদের নিকটে অজ্ঞাত। তাঁহার আকৃতি মাসীমা কোনদিনই দেখেন নাই, তারণই মিলিকে আনিয়া পৌছাইয়া দিয়া গিয়াছিল, কথাবার্ত্তা যাহা কিছু তারণের সহিতই হইয়াছিল। পত্রের ভাবে বেশ বুঝা যায়—তিনি বড় গম্ভীর প্রকৃতির ও রাশভারি লোক, এবং তাঁহার এইটুকু পরিচয়ই মিলির পক্ষে পর্য্যাপ্ত।

সত্যই শম্ভুনাথ একদিক দিয়া হালকা প্রকৃতির হইলেও অন্যদিকে ভারি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। কখনও নিজের এতটুকু উপকারের জন্য তিনি কাহারও সাহায্যপ্রার্থী হন নাই, একজেদি স্বভাবই ছিল তাঁহার বিশেষত্ব। সামনে কেহ কোন কথা বলিতে সাহস না করিলেও তাঁহার আত্মীয়েরা গোপনে তাঁহার নিন্দা করিতে ছাড়িতেন না। একমাত্র বার্ষিক দুর্গাপূজা করা ছাড়া তাঁহার অন্য কোন খরচ নাই,

অথচ এত টাকা জমানোর সার্থকতা কি—সেই আলোচনাই সকলে করে।

হয়তো অনেক কথাই শম্ভুনাথের কানে আসে, তারণ প্রভুর নিন্দা সহ্য করিতে পারে না—এদিক ওদিক ঝগড়া করিয়া আসে এবং রাগের মুখে সব কথা প্রভুকে বলিয়া দেয়। শম্ভুনাথ হাসিয়া উড়াইয়া দেন। লোকে আড়ালে অনেক কথাই বলে—রাজার মাকে ডাইন বলে, কিন্তু তাহাতে আসে যায় কি।

উপস্থিত নিমাইয়ের হাতে সব ভার ছাড়িয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। মিলিকে আনার কথা এতদিন তাঁহার মনে হয় নাই, সম্প্রতি গ্রামের লোকের কথায় তাঁহার মনে পড়িয়া গেছে—মিলির বয়স পাঁচ বৎসরে সীমাবদ্ধ নাই, উনিশ কুড়ি বৎসর হইয়াছে—এবং চোখে তাহাকে অনেকদিন আগে দেখিলেও বয়সের পরিমাণে আর যে তাহাকে ঘরে রাখা চলে না এ কথাটা তিনি অন্তরে অন্তরে বেশ বুঝিয়াছেন।

শম্ভুনাথ চৌধুরী উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন বড় কম নয়। ইহারই মধ্যে তিনি পাত্র সন্ধানে তৎপর হইয়াছেন, সকলকেই শুনাইয়া দিয়াছেন শীঘ্রই মিলির বিবাহ হইবে এবং সেজন্য একটি উপযুক্ত পাত্রের দরকার। মেয়ে বি. এ. পড়ে অতএব তাহার জন্য পাত্রও তেমনই হওয়া আবশ্যক।

মিলিকে আনিতে নিমাইকে পাঠাইয়া তিনি দিন গণিতেছিলেন কবে মিলি আসিবে।

(৩)

খাগড়াঘাট ষ্টেশানে গাড়ী থামিতেই নিমাই নামিয়া পড়িল।

পাশেই মেয়েদের কামরায় জানালার কাছে বসিয়াছিল মিলি, নামিবার কোন উদ্যোগই তাহার ছিল না। তাড়াতাড়ি সেই কামরার

দরজাটা খুলিয়া ফেলিয়া নিমাই উঠিয়া পড়িল, ত্রস্তকণ্ঠে বলিল,—"বেশ তো, আপনি এখনও শান্ত হয়ে বসে আছেন? ট্রেন এখনি ছেড়ে দেবে যে—নেমে পড়ুন শিগগির।"

সে একরকম প্রায় জোর করিয়াই মিলিকে নামাইয়া দিল।

মিলি বলিতে গেল—"কিন্তু জিনিসপত্রগুলো নামাতে কুলীর দরকার হবে তো—"

"কিছু দরকার নেই—আমিই নামাচ্ছি—"

বলিতে বলিতে নিমাই ধপাধপ বাক্স বিছানা নীচে ফেলিয়া দিল,—তখন ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মিলি ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল—"নামুন—নামুন শিগগির—"

নিমাই তাহার ব্যগ্রতায় হাসিল, ছোট স্যুটকেসটা হাতে লইয়া সে অবলীলাক্রমে চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িল।

মিলি রুদ্ধনিঃশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে তাকাইয়াছিল। নিমাই কাছে আসিলে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দেখুন, একটা কথা বলে দেই—এরকম সাহস আর কোনদিন করবেন না। চলন্ত ট্রেন হতে লাফিয়ে পড়া মস্ত বড় বীরত্বের কাজ নয় মনে করবেন, তার চেয়ে চেন ধরে ট্রেন থামানো হাজার গুণে ভালো।"

একটু হাসিয়া নিমাই বলিল, "অনর্থক পঞ্চাশটাকা ফাইনই বা কেন দেই বলুন? বলবেন সেটা কিছু বেআইনী নয়, কিন্তু আজকালকার এই ফাঁকতির দিনে থলি ভর্ত্তি করতে সব কিছুই বেআইনী বলে চালানো চলে, সেটা বোধ হয় জানেন না? পঞ্চাশ টাকা কেন—পঞ্চাশ পয়সা—এমন কি পঞ্চাশ পাই পর্য্যন্ত খরচ করতে আমার বুকের হাড় পাঁজরা খসে যায়। আপনারা সহুরে মানুষ, পয়সা আপনাদের কাছে অতি তুচ্ছ জিনিস; আসেও যেমন—যায়ও তেমনি, কাজেই পয়সাকে "হাতের

ময়লা" বলে আপনারা খুসি হতে পারেন। আমরা পাড়াগাঁয়ের অসভ্য অশিক্ষিত জানোয়ার কিনা, পয়সাকে আঠা বলে ধারণা করতে চাই, ওকে হাতে লাগিয়ে আর ছাড়তে চাইনে। কত কষ্টের যে পয়সা তা যদি আপনারা জানতেন মিস চৌধুরী, তাহলে অনর্থক হয়তো বিলাসিতায় খরচ করতেন না।"

মিলির সুগৌর মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল, সে একবার নিজের পানে তাকাইল, কণ্ঠের রূঢ়তাকে সংযত ও মোলায়েম করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "কিন্তু এটা আপনার দেখে বলা উচিত ছিল মিঃ—মিঃ—"

নিমাই বিনীতকণ্ঠে বলিল, "আমার নাম নিমাই, নিমাই বলে আমাকে ডাকলে ভারি খুসি হব।"

মিলি অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, অধর দংশন করিয়া ভ্রূকুটি করিল, তাহার পর বলিল, "হ্যাঁ,—আপনার ওই বিলাসিতার কথাটা ভেবে দেখে বলা উচিত ছিল, সবাই কিছু বিলাসিতা করে না,—অবস্থার আনুকূল্য না থাকায় করতে পারে না,—এ কথাটা ভাবা উচিত ছিল।"

নিমাই বলিল, "অতি চমৎকার কথা, কিন্তু অনেকে আবার ধার করেও বিলাসিতা চরিতার্থ করে কিনা—"

মিলি যে দৃষ্টিতে নিমাইয়ের পানে চাহিল তাহাতে পারিলে নিমাইকে সে দগ্ধ করিয়া ফেলিত, ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তাদের টাইপ আলাদা—দেখলে চেনা যায়। আমার মনে হয়—আপনার জীবনে আপনি সেই টাইপের লোকদের সঙ্গেই মিশেছেন—যারা কেবল সামাজিকতা রক্ষার মত পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করে, তাদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ আপনার হয় নি। মাত্র পঞ্চাশটাকা যে মাসোহারা পায়, তাকে কলেজের খরচ, খাওয়াপরা তার মধ্য হতে চালিয়ে বিলাসিতা

যে কি রকমে আর কতখানি করতে হয় সেটা এসব কথা বলার আগে দয়া করে একবার মনে করবেন।”

গম্ভীরভাবে নিমাই মাথা নাড়িল,—“অত্যন্ত বিনয়ের কথা। মাসে পঞ্চাশটাকা নিয়মিতভাবে যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে এরকম কষ্ট ব্যক্ত করা—ঠিক পকেটে টাকা রেখে লোকে যেমন বলে দুদিন খেতে পাইনি দাদা—সেই গোছের। কিছু মনে করবেন না মিস চৌধুরী, গাঁয়ের মানুষ আমি, রেখে ঢেকে ভদ্রতা অনুযায়ী কথা বলতে আমি পারিনে—যা মনে আসে প্রকাশ করে ফেলি। ওরা যা হালফ্যাশানে বলে—দুদিন খেতে পাইনি দাদা, তাদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়—কথাটা কত বড় মিথ্যে। পায়ে তাদের চকচকে জুতো, পরণে সুপার ফাইন ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবী, অথচ তারাই কিন্তু বলে—বিলাসিতা করার পয়সা দূরে থাক, তারা খেতে পায় না।”

মিলি একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল—

“আপনি আমাকে অপমান করছেন,—এই জন্যেই বুঝি আমায় এনেছেন?”

নিমাই হাতযোড় করিল, বলিল, “মোটেই না মিস চৌধুরী, আপনাকে অপমান আমি মোটেই করি নি, করবার উদ্দেশ্যেও এ কথা বলি নি। মোট কথা আমি এইটুকু বলতে চেয়েছি—বিলাসিতা যার মজ্জাগত তারা পেটে না খেয়েও বিলাসী হয়ে ওঠে। আপনি তবু তো পঞ্চাশটাকা করে মাসোহারা পান, অনেকে যে মাসে কুড়িটাকাও পায় না, তবু দেখবেন তাদের পরণে কি সুন্দর পোষাক, পায়ে দামী জুতো, মুখে পাউডার, রুজ, লিপষ্টিক, রুমালে সেণ্ট। বুঝুন—বুঝুন মিস চৌধুরী, মানুষ একপয়সা, দুইপয়সা করে বাঁচিয়ে সেটা লাগায় বিলাসিতায়—অথচ—”

মিলির বিকৃতমুখ দেখিয়া সে আর কথা শেষ করিল না।

সে যাহা ভাবিতেছিল নিমাই তাহা বুঝিল, সে মুখ মুচকিয়া হাসিল, তাহার পরই গম্ভীর হইয়া বলিল, "এই যে আপনার পোষাক পরিচ্ছদ, মনে করুন এতে আপনার যে টাকাটা খরচ হয়েছে, আমরা তিন মাসেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তা উপার্জ্জন করতে পারিনে। এই জন্যেই আমরা জোর করে বলতে পারি, আপনি আমাদের টাকা পরকে দিয়ে তাদের কাছ হতে বিনিময়ে নিচ্ছেন ওই সব রাবিশ জিনিস?"

"রাবিশ—"

মিলির কণ্ঠস্বর নিস্তেজ, যেন সে কতকাল রোগ ভোগ করিয়াছে।

নিমাই বলিল, "রাবিশ বই কি,—আর এই রাবিশের বিনিময়ে যে পয়সাগুলো দিচ্ছেন, সেগুলো যাচ্ছে কোথায় তাও একবার মনে করবেন মিস চৌধুরী। শুনেছি নাকি আপনারা জাগছেন, দেশের কাজ করছেন, দেশের যাতে উন্নতি হয় তার চেষ্টা করছেন, কিন্তু এদিকটায় যে দৃষ্টি দেন নি এই আশ্চর্য্য কথা। ঘরের পয়সা বিদেশে পাঠিয়ে—"

অসহিষ্ণু মিলি বলিল, "থাক থাক,—আপনাকে আর কথা বলতে হবে না, যা বলেছেন ঢের হয়েছে, এর বেশী অপমানের কথা আমি শুনতে চাইনে।"

নিমাই নিস্তব্ধে তাহার মুখের পানে তাকাইল, তাহার পর আস্তে আস্তে বলিল, "না, অপমানের কথা আমি আপনাকে বলছিনে মিস চৌধুরী, মনে বড় কষ্ট হল বলেই বললুম, যদি দোষ হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার বলার উদ্দেশ্য এই—যে টাকাটা আপনারা অনর্থক খরচ করেন, সেটা থাকলে আমাদের মত গরীব লোকেরা খেয়েপরে বাঁচে।"

মিলি বলিল, "আপনি খেতেপরতে পান না?"

নিমাই বলিল, "তুচ্ছ আমার কথা ছেড়ে দিন, এ শব্দটা বহুবচনে

ব্যবহার করুন। পথের পানে চেয়ে দেখুন—পথ বেয়ে যারা চলেছে তাদের বেশীর ভাগ লোকের পরণে ছেঁড়া কাপড়, উদরে সব দিন অন্ন যায় না। সেদিন আপনার রাজধানী কলকাতায়—যেখানে মস্ত বড় বড় বাড়ীগুলো আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরই সামনে দেখলুম কুঁড়ে ঘর, দেয়াল হেলে পড়েছে, শুনলুম—ছেলেমেয়েরা খেতে পাচ্ছে না, বাপ ভিক্ষে করতে বার হয়েছে। দেখলুম পথের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে খাচ্ছে ভিখারীরা। ধনীরা মিনিটে নিজেদের বিলাস চরিতার্থ করতে হাজার হাজার টাকা খরচ করে ফেলেন, তার কিছুও যদি এদের জন্যে খরচ করতেন, এরা খেয়ে বাঁচতো—এরা চালার নীচে মাথা রেখে বাঁচতো—"

সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

মিলি বলিল, "সেটা ওদের ভাগ্যফল—ওদের পরে ভগবানের অভিশাপ, এই অভিশাপের বোঝা ওদের বয়ে যেতেই হবে, কেউ রদ করতে পারবে না। একটা গল্পতো জানেন, কাউকে ভগবান দেন, কাউকে রাজা দেন, —শেষটায় দেখা গেল, সত্যিই মানুষে দিয়ে কারও অভাব মোচন করতে পারে না—ভগবানের দান জীবকে সমৃদ্ধ করে।"

নিমাই সোজা হইয়া বুকের উপর দুই হাত আড়াআড়িভাবে রাখিয়া দাঁড়াইল, আকাশের একপ্রান্তে যেখানে একখানা টুকরা কালো মেঘ আস্তে আস্তে মাথা তুলিতেছিল, সেইখানে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিল, "ঠিক—ভগবানের অভিশাপ ওদের ভাগ্যফল—"

মিলি বিস্মিত নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়াছিল। এ যেন মহাভারতে বর্ণিত সেই বিরাট পুরুষ যাহার প্রতি লোমকূপে বিশ্বের বিকাশ, কত সৃষ্টি, কত ধ্বংস। মাথার উপর উন্মুক্ত নীল আকাশ, পায়ের তলায় সসাগরা পৃথিবী লুটাইয়া পড়িয়াছে।

নিমাইয়ের চেতনা ফিরিয়া আসিলে, হাত দুখানা সে বারেক শূন্যে

দুলাইয়া লইল, গভীর গর্জ্জনের সুরে বলিল, "ভাগ্য মানুষ নিজেই তৈরী করে, অভিশাপ নিজেরাই ডেকে আনে, কেউ দেয় নি—কেউ দেবেও না। ওদের এই শোচনীয় দুর্দ্দশার জন্যে দায়ী ভগবান নন, ওরাও নয়—ওদের বংশ, আর সেই বংশকে এত হেয়, অপদার্থ করেছি আমরাই, চিরদিন ওদের মূর্খ চাষা বলে পিছনে ঠেলে রেখেছি। এই ঠেলে রাখাটাই ওদের মধ্যে উন্নতির স্পৃহা জাগায়নি, কেননা আমরা ওদেরকে কোনদিনই আমাদের পর্য্যায়ভুক্ত বলে মানতে পারব না।"

মিলি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "চলুন, বেলা বেড়ে উঠছে যে।"

নিমাই যেন সচকিতে বলিয়া উঠল—"ঠিক কথা, বেলা অনেক বেড়ে উঠেছে বটে ; আপনার ঘড়িতে কটা বাজলো মিস চৌধুরী ?"

মিলি হাতের ঘড়ি দেখিয়া উত্তর দিল, "দুটো বাজলো"—বলিয়াই নিমাইয়ের হাতের পানে তাকাইয়া বিদ্রূপের সুরে বলিল, "একটা ঘড়ি রাখা যে বিলাসিতা নয়, এ কথাটা এবার বেশ মনে রাখবেন।"

নিমাই মৃদু হাসিয়া বলিল, "দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, আমরা গেঁয়ো লোক, সূর্য্যই আমাদের সময় রক্ষা করে ; মাঠের কাজ যারা করে, ঘড়ির সময় ধরে চলা তাদের হয় না। তবে এককালে যে ছিল না তা নয়,—সে স্কুলকলেজ জীবনে ঘটে গেছে, কর্ম্মময় জীবনে নয়। ঘড়ি দেখবার দরকার হচ্ছে আপনার জন্যে, আপনি আবার খুব পাংচুয়াল শুনেছি, ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে কাজ করেন, এমন কি প্রসাধনও চলে।"

মিলি মুখ ফিরাইয়া চট্ করিয়া মুখখানা রুমাল দিয়া মুছিয়া লইল। ঠোঁটের রং উঠিল না, বরং সে রং ঠোঁটের বাহিরেও ছড়াইয়া গেল।

নিমাই সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আহা হাঃ ওকি কাণ্ড করে ফেললেন মিস চৌধুরী—লাল রংটা চারিদিকে লেগে গিয়ে বিশ্রী দেখাচ্ছে। আপনি

বরং এক কাজ করুন, আমি ততক্ষণ গাড়ী ডাকতে যাচ্ছি, আপনি আপনার ব্যাগ হতে আয়নাটা বার করে ওই রংগুলো তুলে ফেলুন।"

একটু হাসিয়া সে চলিয়া গেল।

অপমানে, অভিমানে মিলির চোখে জল আসিয়া পড়িল। কে এ লোকটা, কি তাহার সহিত সম্পর্ক, কে তাহাকে এতকথা শুনাইয়া দেয়? জ্যেঠামণির নিকট চাকরী করে অতএব এ চাকর ছাড়া আর কিছু নয়, সেই চাকরের এত বড় স্পর্দ্ধা—সে তাহার ভবিষ্যৎ মনিবকে যাহা-না-বলিবার তাহাও বলিবে? ইহার সহিত সাধারণভাবে আর কথা না বলাই উচিত, প্রতিপদে ইহাকে স্মরণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য—মিলি মনিব এবং সে তাহার চাকর মাত্র, অতএব চাকরকে চাকরের মতই থাকিতে হইবে।

উপায় ছিল না, মিলিকে অগত্যা ব্যাগ খুলিয়া আয়না বাহির করিতেই হইল এবং রুমাল দিয়া রং তুলিয়া ফেলিতে হইল।

নিমাই ফিরিয়া আসিল, তাহার পিছনে একখানা ছইবাঁধা গরুর গাড়ী দেখা গেল,—দুইটি গরু গাড়ী টানিয়া আনিতেছে, তাহাদের গলায় বাঁধা ঘণ্টার শব্দে চারিদিক শব্দায়িত হইতেছে।

নিমাই বলিল, "তাড়াতাড়ি করে নিন মিস চৌধুরী, আমাদের এখন এই গরুর গাড়ীতে করে প্রায় চার পাঁচ মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে।"

"এই গরুর গাড়ীতে করে—"

মিলি প্রায় চীৎকার করিয়া উঠে, বিস্ময়কে দমন করিতে পারে না।

জ্ঞান হইয়া অবধি সে গরুর গাড়ীতে উঠে নাই। কলিকাতায় থাকিতে মালবওয়া গরুর গাড়ী সে দেখিয়াছে, পথের পাশ দিয়া অতিসন্তর্পণে চলে, পাঁচমিনিটের পথ পাঁচঘণ্টায় অতিবাহিত করে।

নিমাই বলিল, "অবাক হবেন না—এই গরুর গাড়ী করেই যেতে হবে।"

নিকটেই পথ দিয়া বাস চলিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া মিলি সোৎসাহে

বলিল, "কেন, এইতো পথ দিয়ে বাসও চলে, ওতে করে গেলেই বা কি ক্ষতি হবে ?"

নিমাই বিরক্ত হইয়া বলিল—"ক্ষেপেছেন আপনি, আটআনি জমিদার শম্ভুনাথ চৌধুরীদের বাড়ীর মেয়ে আপনি,—আপনি যাবেন বাসে—যত সব ছোটলোক প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে—যারা সামনে বসে যা না তাই কথা বলবে, বিড়ির ধোঁয়া আপনার গায়ে ছড়িয়ে দেবে। লোকে বলবে কি ভাবুন দেখি, চৌধুরী মশায়ের অন্য সব সরিকেরা গায়ে থুতু দেবে যে।"

মিলি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে, আভিজাত্যের এসম্মানের তাৎপর্য্য সে বোঝে না, বাসে গেলে লোকে কি বলিবে না বলিবে তাহা লইয়াও সে কোনদিন মাথা ঘামায় নাই।

সে বলিল, "ট্যাক্সী পাওয়া যায় না এখানে ?"

নিমাই মুখ বাঁকাইল, "আঃ মোটে মা রাঁধেনা—তার তপ্ত আর পান্তা —আপনার সেই ধরণের কথা মিস চৌধুরী। দেখছি এরপর চৌধুরী মশাইয়ের সম্মান রাখবার জন্যে এ না করা ছাড়া আর উপায় নেই। সোজা কথায় জিগ্যেস করছি—আপনি গাড়ীতে উঠবেন কিনা ?"

একটু আগে কর্ত্তব্য ঠিক করিয়াও মিলি মুসড়াইয়া পড়িল। লোকটি এমন রুক্ষভাষী—অথচ ইহার কথার উপর কথা বলিবার সাহস পর্য্যন্ত সে হারাইয়া ফেলিল। মনে মনে শাসাইল—রোস, আর দুদিন তুমি হুকুম করিয়া লও, মিলি আগে সকল কাজ বুঝিয়া লউক, ক্ষমতা হাতে পাক— তখন সে তোমাকে দেখিয়া লইবে।

গাড়োয়ান জিনিসপত্রগুলো গাড়ীতে উঠাইয়া লইল। মিলি গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া ভিতরটা একবার দেখিয়া লইয়া বিরক্তভাবে বলিল, "এর মধ্যে কি করে বসব ?"

নিমাই উত্তর দিল, "কেন সবাই যে ভাবে বসে, আপনি কিছু মানুষের ব্যতিক্রম নন যে লাফিয়ে উঠবেন—আপনাকে সেজন্যে বেঁধে রাখতে হবে।"

অত্যন্ত অসন্তুষ্ট মনে মিলি অগত্যা গুড়ি মারিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। গাড়োয়ান গাড়ী জুড়িতে জুড়িতে বলিল, "আপনিও উঠুন বাবু।"

নিমাই উত্তর দিল, "আমি হেঁটেই যাব নটবর, তুমি চল।"

মিলি তুমুল কোলাহল তুলিল, "তা হতে পারে না, আমি গাড়ীতে যাব, আর আপনি হেঁটে যাবেন—এটা একেবারেই ভদ্রতাবিরুদ্ধ।"

নিমাই সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিল, "পুরুষের কোন কাজ ভদ্রতাবিরুদ্ধ বলে আইনে নেই মিস চৌধুরী, কারণ সে শক্তিমান্, অনায়াসে দশ পনেরো মাইল দিনে পাড়ি দিয়ে হাঁটে।"

মিলি নামিয়া পড়িল—বলিল, "আপনি ভদ্রতা মানতে না চাইলেও আমি মানতে বাধ্য ; আমিও হেঁটে যাব, জিনিসপত্র গাড়ীতে চলুক।"

অত্যন্ত অবাধ্য এবং অশান্ত মেয়েটিকে লইয়া নিমাই বিব্রত হইয়া পড়িল বড় কম নয়। সে কঠোর স্বরে বলিল, "ছেলেমানুষি করবেন না বলছি ;—শুনেছি বি. এ. পড়েন,—সেই জ্ঞানটুকু হতেই আপনি জানবেন এতে আপনার জ্যেঠামণির মুখ কালিতে ভরে যাবে।"

মিলি নিঃশব্দে ক্ষণকাল নিমাইয়ের পানে তাকাইয়া রহিল,—গম্ভীর, দৃঢ় মুখ,—সত্যই এ লোকের আদেশ করিবার এবং আদেশে বাধ্য করাইবার ক্ষমতা আছে।

একটি কথা না বলিয়া মিলি গাড়ীতে উঠিল।

(৪)

শান্তমূর্ত্তি এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া কতকগুলা কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। নিমাই প্রবেশের পথেই পরিচয় দিল—ইনিই আটআনি জমিদার শম্ভুনাথ চৌধুরী, মিলির জ্যেঠামণি।

চিরদিনের চেনা—অথচ একেবারেই অচেনা।

মিলি বিস্মিতনেত্রে খানিক তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিল।

বয়স কবে পঞ্চাশ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে; মাথার সামনে বিশাল টাক পড়িয়াছে এবং তাহারই আশপাশে যে চুলগুলি আছে তাহা প্রায় সাদা হইয়া গিয়াছে। মুখে গোঁফদাড়ি ছিল না, তীক্ষ্ণ নাক, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপূর্ণ উজ্জ্বল চোখ, তাহার উপর মোটা মোটা ভ্রূ। ঠোঁট দুখানি মোটা এবং এই মোটা ঠোঁটই তাঁহার দৃঢ়তার পরিচয় দেয়।

শম্ভুনাথ চৌধুরী মিলিকে দেখিতে পান নাই, কেবলমাত্র নিমাইয়ের অস্তিত্বই অনুভব করিয়া তিনি চোখ না তুলিয়া, কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে বলিতেছিলেন, "তোমরাই আমাকে মারবে নিমাই,—এ রকম করে আমাকে জড়িয়ে ফেললে যাও বা দু বছর বাঁচতুম—তাও—"

বলিতে বলিতে তিনি মুখ তুলিলেন, তাঁহার চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

নিমাই মৃদু হাসিয়া বলিল, "দুটি বছর কেন, এখনও দুইয়ের পরে শূন্য দিয়ে যা হবে, তত বছর আপনাকে বাঁচতেই হবে, নইলে আপনাকে ছাড়ছে কে? এই যে মিস চৌধুরী এসেছেন, ওঁকে আপনার আদেশে নিয়ে এলুম।"

মাসীমার উপদেশানুসারে মিলি তাঁহার পায়ের ধূলা লইতে যাইবামাত্র তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "থাক থাক মা, আর প্রণাম করতে হবে না, এমনই তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি।"

নিমাইয়ের পানে তাকাইয়া সহাস্যে বলিলেন, "তারপর বাবাজি, বিশেষ কষ্ট পেতে হয় নি নিশ্চয়ই, মা লক্ষ্মী আমার পত্র পেয়ে প্রস্তুত ছিলেন আশা করছি।"

নিমাই উত্তর দিল, "কোন কষ্টই হয় নি চৌধুরী মশাই, উনি প্রস্তুতই ছিলেন, যখনই গেছি নিয়ে এসেছি, কেউ কোন আপত্তি করে নি।"

খুসি মনে শম্ভুনাথ বলিলেন, "আপত্তি করবেই বা কেন আমারই ভাইঝি, আমারই বংশের রক্তধারা ওর বুকে বইছে, এতে কি এতটুকু তফাৎ থাকতে পারে নিমাইচন্দ্র?"

নিমাই সবিনয়ে বলিল, "তা তো নেই-ই, কিন্তু এখন সে সব কথা থাক চৌধুরী মশাই, এঁর স্নান খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা আগে করলে ভালো হতো।"

শম্ভুনাথ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "ঠিক—ঠিক, এ কথা আমার মনেই পড়ে নি—মূলেই ভুল করে বসে আছি। তারণ হতভাগাটা গেল কোথায়, এই তো একটু আগে তামাক বদলে দিয়ে গেল। এসব ব্যাপারে যদি তার এতটুকু হুঁস থাকে—"

বলিতে বলিতে তিনি চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিলেন—"তারণ—ওরে হতভাগা তারণ, একবার এদিকে আয় বাপু, দয়া করে একবার দর্শন দান করে যা।"

অনেক দূর—সম্ভব ভিতর দিক হইতে উত্তর আসিল—"যাই বাবু—"

শম্ভুনাথ মিলির পানে তাকাইলেন, হাসির রেখায় তাঁহার মুখখানা ভরিয়া গেছে, বলিলেন, "এই আমার তারণ, বুঝেছো মা লক্ষ্মি—এমন লোক তুমি আর পাবে না। হতভাগা সব দিক দিয়ে ভালো,—যেমন বিশ্বাসী, তেমনি প্রভুভক্ত, কেবল দোষ [illegible]মিতে—কিছুতেই যদি সময় মত কোন কাজ করে।"

বলিয়াই তিনি গল্প জুড়িয়া দিলেন—কবে কোনদিন তারণ কি ভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছে, তাঁহাকে কত বিপদআপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। তাহার বোকামী এবং কুড়েমীর কথা এ গল্পে বাদ গেল না।

ইহারই মধ্যে দরজার উপর তারণকে দেখা গেল।

বেঁটে ও কালো লোকটি, মাথার চুলগুলি বেশীরভাগ সাদা হইয়া গেছে; পরণে একখানা নীল ডোরা-কাটা লুঙ্গি, গলায় লাল গামছাখানি জড়ানো, হাতে সদ্য সাজা এক কলিকা তামাক,—ফুঁ দিতে দিতে আসিতে তাহার নামোল্লেখ শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

শম্ভুনাথ প্রচণ্ড ধমক দিলেন, "এই যে, নবাবপুত্তুর গাড়োয়ান এলেন এতক্ষণে কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে। বেটার যদি এতটুকু আক্কেল থাকে—একবারে দুকানকাটা যাকে বলে তাই; হাজার বকলেও, এতটুকু লজ্জা-সরমের ধার ধারে না, চোখের পর্দ্দার বালাইটুকু পর্য্যন্ত নেই। এদিকে আয় হতভাগা, তোর পিঠে আজ যদি জুতো না ভাঙ্গি, আমার নামই শম্ভুচৌধুরী নয়। আয়—কাছে আয় বলছি···"

চৌকির নীচের যে চটিজোড়াটা পড়িয়াছিল, তাহারই এক পাটি তুলিয়া লইয়া তিনি এমনই আস্ফালন জুড়িয়া দিলেন যাহাতে মিলি সশঙ্কিত হইয়া তারণের পানে তাকাইল, যদি সে নিকটে আসে, তিনি সত্যই জুতা তাহার পিঠে ভাঙ্গিবেন।

কিন্তু কার্য্যকালে বিপরীত দেখা গেল। তারণ নিঃশব্দে ধীরপদে অগ্রসর হইয়া গেল, সন্তর্পণে জুতার আঘাত হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া গড়গড়ার উপরকার কলিকা সরাইয়া হাতের কলিকা তাহার উপর বসাইয়া দিল; সবিনয়ে বলিল, "তামাক দিয়েছি বাবু—"

দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া শম্ভুনাথ তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। এরূপ ব্যাপার যে প্রায়ই ঘটে তাহা তাঁহাদের ধীর স্থির ভাব

দেখিয়াই বুঝা যায়। জুতার পাটি হাতে উঠিয়া জন্ম সার্থক করে, অথচ সে পাটি কোনদিনই তারণের পৃষ্ঠের সান্নিধ্য পায় না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শম্ভুনাথ কেবল বলিলেন, "তোর কিন্তু মার খাওয়াই উচিত ছিল তারণ।"

সবিনয়ে তারণ কেবল উত্তর দিল, "আজ্ঞে না, মোটেই উচিত হতোনা।"

"হতো না—?"

শম্ভুনাথ দম লইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমার এই রাগ দেখেও তোর একটু ভয় হলো না; তুই অনায়াসে এগিয়ে এলি—আমাকে তামাক দিলি? ধর, রাগটা যদি আমার না পড়তো, যদি আমি তোকে জুতোই মেরে বসতুম—"

তারণ অত্যন্ত সবিনয়ে হাসিল।

মুখের নল সরাইয়া হুঙ্কার দিয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "হাসছিস যে বড়, তোর হাসি দেখে আমার ভয়ানক রাগ বেড়ে উঠছে তারণ, আমি মোটে সহ্য করতে পারছিনে। এখনও বলছি দাঁত ঢাক, নচেৎ তোকে আমি আজ আস্তো রাখব না।"

তারণ দাঁত ঢাকিল।

মিলির পানে তাকাইয়া অত্যন্ত শ্রান্তকণ্ঠে শম্ভুনাথ বলিলেন, "সত্যি ওকে নিয়ে আমি আর পারলুম না মহামায়া; বেটা বদমায়েসের ধাড়ি,—ওর রোগই হচ্ছে হাসি—কথার উত্তর পর্য্যন্ত দেয় না। দেখো তুমি, ওর এই অবাধ্যতার জন্যে একদিন ওকে আপদমস্তক জুতো মেরে যদি পথে বার করে না দেই, আমার নামই শম্ভুনাথ চৌধুরী নয়,—এ আমি নির্ঘাত বলে দিচ্ছি।"

তিনি অত্যন্ত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন।

নিমাই বিনীতকণ্ঠে বলিল, "উপস্থিত আপনাদের ঝগড়া বিবাদ বরং থাক চৌধুরী মশাই। শোন তারণ, তুমি এঁকে নিয়ে গিয়ে এঁর স্নান, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাটা আগে করে দাও গিয়ে। বেলা আর নেই কিনা—"

কথা শেষ না হইতেই শম্ভুনাথ বলিলেন, "বোঝ, বোঝ নিমাই, এ কথাটা তোমাকে একজন পর লোক হয়েও বলে দিতে হচ্ছে, ওর এখনি গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত কিনা তুমিই বল। হতভাগাকে হাজার বার বলেছি মহামায়া আসছে, তার স্নানের জল, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কর;— ও যেন আমার কোন কথাই শুনতে পায়নি ঠিক সেই ভাবটি দেখাচ্ছে।"

"মহামায়া, আমাদের সেই মহামায়া—"

তারণ অবাক হইয়া মিলির পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয় সে এতটুকু সেই মহামায়াকেই দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল, এত বড় মহামায়াকে দেখিবার আশা সে করে নাই।

শম্ভুনাথ বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ করে দেখছিস কি বল তো, তোকে যা বলা হল—তা করবি কিনা?"

মাথা চুলকাইয়া তারণ বলিল, "মা লক্ষ্মী মস্ত বড় হয়ে গেছেন কিনা, ওঁকে দেখে চিনতে পারছিনুম না। কত বছর আগেকার কথা, তবু মনে হয় এই যেন সেদিন,—মা লক্ষ্মী এতটুকুটি ছিল, সেই বায়না, কান্না—"

মুখভঙ্গী করিয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "মরলেন, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যান আর কি। ওরে হতভাগা, কথা বলবার ঢের সময় পাবি এখন, আগে ওর স্নানাহারের যোগাড় করে দে গিয়ে বাপু। নাঃ তোকে নিয়ে আর পারা গেল না তারণ, বল—তা হলে আমাকেই উঠতে হয়।"

তারণ ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "না না, আমি সে সব যোগাড় করে রেখেছি, পুঁটুর মা সব করে ফেলেছে। এসো মা লক্ষ্মি, ভেতর বাড়ীতে চল, নাওয়া খাওয়া করে তারপরে আমাদের কথাবার্ত্তা হবে এখন।"

মিলি উঠিল।

প্রকাণ্ড বড় বাড়ী ; কত অলি গলি, দালান পার হইয়া ভিতর বাড়ীর উঠানে পড়িয়া মিলি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, এতক্ষণে একটু আলো বাতাস পাওয়া গেল।

খোলা উঠানে দাঁড়াইয়া সে একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। চারিদিকে দ্বিতল প্রাসাদশ্রেণী, কত কালের পুরাতন কে জানে। একেবারে সেকেলে ধরণের বদ্ধ ঘর, ছোট ছোট জানালা, ঘরে যে প্রচুর পরিমাণে আলো বাতাস যায়, দেখিয়া তাহা মনে হয় না।

একটি দশ এগারো বৎসরের ছোট মেয়ে বারাণ্ডার ধারে দাঁড়াইয়াছিল, একখানা সবুজ রংয়ের ডুরে শাড়ি তাহার ছোট্ট দেহখানিকে বেষ্টন করিয়া আছে। সেই ডুরে শাড়ির আঁচলে কয়েকটি পেয়ারা এবং তাহার হাতেও আধখানা পেয়ারা দেখা গেল।

তারণের সাড়া পাইয়া ঘরের ভিতর হইতে একটি বিধবা মেয়ে বাহির হইয়া আসিল।

"এসো ভাই—তোমার ঘরে এসো—"

একখানা পিঁড়ি সে ত্রস্তহস্তে পাতিয়া দিল।

তারণ বলিল, "এখন বসবেই বা কি, স্নান সেরে যা হয় দুটো ভাত মুখে দাও মা লক্ষ্মি, রান্না তো হয়েই আছে ?"

এইবার মিলি চোখ ফিরাইয়া তারণের বর্ণিত পুঁটুর মায়ের পানে চাহিল, চোখ সে ফিরাইতে পারিল না।

সুন্দর সে অনেক লোককেই দেখিয়াছে,. কিন্তু এমন সুন্দর সে কোনদিনই দেখে নাই।

শ্বেত মর্ম্মরে গড়া মূর্ত্তি সে দেখিয়াছে,—সেই শ্বেতবর্ণে ঈষৎ গোলাপী

রংয়ের আভা সে কল্পনাতেও কোন দিন মিলাইতে পারে নাই, ভগবান পুঁটুর মার গাত্রে সেই রং দিয়াছেন। মানুষের গায়ের রং যে এমন হইতে পারে তাহা মিলি জানে না।

কিন্তু কেবল গায়ের রংই নয়,—তেমনই গঠন, তেমনই বড় বড় চোখ, উন্নত নাক, পাতলা লাল অধরোষ্ঠ, অতি সুন্দর চিবুক; অর্দ্ধচন্দ্রাকার ললাট, কালো চুলের ফ্রেমে যেন ছবির মত বাঁধানো।

হঠাৎ দেখিয়া তাহাকে জীবন্ত সরস্বতী বলিয়া মনে হয়। এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী পুঁটুর মা—

মিলি কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

(৫)

কলিকাতার মিলি, গোকর্ণে মহামায়া। মিলি মনকে সান্ত্বনা দেয়—নিমাইয়ের নাম যেমন নিমাই, তাহার নাম তেমনই মহামায়া। কলিকাতায় থাকিলে নিমাইও নামবিলাসী হইয়া উঠিত, তাহার নাম হয়তো হইত, তমোহব, বারীন্দ্র, বরুণ বা রবি; গ্রামে নিমাই বড় জোর গোবর্দ্ধন, জনার্দ্দন নামেই রূপান্তরিত হইতে পারে।

প্রথম যে দিন সে এখানে রাত্রিশেষে চোখ মেলিয়াছিল, সেই প্রভাতটি সত্যই তাহার নিকট কল্পনাতীত সুন্দর ছিল। সে দেখিল জানালাপথে সুন্দর, সুনীল, উন্মুক্ত আকাশ—তাহারই বুক ঘেঁসিয়া কত পাখী বিচিত্র সুরে কলধ্বনি করিয়া দূর দূরান্তরে উড়িয়া চলিয়াছে। কলিকাতার বাসায় কদাচিৎ চোখে পড়িত একটুকরা আকাশ—তাহাও বিবর্ণ হইয়া উঠিত, কদাচিৎ এমন পরিষ্কার নীলবর্ণ চোখে পড়িত। নীচে বাগানে হেনা গাছে রাত্রে যে ফুল ফুটিয়াছিল, তাহারই এক ঝলক সুগন্ধ বাতাসের সহিত ঘরের মধ্যে ভাসিয়া আসিল। কত নাম না জানা পাখীর কাকলী ধ্বনি বাতাসে

ভাসিয়া আসিয়া মিলিকে জানাইয়া দিল, গ্রামে জীবন আছে, রূপের সন্ধান এখানে মিলে।

ঠিক ইহারই সঙ্গে সঙ্গে কানে ভাসিয়া আসে পনেরো ষোলটি গরু ও বাছুরের একত্র চীৎকার, পায়রাগুলার একত্রমিলিত পাখার ঝটপট ও অশ্রান্ত বকম বকম শব্দ। মিলির চারিদিক ঘেরিয়া শান্ত স্নিগ্ধতার যে একটা মায়াজাল রচিত হইতেছিল, তাহা ছিঁড়িয়া গেল, বিরক্ত হইয়া মিলি উঠিয়া পড়িল।

বারাণ্ডায় রক্ষিত জলে মুখহাত ধুইয়া মিলি যখন ফিরিতেছিল, তখন চোখ পড়িল দরজার পাশে দণ্ডায়মানা পুঁটুর দিকে, সে যেন কি বলিতে আসিয়া ভয়ে বলিতে পারিতেছে না।

মিলি ডাকিল, "এদিকে এসো পুঁটু, কিছু বলবে?"

পুঁটু কাছে আসিল না, বলিল, "মা জিজ্ঞাসা করলে, আপনাকে কি এখন চা দেওয়া হবে?"

মিলি বলিল, "দেওয়া হবে বই কি, তোমার মাকে বল গিয়ে চা তৈরী করতে।"

পুঁটু চলিয়া গেল।

খানিক পরেই চা আসিল এবং আনিল পুঁটুর মা।

অদ্ভুত সুন্দর মেয়ে; বয়স এমন কিছু বেশী নয়, বড় জোর পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর হইবে। সুদীর্ঘ আকৃতি, সুন্দর গঠন—যেন একটি সঞ্চারিণী লতা। ঘরের কালো মেঝের উপর তাহার পাদক্ষেপ, কালো জলের মাঝে পদ্ম ফুটিবার স্মৃতি মনে জাগাইয়া তুলে।

সেই পায়ের পানে তাকাইয়া মিলি নিঃশ্বাস ফেলিল। এমন সুন্দর যাহার পা, এমন সুন্দর যাহার চেহারা, সরস্বতীর মত যাহার মুখ, সে বিধবা হইল কেন—কেন তাহার একখানা শাড়ি পরিবারও অধিকার রহিল না?

একখানা কালাপাড় শাড়ি—

শুভ্র কাপড় তাহার গাত্রবর্ণে মিলিয়া যাইত, কেবল কালো পাড়টি ফিতার মত লতাইয়া থাকিত।

কিন্তু তবু মনে হয়—এই শুভ্র থানেই তাহাকে মানাইয়াছে ভালো, পাড়ের সৌন্দর্য্য এখানে নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে।

পুঁটুর মা স্নান করিয়াছে, তাহার কালো চুল জানু পর্য্যন্ত লতাইয়া পড়িয়াছে। রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল, তৈল পড়ে না, চিরুণিও হয়তো স্পর্শ করে না। সেই চুল আর সেই অনিন্দ্য মুখখানির পানে তাকাইয়া মিলির চোখে পলক পড়ে না।

ব্যস্তভাবে পুঁটুর মায়ের হাত হইতে সে চায়ের কাপ গ্রহণ করিল, ধন্যবাদ দিবার কথা একবার তাহার মনে জাগিয়াই মিলাইয়া গেল, এ মানুষকে ধন্যবাদ দেওয়া অর্থে পরিহাস করা মাত্র।

কেবল মাত্র সে বলিল, "তারণকে দিয়ে পাঠালেই হতো, আবার আপনি নিজে কেন নিয়ে এলেন ?"

পুঁটুর মা হাসিল, "আ পোড়াকপাল,—তারণকে এখন পাওয়া যাবে তাই ভেবেছো ভাই ? সে এতক্ষণ তোমার জ্যেঠামণির দরবারে ফরমাস খাটছে,—মানে তামাক সাজছে। এ নাকি তার গর্ব্বের কথা যে তার তামাক সাজা ছাড়া বড়বাবু আর কারও হাতে তামাক খান না। সে যা কিছু করে, বড়বাবুর কাছে তাই হয় অতি চমৎকার, ওর নাকি জুড়ি মেলে না। ওঁরা দুজনে দুজনের গুণে মুগ্ধ, ওঁদের সংসার ওঁদের দুজনকে নিয়ে, ওর মধ্যে আর কেউ কোনদিন ঢুকতে পায় নি—পাবেও না।"

মুহূর্ত্ত থামিয়া সে আবার বলিল, "অথচ মজা দেখ—তোমার জ্যেঠামণি দিনে না হোক পঞ্চাশবার তারণকে জুতো মারছেন আর তাড়াচ্ছেন—অবিশ্যি সে সব ব্যাপারই মুখে মুখে চলছে। লোকে দেখে মনে করে

না জানি কি ভয়ানক ব্যাপার—অথচ কাজে কিন্তু কিছুই না—শুধু ফাঁকা আওয়াজ মাত্র।"

মিলি জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁরা থাকতেন তো দুজন—আর তো কাউকেই দেখছি নে ; রান্না-বান্না করতো কে ?"

পুঁটুর মা বলিল, "রান্না আর বান্না,—কি যে বল ভাই ; হতো শুধু সিদ্ধ ভাত, তরকারির নাম গন্ধও ছিল না। তারণ উনোন ধরিয়ে চাল ধুয়ে, মাজা হাঁড়িতে করে বসিয়ে দিতো, তাতে ছেড়ে দিতো যত রাজ্যের তরকারি, সিদ্ধ হলে বড়বাবু নামিয়ে নিতেন। অবিশ্যি দুধ আর ঘি না থাকলে ওঁদের শুধু এই খেয়ে টিঁকে থাকাই হতো ভয়ানক মুস্কিল, কেবল দুধ ঘির জোরেই চাকর মনিব টিঁকে আছেন বলতে হবে।"

নীচে পুঁটুর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"মা, তরকারি হয়েছে—"

পুঁটুর মা উত্তর দিল, "নামিয়ে রাখ, আমি যাচ্ছি।"

অবাক হইয়া মিলি বলিল, "সে কি, ওইটুকু মেয়ে তরকারি নামাতে পারবে ?"

পুঁটুর মা একটু হাসিয়া বলিল, "ওইটুকু বলোনা ভাই, ওই মেয়ের বিয়ের জন্যে এখনই কত লোক কথা বলছে। এগারো বছর বয়েস হয়েছে, আমাদের গৃহস্থের ঘরে এমন সময়ের মধ্যে অনেক কাজ এমন কি রান্না পর্য্যন্ত শিখতে হয়।"

মিলি একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

এগারো বৎসর বয়সে সে হয়তো ফ্রক পরিয়া দিন কাটাইয়াছে, কিন্তু এই মেয়েটি এই বয়সেই সাংসারিক অভিজ্ঞতা বড় কম সঞ্চয় করে নাই। সংসারের আঘাত ও বেদনা অতি শীঘ্র মানুষকে জ্ঞানী করিয়া তুলে, শক্ত করিয়া গড়ে।

ত্যক্ত ডিস কাপ লইয়া পুঁটুর মা চলিয়া গেল।

সেদিন তারণ সন্ধ্যার পর আহারাদি সমাপ্তে যখন বারাণ্ডায় দরজার পাশে বিছানাটা পাতিয়া লইয়া তাহার উপর পা ছড়াইয়া বসিল, তখন মিলি দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

একটু রুক্ষকণ্ঠেই সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের মতলবটা কি বল তো তারণ? ছিলুম কলকাতায়, তবু পড়াটা চলছিল, আর কয়টা মাস পরে একজামিনটা দিতে পারতুম; শুধু শুধু পড়া বন্ধ করে এনে এখানে এই নির্জ্জন বাড়ীতে একা আমায় রাখবার মানেটা কি?"

তাহার উগ্র কণ্ঠস্বরে তারণ থতমত খাইয়া গেল, তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "তা তো আমি জানি নে মা লক্ষ্মি।"

ঝাঁজের সঙ্গে মিলি বলিল, "তা আর জানবে কি করে বল? এদিকে তো শুনেছি বাবু আর তোমাতে যত সব মন্ত্রণা হয়—"

"আমার সঙ্গে—"

তারণের দুটি চোখ ঠিকরাইয়া পড়ে আর কি, বাধা দিয়া সে বলিল, "ওইখানেই যে ভুল করছো মা, আমি যে চাকর, সে কথাটা ভুলে যাচ্ছো। চাকর মনিবে কোনদিন মনের কথা হয় নি, হবেও না, সে কথাটা তো জানো। তবে নিমাইবাবুর সঙ্গে যদি এসম্পর্কে কথাবর্ত্তা হয়ে থাকে, সে সব আমি চাকর মানুষ, আমার তো শুনবার দরকার নেই।"

এই অতি বিনয়টাই মিলিকে জ্বালাইয়া তুলিল বেশী রকম, মুখখানা বিমর্ষ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। ওঘর হইতে জ্যেঠামণির তামাক খাওয়ার শব্দ শুনা যায়, মানুষটি সজাগ আছেন বুঝা যায়।

তাহাকে আনার সম্বন্ধে জ্যেঠামণির সঙ্গে নিমাইয়ের কথাবার্ত্তা হইয়াছে—নিমাই মত করিয়াছে তাই তাহাকে আনা হইয়াছে—আশ্চর্য্য কথা যা হোক।

নরম স্বরে মিলি জিজ্ঞাসা করিল, "তা হলে বোঝা যাচ্ছে আমায় আনবার মূলে রয়েছে ওই তোমার নিমাই বাবুরই কারসাজি।"

"কারসাজি!"

তারণ যেন গুটাইয়া এতটুকুটি হইয়া গেল, মাথা চুলকাইয়া বলিল, "তোমাকে এখানে আনায় নিমাই বাবুর কি লাভ হবে তা তো বুঝিনে। ঘরের মেয়ে ঘরে আসবে এতে—"

মিলি আর কথা না বলিয়াই ফিরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারণ বেচারা কিছুই বুঝিল না, নিঃশব্দে রুদ্ধ দরজার পানে কেবল চাহিয়া রহিল।

মেয়েটিকে যেন বুঝা যায় না—চেনা যায় না, এমন কি ধরা ছোঁওয়াও যায় না, সে যেন আপনার চারিদিকে একটা প্রাচীর তুলিয়া দিয়া বাস করে। তারণ এত মেয়ে দেখিয়াছে, কাহারও এমন স্বভাব দেখে নাই।

তারণ শুইয়া পড়িল।

ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছে—দরজার ফাঁক দিয়া ভিতরকার আলো দেখা যাইতেছে। মহামায়া বোধ হয় এখনও শয়ন করে নাই, হয়তো এখনও লেখাপড়া করিতেছে।

ও ঘরের তামাক টানা তখন বন্ধ হইয়া গেছে।

তারণ লম্বা ঘুম দিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

(৬)

কয়েকদিন বাদেই অতিষ্ঠ মিলি নিজেই গিয়া শম্ভুনাথকে ধরিল।

চশমাটা চোখে আঁটিয়া তিনি কেবলমাত্র ভক্তিপূর্ণচিত্তে গীতাখানা খুলিয়া লইয়া বসিয়াছেন। এই সময়টুকুর জন্য তারণ সর্ব্বদা সতর্কভাবে বারাণ্ডায় বসিয়া পাহারা দেয়—যেন কেহ ঘরের মধ্যে প্রবেশ না করে, এতটুকু গোলমাল না করে।

মিলি এ সময়ের মূল্য জানে না তাই ঝড়ের মত বেগে একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। তারণ এতক্ষণ এখানেই ছিল, কি একটা জরুরী কাজ মনে পড়িয়া যাওয়ায় উঠিয়া গিয়াছে, এইটুকু সময়ের মধ্যে মিলি অবৈধ জানিয়াও যে বাহির বাড়ীর বৈঠকখানায় আসিয়া বিপ্লব বাধাইবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

"আপনার কাছে আমার নালিশ আছে. জ্যেঠামণি, —আপনাকেই বিচার করতে হবে—"

বৃদ্ধ জ্যেঠামণি থতমত খাইয়া গেলেন ; গীতাখানা সবে খুলিয়াছিলেন, সেখানা আস্তে আস্তে বন্ধ করিয়া বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে মিলির পানে তাকাইলেন।

কিসের নালিশ আর কিসের বিচার তাহা তিনি ভাবিয়া পান না ; মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "কথাটা আমি তো বুঝতে পারছিনে মহামায়া—।"

মিলি একবার পলকের দৃষ্টিপাতে দেখিয়া লইল তিনি গীতা খুলিয়াছিলেন, আবার বন্ধ করিয়াছেন। সে বলিল, "আমাকে এরকমভাবে গলায় দড়ি বেঁধে এখানে আনবার কারণ তো বুঝছিনে। একেবারে বন্দীর মত রেখেছেন, জনমানবের সাড়াশব্দ নেই, এরকমভাবে কোন মানুষ কোনদিন বাস করতে পারে—তাই বলুন দেখি ? আপনার মতলব কি তাই আমায় স্পষ্ট করে খুলে বলুন।"

জ্যেঠামণি আশ্বস্তভাবে হাসিলেন।

সর্ব্বরক্ষণ, এইমাত্র, আর কিছু নয়! শম্ভুনাথ ভাবিয়াছিলেন না জানি কি কাণ্ডই ঘটিয়াছে, কিসের বিচার তাঁহাকে করিতে হইবে।

শান্তকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "তবু তো এখানে—এই পিতৃপুরুষের ভিটেতেই থাকতে হবে মা ; মনে করতে হবে তোমার উর্দ্ধতন

চৌদ্দপুরুষ, তোমার বাপ মা সব এই ভিটেয় ঘুমিয়ে আছেন, এই ভিটেয় প্রদীপ জ্বালবার ভার তোমারই হাতে। চিরকাল বিদেশে থাকা তোমার তো চলবে না মহামায়া, এসব আমি থাকতে দেখেশুনে বুঝে না নিলে এরপরে তোমাকেই ঠকতে হবে যে। আমাকেও সব বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে দাও, এ জোয়াল আমি যে আর বইতে পারছিনে।"

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন, "তা ছাড়া নাই বা দিলে বি. এ. পরীক্ষা, পড়েছো তো—ওই যথেষ্ট হল। ডিগ্রী নিয়ে তোমার কোন লাভ নেই কারণ তুমি চাকরী তো করতে যাবে না।"

ক্রোধে মিলির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে, বলিল, "লেখাপড়াকে আপনি শুধু চাকরীর বাহন বলতে চান, জ্ঞানের জন্য নয়—এইটাই বলতে চান তো।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "আজকাল তাই দাঁড়িয়েছে বটে। নিমাই বলে— বেশী লেখাপড়া শিখে কি লাভ হবে, যেটা না হলে নয় অর্থাৎ কাজে লাগতে পারে, ততটুকু শিখলেই যথেষ্ট। আর এও সত্যি কথা, মেয়েরা বেশী লেখাপড়া শিখে ঝুঁকে পড়ে বাইরের কাজে, এতে ঘরের কোন কাজই হয় না।"

মিলির মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না, সে কেবলমাত্র বলিল, "ঘরের কাজ ?"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ ঘরের কাজ। সে সব কথা তুমি বরং নিমাইয়ের কাছে শুনো, সে বেশ বুঝিয়ে বলতে পারবে, আমি তার মত করে তোমায় বুঝাতে পারব না। সে এখনি আসবে, এসে তোমায় বরং বুঝিয়ে দেবে এখন।"

নিমাই বুঝাইয়া দিবে তবে মিলি বুঝিবে—মিলির পোড়া কপাল। নিমাই ডিগ্রী পাইয়াছে মিলি পায় নাই, আর ছয়মাস পরেই তাহার ডিগ্রী

মিলিত—হইল না কেবল নিমাইয়েরই প্ররোচনায়। আজ এ সত্য বুঝিতে মিলির বিলম্ব হইল না—পাছে সে ডিগ্রী লাভ করিয়া নিমাইয়ের সমকক্ষতা লাভ করে, কেবল সেই জন্যই কূটবুদ্ধি নিমাই এই সরল মানুষটিকে প্ররোচিত করিয়া তাহার পড়া বন্ধ করিয়া এখানে আনাইয়াছে।

নিমাই বুঝাইবে—মিলি বুঝিবে; জ্যেঠামণি তাহাকে সাধারণ একটি গ্রাম্য মেয়ের পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন—সে যে নিমাইয়েরই সমান জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহা তিনি বুঝেন নাই।

তারণ দরজা পথে মুখ বাড়াইল, রুদ্ধশ্বাসে ডাকিল, "মা লক্ষ্মি—"

"যাচ্ছি—"

বলিয়া মিলি আবার জ্যেঠামণির দিকে ফিরিল, বলিল, "দয়া করে আমায় কাউকে বুঝাতে হবে না জ্যেঠামণি, আমি নিজের বুদ্ধিতে যেটুকু বুঝেছি তাই আমার ঢের। মোট কথা আমি বুঝলুম—আপনার আর আপনার নিমাইয়ের মতে মেয়েরা শুধু গৃহস্থালীর কাজই করবে, বাসন মাজবে, জল তুলবে, রাঁধবে আর সকলকে খাওয়াবে—এইখানেই তার কর্ত্তব্য শেষ হয়ে যাবে। আপনার নিমাইবাবু যেমন আপনাকে বুঝিয়েছেন, আপনিও ঠিক তেমনটি বুঝেছেন, আর সেইটাই আমায় বুঝাবার জন্যে চেষ্টা করছেন, আবার সে ভারও দিচ্ছেন আপনার সেই নিমাইবাবুর হাতে। একটা কথা বলে যাই জ্যেঠামণি, আমি আপনার এ সব ঘরের কাজ কোনদিনই করব না, না বাসন মাজা, না রান্নার জলতোলা, কারণ এ সব কাজ আপনি কোনদিন আমাকে শিখবার সুযোগ দেন নি। আপনার যদি সেই ইচ্ছেই ছিল, আমাকে পড়বার জন্যে পাঠিয়েছিলেন কেন—কেন আমাকে আপনার সংসারে এই সব কাজ করবার উপযুক্ত করে গড়ে নেন নি?"

শম্ভুনাথ উত্তর দিতে পারিলেন না, নীরবে কেবল মাথা চুলকাইতে

লাগিলেন ; মিলি বাহির হইয়া আসিল। সম্মুখেই দেখা গেল নিমাইকে, সহাস্য মুখে তাহারই পানে তাকাইয়া আছে।

নিমাইয়ের পানে তাকাইয়া মিলির সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল ; সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, নিমাই ডাকিল, "যাবেন না, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

মিলি থমকিয়া দাঁড়াইল, "আমায় বলছেন ?"

বিনীতভাবে নিমাই বলিল, "দ্বিতীয় লোক যখন উপস্থিত নেই, তখন আপনাকেই বলছি ধরে নিতে হবে।"

অবজ্ঞার সুরে মিলি বলিল, "সেই সঙ্গে এ কথাও জেনে রাখা দরকার—আপনার সময়মত আর কারও সময় না হতেও পারে।"

নিমাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, "সময় করে নেওয়াও যেতে পারে।"

দৃঢ়কণ্ঠে মিলি বলিল, "না—"

ততোধিক দৃঢ়কণ্ঠে নিমাই বলিল, "হ্যাঁ—"

সঙ্গে সঙ্গে সে মিলির চলিবার পথে দাঁড়াইল, বলিল, "আপনাকে দাঁড়াতেই হবে মিস চৌধুরী, আমার কথা শুনবার মত সময় আপনাকে করে নিতেই হবে।"

তাহার বিশাল দেহের পানে তাকাইয়া ও দৃঢ় কথা শুনিয়া মিলি থতমত খাইয়া গেল, খানিকক্ষণ সে কোনো কথাই বলিতে পারিল না। এক মুহূর্ত্তে সে ভুলিয়া গেল যে, সে এই লোকটির ভবিষ্যৎ মনিব, চাকর হিসাবে ইহাকে হুকুম করিবার অধিকার তাহার আছে।

শুষ্ককণ্ঠে সে বলিল, "এ আপনার অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায় নিমাইবাবু, আপনি আমাকে এ রকম ভাবে আটক করতে পারেন না।"

নিমাই শান্তভাবে বলিল, "আপনার অত্যন্ত বেশী মহত্ত্ব মিস চৌধুরী, ব্যাপারটাকে বেআইনী না বলে কেবলমাত্র অন্যায় বলেছেন, আপনার এই

উদারতা বা মহত্ত্বের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একটা কথা আছে, যারা শক্তিশালী তাদের কাছে অন্যায় বা বেআইনী কিছুই হতে পারে না, গায়ের আর মনের জোরে তারা নীতি-বিগর্হিত কাজও করে যায়। অন্যায়, বেআইনী, পাপ, এ সব বাঁচিয়ে চলে তারা যারা শারীরিক আর মানসিক দুইদিক দিয়েই দুর্ব্বল। ভগবানের ইচ্ছায় আমার দেহ মন দুই-ই শক্তিশালী, কাজেই ও সব বাঁচিয়ে চলার মত দুর্ব্বলতা আমার নেই।"

ভীষণ লোক,—

নিতান্ত দুর্ব্বলকণ্ঠে মিলি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ভগবান মানেন ?"

নিমাই বলিল, "সকলের খাতিরে মানতে হয় বই কি, বাধ্যতামূলক মানা বলেই না পাপপুণ্য, ন্যায়অন্যায়কে মেনে চলা, নয়ত এ সব মানতে রাজি নই।"

এতক্ষণে মিলির কণ্ঠে আবার শক্তি ফিরিয়া আসিল, বলিল, "বাধ্যতামূলক হলেও মানেন তো? আমি জানতুম যারা ভগবান মানে তারা ন্যায় অন্যায়, পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম খুব বেশীরকম বাঁচিয়ে চলে।"

অবজ্ঞার সহিত নিমাই উত্তর দিল, "বাঁচানোর ফলেই অসীম শক্তিশালী মানুষ হয় শক্তিহীন, নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তারা থাকে একেবারেই অজ্ঞ। আমি বলি কি শুনুন, ভগবান আছেন—আমি কাজের ভার আর বিচার বিবেচনার ভার তাঁর পরে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। আমার কাজের হিসেব নিকেশ তিনি করুন, আমার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক এ দিক দিয়ে নেই। আমার দিক দিয়ে আমি একরকম খালাস, একেবারে বেপরোয়া। আমি কাজ করে যাব, ফলাফল তিনি দেখুন—বাস।"

মিলি কতকক্ষণ নির্ব্বাকভাবে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি খুন করতে পারেন ?"

গম্ভীরভাবে নিমাই বলিল—"আপনাকে ? সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।"

মিলি অনেক কষ্টে রাগ সামলাইয়া গেল, বলিল, "ধরুন আমাকেই।"

নিমাই তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেখিয়া লইয়া বলিল, "তা পারি। দরকার পড়লে কেবল আপনাকে কেন, আপনার জ্যেঠামণিকে, ওই তারণকে পর্য্যন্ত খুন করতে পারি। পরীক্ষা করতে চান নাকি ?"

মিলির মুখটা কঠিন হইয়া উঠিল, বলিল, "বড় সাংঘাতিক লোক তো আপনি, এ রকম লোককে কাছে থাকতে দেওয়াও উচিত নয়। আপনি আপনার মনিবকে পর্য্যন্ত খুন করতে পারেন, এ কথা বলবার মত সাহস আপনার হল ? নাঃ, আপনাকে কাজে রাখা আর চলবে না, আপনাকে জবাব দেওয়া হল।"

সে হাঁপাইতে লাগিল।

স্থিরকণ্ঠে নিমাই বলিল, "ভুল করলেন মিস চৌধুরী, আমাকে জবাব দেওয়ার কর্ত্তা আপনি নন, আপনার জ্যেঠামণি, কারণ তিনিই আমাকে কাজ দিয়েছেন। যদিও তিনি আমার বাবার পরমবন্ধু তবু চাকরী যখন দিয়েছেন তখন তিনি মনিব আর তাঁর হুকুমেই আমাকে চলতে হবে ; কাজেই আপনি আমার পরে অনর্থক রাগ করে কষ্ট পাবেন না মিস চৌধুরী।"

ক্রোধে মিলির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, একটা কথাও সে বলিতে পারিল না।

মিলি অগ্রসর হইতে যাইতেছিল, নিমাই বাধা দিল, "একটু দাঁড়ান, যে কথাটা বলার জন্যে আপনাকে বাধা দিয়েছি, সেই কথাটাই যে বলা হয় নি।"

মিলি কেবলমাত্র বলিল, "বলুন—"

নিমাই বলিল, "চৌধুরী মশাইকে আমার নাম করে কি সব বলছিলেন শুনলুম, এটা কিন্তু আপনার মত শিক্ষিত মেয়ের পক্ষে একেবারে অবৈধ কাজ হয়েছে মিস চৌধুরী, কারও নামে আপনি যে কারও কাছে বলবেন, আমি আপনার কাছ হতে এ ব্যবহার পাওয়ার প্রত্যাশা করি নি। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, সহরের মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব বড় কিনা—"

ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়া হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিয়া মিলি বলিল, "থাক, আর ওসব কথাগুলো বলবেন না নিমাইবাবু—নির্জ্জলা মিথ্যে কথাগুলো বলে কতখানি লাভ হচ্ছে আপনার, তা আপনিই জানেন। পাড়াগাঁয়ের লোক—বিশেষ করে আপনি আমার মত মেয়েদের সম্বন্ধে যে কতখানি উচ্চ ধারণা করেন তা আমি শুনেছি। আপনিই না একালের শিক্ষিত লোক হয়ে জ্যেঠামণিকে বলেছেন—মেয়েরা লেখাপড়া শিখে অপদার্থ হয়ে যায়, সংসারের কোনো কাজে লাগে না—"

আরও অনেক কথা সে বলিতে পারিত, কিন্তু ক্রোধের আতিশয্যে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

শান্তকণ্ঠে নিমাই বলিল, "কথাটা শুনেছেন দেখছি, তবে যতটা বিকৃতভাবে গ্রহণ করেছেন, আমি তেমন ভাবে বলিনি এ কথাটা আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। সাধারণভাবে মেয়েদের ধরে এ কথাটা বলতে ইচ্ছে হয় কি না হয়, আপনিই বলুন। পারবেন আপনি দশ ঘড়া জল তুলতে, ক্ষার কাচতে, ধান ভানতে, পারবেন আপনি পঞ্চাশজনের রান্না রাঁধতে? আমি কোনদিকটা ধরে বলেছি সেটা অবিশ্যি এখন ধরতে পারবেন, বুঝতেও পারবেন। যাক, ও সব কথা নিয়ে আর কাটাকাটি করে লাভ নেই, আসুন আমরা এবার সন্ধি করি, দুজন দুজনকে বুঝে বন্ধুভাবে চলি—।"

"বন্ধুভাবে ?"

অপমানে মিলি বিবর্ণ হইয়া গেল,—"কখনই হতে পারে না। আপনি যে আমায় ঘৃণা করেন এ কথাও যেমন ভুলতে পারব না, তেমনি আপনি যে আমাদের কাছে চাকরী করেন তাও ভুলতে পারব না। যতই বড় নিজেকে মনে করুন, একটা কথা মনে রাখবেন—বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে, চাকর মনিবে কোনদিন বন্ধুত্ব হয় না; চাকরকে চিরদিন চাকর হয়েই থাকতে হয়।

নিমাইয়ের হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা যে এই কথার আঘাতে বিবর্ণ হইয়া গেল তাহা মিলি চাহিয়াও দেখিল না। নিমাই নির্ব্বাকে পথ ছাড়িয়া দিল, এতটুকু বাধা সে আর দিল না, মিলি সগর্ব্বে চলিয়া গেল।

(৭)

রান্নাঘরে একটা পিঁড়ির উপর বসিয়া রাঁধিতেছে পুঁটুর মা।

মিলি যে তাহার উপরের সুসজ্জিত ঘর ছাড়িয়া এই ধোঁয়াপূর্ণ ঘরের মধ্যে আসিবে, তাহা তাহার কল্পনারও অতীত। মিলি যখন দরজার উপর আসিযা দাঁড়াইল তখন সে পরম বিস্মিতভাবে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

মিলি বলিল, "আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না দিদি, আপনি বসুন। আমি উপরে আর একা থাকতে পারলুম না, তাই আপনার কাছে এলুম। এখানে বসে আপনার রান্না করা দেখি আর গল্প শুনি—কি বলুন।"

পুঁটুর মা সঙ্কুচিতা হইয়া উঠিল, বলিল, "তুমি এখানে এই ধোঁয়া আর গরমের মধ্যে কি করে বসবে ভাই; চোখ জ্বালা করবে, মাথা ধরে উঠবে—"

বাধা দিয়া মিলি বলিল, "ধরে ধরবে, তার জন্যে আপনাকে কষ্ট পেতে হবে না, আমি এখানেই বসব।"

সে একখানা পিঁড়ি টানিয়া লইয়া বসিল।

পুঁটুর মায়ের পরিচয় সে চায়—সে পরিচয় পুঁটুর মা ছাড়া আর কেহ জানে না।

কিন্তু কি আছে পুঁটুর মার, কিই বা বলিবে সে, কি দিবে সে নিজের পরিচয়, তাহার বিবাহিত জীবনের ঘটনা বলার মত কিছুই নাই। বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী সুখময় সুন্দর জীবন, তখন ছিল কত আশা, কত আনন্দ; স্বপ্নেও সে ভাবে নাই তাহার জীবনে আছে এত দুঃখ, এত বেদনা।

কথা বলিতে গিয়া পুঁটুর মা অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে, নিজের গত জীবনের পৃষ্ঠা উল্টাইতে গিয়া অনেক কথাই মনে পড়ে।

তাহাব পিত্রালয় ছিল ঢাকা জেলায়।

একদিন অবস্থা বেশ ভালোই ছিল, এবং পিতা মাতার একমাত্র কন্যা হিসাবে সে অত্যন্ত আদরেই লালিত পালিত হইয়াছিল। অপরূপ সুন্দরী কন্যাকে বড়ঘরে দিতে পারিবেন পিতামাতার এই একমাত্র আশা ছিল এবং সেই আশা লইয়াই কন্যাকে মিশনারী স্কুলে তাঁহারা ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। সেখানকার মেমসাহেব এই সুন্দরী মেয়েটিকে স্নেহ করিতেন, তাহাকে নিজের খরচে খানিকদূর পর্য্যন্ত তিনিই পড়াইয়াছিলেন।

বর্ত্তমানের পুঁটুর মা সেদিনকার তরুণী মৃদুলা; যে ছিল রূপে গুণে হাসিতে উজ্জ্বল, প্রাণপূর্ণ, আজ আছে তাহার ছায়াটুকু মাত্র; রূপ আজও আছে, তাহাতে প্রাণ নাই।

মনিময় ঘোষাল সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, বিবাহের কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহ হইল না। মৃদুলার মায়ের কলঙ্ককাহিনী ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই নারীর গর্ভজাত কন্যাকে গৃহলক্ষ্মীরূপে গ্রহণ করিতে মনিময়ের মাতা সম্মত হইলেন না।

বিবাহ হইল না।

পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া মৃদুলা কোনো উত্তর পায় নাই। জ্ঞান হইয়া সে মাতাকে দেখে নাই, পিতার নিকট বরাবর শুনিয়া আসিতেছে তাহার মা মারা গিয়াছেন, বিবাহের সম্বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে শুনিয়াছিল তাহার মা মরেন নাই, তিনি আজও বাঁচিয়া আছেন—অতি ঘৃণিতভাবে জীবন যাপন করিতেছেন।

ইহার পর কেহ মৃদুলাকে বিবাহ করিতে আসে নাই। পিতা দেশে আর মুখ দেখাইতে পারেন নাই, অবশেষে সামান্য একটা চাকরী লইয়া কন্যাসহ তিনি মুর্শিদাবাদে আসেন এবং সেইখানেই যাদব চক্রবর্ত্তীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। মৃত্যু যখন শিয়রে সমাগত তখন তিনি বৃদ্ধ যাদব চক্রবর্ত্তীর হস্তে কন্যাকে অর্পণ করিয়া যান।

নিতান্ত বাধ্যতামূলক বিবাহ। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে হয় তো মৃদুলার ভাগ্যচক্র অন্যদিকে ফিরিয়া যাইত, বৃদ্ধ যাদব চক্রবর্ত্তী তরুণী সুন্দরী মৃদুলার পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন না।

তবু মৃদুলা কৃতজ্ঞ—সত্যই কৃতজ্ঞ যেহেতু যাদব চক্রবর্ত্তী তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহার মুমূর্ষু পিতাকে পরম শান্তিতে মরিতে দিয়াছেন।

একটা বৎসর যাদব চক্রবর্ত্তী বাঁচিয়াছিলেন, এই এক বৎসর মৃদুলা সাধ্বী স্ত্রীর মতই স্বামীর সেবা করিয়াছে। কদাকার বৃদ্ধের অনুপমা সুন্দরী তরুণী স্ত্রী দেখিয়া গ্রামের লোক বিদ্রূপ করিয়াছে বড় কম নয়, মৃদুলা সে সব সহ্য করিয়া গিয়াছে।

পুঁটু যখন তিনমাস গর্ভে ছিল, তখন যাদব চক্রবর্ত্তী মারা যান। তাঁহার প্রথম পক্ষের উপযুক্ত পুত্র মাতুলালয়ে থাকিত, পিতার মৃত্যুর পর সে আসিয়া যাহা কিছু ছিল লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, দয়া করিয়া মাথা গুঁজিবার জন্য কুঁড়ে ঘরখানি মৃদুলাকে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছিল।

অতি কষ্টে পুঁটুর মায়ের দিন যায়।

লোকের বাড়ী ধান ভানিয়া, চিঁড়া কুটিয়া, রন্ধন করিয়া পুঁটুর মা ও পুঁটুর জীবিকানির্ব্বাহ হয়। বড় তরফে লোকজন আসিলে রন্ধনের জন্ত মাঝে মাঝে তাহার ডাক পড়ে, শম্ভুনাথ চৌধুরী তাহাকে মাসিক সাহায্য করেন, বিশেষ করিয়া তাঁহারই অনুগ্রহে তাহার দিন কাটে।

এই তো মৃদুলার পরিচয়।

কিন্তু এই সত্য পরিচয়টুকুও মৃদুলা দিল না, নিজের প্রথম জীবনের পরিচয় সে একেবারে এড়াইয়া গেল, বধূরূপে নিজের যেটুকু পরিচয় তাহাই ব্যক্ত করিল মাত্র।

মিলি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাপের বাড়ীর সম্পর্কে কেউ নেই ?"

মৃদুলা মাথা নাড়িল,—"না—"

কেহই নাই এ কথা সত্য।

সেদিন দোকানের ঠোঙ্গাকারে খবরের কাগজের একটুকরা নিতান্ত দৈবাৎ হাতে পড়িয়াছিল, আপনা হইতেই একটা খবরের দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ঢাকার কৃতি ছাত্র মনিময় ঘোষাল বিলাত হইতে প্রশংসার সহিত ডাক্তারী পাশ করিয়া আই. এম. এস. ডিগ্রী লাভ করিয়া কলিকাতার মেডিকেল কলেজে উচ্চ বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মনিময়,—মনিময় ঘোষাল,—

মৃদুলা চক্ষু মুদে, দুই হাতে কম্পিত বক্ষ চাপিয়া ধরে।

মনিময়—সেই মনিময় এবং সেই মৃদুলা।

সেই মৃদুলা কি বাঁচিয়া আছে ? মনিময় আছে এবং সে আজ যথেষ্ট খ্যাতি সম্মান অর্জ্জন করিয়াছে,—সকলে আজ ক্যাপ্টেন মনিময় ঘোষাল আই. এম. এস. কে চিনিবে, মৃদুলা আজ কোথায় গেল—সেই মৃদুলা ?

মৃদুলা মরিয়াছে ;

তাহারই স্মৃতি লইয়া বাঁচিয়া আছে পুঁটুর মা বাংলার দরিদ্রা, দুঃখিনী

বিধবা পুঁটুর মা—যে একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে, একখানা থানে যাহার লজ্জা নিবারণ হয়।

এক একদিন রাত্রে যখন পুঁটু ঘুমাইয়া থাকে, সমস্ত গ্রামের বুক নিস্তব্ধ নিঝুম হইয়া যায়, রজনীর সাঁ সাঁ শব্দ একটানাভাবে কানে আসিয়া বাজে, বাতাসও ঝিমাইয়া পড়ে, তখন বিছানায় শুইয়া পুঁটুর মা কেবল এ পাশ ও পাশ করে ; মরা অতীত অকস্মাৎ জীবন্ত হইয়া উঠে।

ঘুমের জন্য সে কত আরাধনা করে,—তন্দ্রাচ্ছন্ন মন যে মুহূর্ত্তে ঝিমাইয়া আসে, কানের কাছে কে যেন ডাকে মৃদুলা—মৃদু—"

মরা অতীত অন্ধকারে রূপ পরিগ্রহ করে,—মৃদুলা চমকাইয়া উঠে। অন্ধকারে যেন চোখের উপরে ভাসে একটি যুবকের হাসিভরা মুখ, বড় বড় দুটি চোখের চাহনি।

মৃদুলা— ?

কোথায় মৃদুলা ? সে তো মরিয়া গেছে, বাঁচিয়া আছে পুঁটুর মা। তাহার মনে সন্দেহ জাগে, সে নিজেকে নিজে শতবার সহস্রবার জিজ্ঞাসা করে—কে সে, কাহাকে কে ডাকে,—সে কি মৃদুলা অথবা পুঁটুর মা ? মৃদুলা কি আজও বাঁচিয়া আছে—সেই সুন্দরী মৃদুলা! তরুণী মৃদুলা— লোকে বলিত হাসিলে নাকি মাণিক পড়ে, কাঁদিলে মুক্তা ঝরে, প্রতি পাদক্ষেপে শতদল বিকশিত হয়। তাহাকে দেখিয়া লোকে নাকি এ প্রবাদ সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তাহার নাকি সবই সুন্দর।

অভিভূতা পুঁটুর মা ডালের হাঁড়ি নামাইয়া তাহার ফেন ঝরাইতে যাইতেছিল ; মিলি হাসিয়া উঠিল,—"ও কি করছেন আপনি, ও ভাত নয় —ডাল যে।"

অকস্মাৎ মৃদুলার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল ; ক্ষিপ্রহস্তে হাঁড়িটাকে সোজা করিয়া বসাইয়া অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া বলিল, "পোড়াকপাল

আমার, দেখ না, এখনই কি সর্ব্বনাশটাই করে বসেছিলুম, এখনই সকলের খাওয়া নষ্ট করেছিলুম আর কি। ভাগ্যে তুমি বসেছিলে ভাই, তাই না ডালটা বাঁচলো।”

মিলি করুণ নেত্রে তাহার পানে চাহিল।

এমন সুন্দরী মেয়ে, এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও যে মাথা ঠিক রাখিয়া কাজ করে, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। করুণকণ্ঠে বলিল, “আজ আপনার শরীরটা ভালো নেই বোধহয় তাই এ রকম ভুল হচ্ছে। তারণ বলছিল নাকি মাঝে মাঝে জ্বরও হয়, সেই জ্বর নিয়েও সব কাজ করে যান।”

“জ্বর—” মৃদুলা হাসিয়া উঠিল, “যা বলেছো। জ্বর হয়তো হয় কিন্তু তাকে আমল দিতে গেলে কি আমার চলে বোন? কোনোদিন হয় তো জ্বর আসে, আবার কখনো তা ছেড়েও যায়, তা নিয়ে শুয়ে বসে থাকতে গেলে তো আমাদের চলে না বোন। আমরা গরীব, গতর খাটিয়ে মেহনত করে তবে দুটো পেটের ভাত যোগাড় করতে হয়, অতখানি বিলাসিতা কি আমাদের সাজে?”

মিলি যেন আকাশ হইতে পড়িল, “বিলাসিতা?”

মৃদুলা বলিল, “নয় কি? কেন যে বিলাসিতা তা আমি তোমায় খুব ভালো করে বুঝাতে পারব না। অনেক কিছু আছে যা নিজে বেশ জলের মত বোঝা যায়, পরকে বুঝানো যায় না, এটাও ঠিক সেই রকমেরই কথা। তোমরা বলবে—জ্বর, সে জ্বরই, বড় লোকেরও যেমন, গরীবলোকেরও তেমনি, কারণ কষ্টটা দুজনকেই ঠিক সমান বইতে হয়—কিন্তু আমি বলব —কষ্ট ঠিক সমান নয়, সে কষ্টেও আকাশ পাতাল তফাৎ আছে। এই যে বছর খানেক আগে পুঁটুর হল জ্বর আর ভোলা চৌধুরীর মেয়েরও হল জ্বর, তাঁর মেয়ের জ্বরে সেবা শুশ্রূষা জুটলো—সহর হতে ডাক্তার এলো, ওষুধপথ্য কিছুরই অভাব হল না। আর আমার পুঁটু,—পেলে না এক

ফোটা ওষুধ, পেলে না পথ্য, মায়ের কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্তভাবে ঘুমানোর অধিকারও সে পেলে না কারণ তার মাকে পরের বাড়ী কাজ করে জীবিকার্জ্জন করতে হয়। তাই বড় দুঃখেই এ কথা বার হলো, মনে কিছু করো না ভাই।"

সে উনানে কড়া চড়াইয়া তৈল ছাড়িয়া দিল, পটল ভাজিতে হইবে।

মিলি নিস্তব্ধে এই সুন্দরী মেয়েটির পানে তাকাইয়া রহিল। পুঁটুর মায়ের কথা শুনিলে বেশ বুঝা যায় সে বেশ লেখাপড়া জানে; তাহার কথাবার্ত্তা চালচলন বেশ মার্জ্জিত। সাধারণ যে কোনো মেয়ে এমন সুসম্বদ্ধ ও মার্জ্জিত ভাষায় কথা বলিতে পারে না।

কড়ায় পটল কয়খানা দিয়া মৃদুলা পিছন দিকে ফিরিল, বলিল, "ভগবান আছেন গরীবদের জন্যে তাই পুঁটু আমার বিনা ওষুধে বিনাপথ্যেও বাঁচলো, তার অঙ্গহানি পর্য্যন্ত হয় নি, আর ভোলাচোধুরীর মেয়েটির দুখানা পা পড়ে গেছে, তাকে সম্পূর্ণভাবে পরের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। ভগবান যদি না থাকতেন, হয় তো এতদিন মা মেয়ে দুজনেই শুকিয়ে মরতুম।"

মিলি সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িল, বলিল, "ওইখানেই ভুল করছেন, ও রকম অন্ধবিশ্বাস আমি করতে পারিনে। ভগবানকে সত্যি মানতে পারতুম যদি—"

মৃদুলা শান্তকণ্ঠে বলিল, "যদি কি— ?"

মিলি বলিল, "যদি আপনাকে সুখী করতেন।"

মৃদুলা হাসিল, বলিল, "আমি মানি—সারা অন্তর দিয়ে আমি মানি। আমি বলি, আমি যে কষ্ট পাচ্ছি সে আমার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল, আমি—"

মিলি বাধা দিল—"আপনি পূর্ব্বজন্ম মানেন ?"

মৃদুলা উত্তর দিল, "মানি বই কি। ইহজন্ম পরজন্ম পূর্ব্বজন্ম, এসব মানি, কোনটাকে বাদ দেইনে। সেই পূর্ব্বজন্মে কি মহাপাপ করেছি যার

ফল এ জন্মে আমায় সইতে হচ্ছে, এ জন্মে আবার যাতে কোন পাপ না করি সেই জন্যেই আমি চেষ্টা করছি, যেন পরজন্মে আবার এর চেয়েও বেশী কষ্ট না সইতে হয়। ভগবানকে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেব এ সাহস আমার নেই, আর ওইটুকু বিশ্বাস যদি হারাই, আমি কি নিয়ে, কি সম্বল করে বাঁচব তাই বল।"

সে পটল ভাজা নাড়িতে লাগিল।

সন্দিগ্ধ মিলি বলিল, "আপনার কথা শুনলে মনে হয় আপনি অনেক লেখাপড়া শিখেছেন।"

"লেখাপড়া—ও হরি—"

মৃদুলা উচ্ছ্বসিতভাবে এমন হাসি হাসিল যাহাতে মিলি লাল হইয়া উঠিল।

মৃদুলা কড়াটা উনান হইতে নামাইয়া আবার ফিরিল, বলিল, "লেখাপড়া শিখবে বোন তোমরা, গরীবের মেয়ের কি লেখাপড়া করা পোষায়। গরীবের মেয়ে কাজ করবে, তারা শুধু কাজ করে যাবে, তাদের কাজই হবে তাদের মূল্য ঠিক করবার নিয়ামক,—টাকার অভাবে রূপও মিথ্যে হয়ে যায়।"

"মা কবে মারা গেছেন জানিনে, বাবার কাছে সামান্য দ্বিতীয় ভাগখানা পড়েছিলুম, তারই ভরসায় দুটো যা গুছিয়ে কথা বলতে পারি—আসলে কিছুই নেই এ আমি তোমায় বলে দিচ্ছি। শুধু আমায় নয়, এখানে অনেক মেয়েকে দেখতে পাবে যারা লেখাপড়া জানে না অথচ জ্ঞানের কথা বড় কম জানে না। আমাদের এসব দেশে কথকতা হয়, এরা কথক ঠাকুরের কথা শুনে পণ্ডিত হয়ে যায়।"

সে আবার হাসিতে লাগিল।

(৮)

কয়দিন নিমাই কাজে আসে নাই।

শম্ভুনাথ চৌধুরী অস্থির ও বিব্রত হইয়া উঠিয়া ছিলেন বড় কম নয়। একদিন ছিল যেদিন এই সমস্ত কাজ তিনি একাই করিয়াছেন, কাহাকেও সাহায্য করিতে হয় নাই। নিমাই কার্য্যভার লওয়া পর্য্যন্ত তিনি পরম নিশ্চিন্তভাবে হাত পা ছড়াইয়া আরাম করিতেছিলেন, এতদিন পরে পরিত্যক্ত বোঝা আবার মাথায় চাপিবার উপক্রম হওয়ায় তিনি একেবারে হাঁপাইয়া উঠিলেন।

একদল প্রজা আসিয়াছে; ইহাদের সকলের অভাব অভিযোগ শুনিতে গেলে তাঁহার কাজ হয় না। তাঁহার গীতাপাঠের, পূজাহ্নিকের সময় অতীত হইয়া যায়, দুই দিনেই তিনি অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন।

তারণ গড়গড়ার উপর কলিকাটি বসাইয়া তাঁহাকে সে সম্বন্ধে সচেতন করিয়া কখন চলিয়া গেছে, তিনি সেদিকে কান দেন নাই। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল তারণ তামাক দিয়া যায় নাই—পূর্ব্বের তামাক অনেকক্ষণ পুড়িয়া গেছে।

"ওহে তারণ, তারণবাবু, একটিবার দয়া করে এদিকে পদধূলিটা দিয়ে যান দেখি—"

তারণ ছুটিয়া আসিল, তাহার হাতে কয়েকখানা শাড়ি সেমিজ প্রভৃতি, ধোপার বাড়ীতেই সে যে এইগুলি দিতে চলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শম্ভুনাথ গরম হইয়া চোখ রাঙাইয়া বলিলেন, "বাবু তো ধোবার বাড়ী যাওয়ার নাম করে হাওয়া খাওয়ার জন্যে বার হচ্ছো, আর এদিকে যে আমার জীবনান্ত হয়, সে খেয়াল আছে? এক ছিলিম তামাকের জন্যে ডাকপাখীর মত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা চিরে গেল, প্রভুর সে ডাক কানে গেছে কি?"

অত্যন্ত বিনীতভাবে গড়গড়া দেখাইয়া তারণ বলিল, "আজ্ঞে, তামাক আমি পনেরো মিনিট আগে দিয়ে গেছি, বিশ্বাস না হয় আপনি টেনে দেখুন একবার—"

"উঃ, সত্যবাদী যুধিষ্ঠির আমার,—দেখছি টেনে—"

বলিতে বলিতে শম্ভুনাথ নলে মুখ দিয়া টানিতেই প্রচুর ধূম বাহির হইল, আশ্বস্তচিত্তে তিনি কয়েকবার তামাক টানিয়া লইলেন। মনে মনে খুশী হইলেও মুখের ভাব তাঁহার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না, কুঞ্চিত ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়াই রহিল, কপালের রেখাও মিলাইল না।

তারণের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর,—হাওয়া খেতে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি,—নদীর ধারে না ফাঁকা ময়দানে?"

অসঙ্কুচিতভাবে তারণ উত্তর দিল, "আজ্ঞে, মাঠে যাচ্ছি নে, যাচ্ছি নদীর ধারের দিকেই।"

"হুঁ, এখন নদীর হাওয়া খাওয়া চাই—"

বৃদ্ধ কয়েকবার মাথা দুলাইলেন,—

"বুঝেছি, এখন গায়ে আর খানিকটে জোর করা দরকার তাই চলেছো নদীর ধারে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের আশায়? বলি, এ জ্ঞানটা মাথায় ঢুকিয়ে দিলে কে—শুনি? আগে তো এত দেহের দিকে নজর ছিল না, সুবোধ ছেলেটির মত যা পেতে তাই খেতে পরতে, যেখানে সেখানে থাকতে; আজকাল সব দিকেই নজর পড়েছে দেখতে পাই যে। কিন্তু বুঝেছো তারণ চন্দর, তোমার চেহারাখানা নেহাৎ "হ্যাক থু" করবার নয়, ওজন পাকা আড়াই মণের কম হবে না তা বলে দিচ্ছি। এর চেয়ে আরও মোটা হলে তোমায় বাপু বিদায় হতে হবে—গাঁটের পয়সা খরচ করে গুজরাটি হাতী সখের খাতিরে পোষা আমার কর্ম্ম নয়—কাজেই ও আমার পোষাবে না।"

· সবিনয়ে তারণ বলিল, "আজ্ঞে, সে আমার জানা আছে, মোটা হওয়ার জন্যে নদীর ধারে হাওয়া খেতে আমি যাচ্ছি নে—মা লক্ষ্মী এই কাপড়চোপড়গুলো দিয়েছে কিনা, রামধন ধোবার কাছে দিয়ে আসতে যাচ্ছি।"

বৃদ্ধ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "রামধনের কাছে কাপড় বয়ে নিয়ে যেতে হবে—শম্ভুনাথ চৌধুরীর বাড়ীর মেয়ের কাপড়? তাকে একটা খবর দিলে সে সাত দিন কেন—একদিন অন্তর কাপড় দিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ পাবে না। একি মগের মুল্লুক পেয়েছে যে রামধন ধোবা পর্য্যন্ত তার ইচ্ছেমত যা খুসি তাই করবে? এখনি দারোয়ান পাঠিয়ে বেটাকে কাছারি বাড়ীতে এনে এক হাজার জুতোর বাড়ি মারব—সে কথা সে জানে না?"

ক্রোধের আতিশয্যে তিনি কয়েকবার তামাক টানিলেন, তারপর বলিলেন, "তোমাকেও বলি তারণ চন্দর, নতুন মনিব পেয়েছো কিনা—আমি এখন পচা—পুরাণো হয়ে গেছি, কেমন? আমি এদিকে অগাধ জলে হাবুডুবু খেয়ে মরব আর তুমি যে ওদিকে স্রেফ বাবুয়ানা চালাবে—সেটি হচ্ছে না। চোখ কান তো আছে, দেখতে পাচ্ছো—আমাদের নিমাই আজ দুদিন আসে নি, আমার খাওয়া নেই, ঘুম নেই; এক কথায়—হাড়ির হাল হয়েছে।"

তিনি আবার ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলেন।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া তারণ আস্তে আস্তে বলিল, "কিন্তু কাপড়গুলো—"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "চুলোয় যাক তোমার কাপড়গুলো, ওগুলো যে ওবেলা দিলেও চলতে পারে, সে কথাটা মনে করো। এখন তোমার উপযুক্ত কাজ—আমাকে আগে এ-দায় হতে মুক্ত

করা,—নেমকের চাকরের কাজ করা। আমি এদিকে মরছি—কারও কাপড় চললো ধোবার বাড়ী, কেউ বা সেই অছিলায় চললেন বেড়াতে—বেশ যা হোক।"

তামাক টানা সত্ত্বেও ধোঁয়া বাহির হইল না, বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন, "দাঁড়িয়ে দেখছো কি, আর এক কলকে যে দিতে হবে সে কথাটাও বলে দিতে হবে বুঝি ?"

তারণ নির্ব্বাকে আর এক ছিলিম তামাক সাজিয়া আনিল।

শম্ভুনাথ বলিলেন, "নাও, এবার যাও দেখি একবার ম্যানেজার বাবুর বাড়ীতে, কি হয়েছে জেনে এসো। যদি বলে অসুখ করেছে, শুনিয়ে দিয়ো—তা হলেও খবরটা আমাকে জানানো দরকার। এই যে কয়টা দিন কাজে এলো না,—আমারই যত মাথা ব্যথা। স্পষ্ট শুনিয়ে দিয়ো—তার কাজ সে এসে নিক, আমি করতে পারব না।"

তারণ মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আজ সকালেই আমি খবর নিতে গিয়েছিলুম বাবু—"

"গিয়েছিলি—?"

শম্ভুনাথ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন, তাঁহার গম্ভীর মুখ সরস হইয়া উঠিল, মাথা দুলাইয়া তিনি বলিলেন, "আমি তা বেশ জানি—তারণ নিশ্চয়ই তার খোঁজটা নেবে, আমার যে কষ্ট হচ্ছে তা কি তারণ বুঝতে পারছে না ? এই তো কথা, এতক্ষণ বলে ফেললেই হতো হতভাগা, তাহলে শুধু শুধু এতগুলো গালাগালি খেতে হতো না। তুই একটা আস্ত বোকা, এতটুকু বুদ্ধি যদি তোর ঘটে থাকে।"

তারণ কথা না বলিয়া কেবল মাথা চুলকাইতে লাগিল।

শম্ভুনাথ বলিলেন, "তারপর—তাকে বলনি আমার কথা, শুনে সে কি

বললে? তার কি হয়েছে, কেন কাজে আসে নি, সে সব কিছু শুনলি?"

তারণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তিনি নিজে কিছু বলেন নি, তাঁর পিসীমা আমায় ছয়কুড়ি কথা শুনিয়ে দিলেন। কে নাকি ম্যানেজারবাবুকে ভয়ানক অপমান করেছে, সেই জন্যেই তিনি কাজ করতে চাচ্ছেন না, বলছেন—আর নাকি কাজ করবেন না।"

"অপমান করেছে তাই কাজ করবে না—"

শম্ভুনাথ অত্যন্ত সচকিত হইয়া উঠিলেন, দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া তারণের পানে তাকাইয়া বলিলেন, "অপমান করেছে নিমাইকে, কে করলে তা কিছু শুনেছিস? আমার বাড়ী হতে তাকে অপমান করেছে—কথাটাতো বড় সুবিধের মনে হচ্ছে না তারণ। কে অপমান করলে, কী অপমান করলে আর কেন করলে তা কিছু শুনতে পেলি তারণ?"

তারণ নিঃশব্দে কেবল মাথা নাড়িল।

সামনের ছড়ানো কাগজপত্রগুলি এক করিয়া রাখিতে রাখিতে শম্ভুনাথ চিন্তিতমুখে বলিলেন, "আচ্ছা, ওসব হবে এখন,—আমারই পিতৃমাতৃ দায় তো, সে না এলে আমাকেই বাধ্য হয়ে যেতে হবে তার বাড়ী, যেমন করেই হোক ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতেই হবে।"

তারণ জিজ্ঞাসা করিল, "তাহলে এখন কাপড়গুলো মা লক্ষ্মীকে ফেরৎ দেই, ওবেলা যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে সেই কথাটা বলে দেই গিয়ে?"

শম্ভুনাথ স্তব্ধ হইয়া পলকহীননেত্রে খানিক তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন,—

"তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে তারণ, সঙ্গে সঙ্গে তুই যে আমার মাথাও খারাপ করবার চেষ্টা করছিস তা আমি বুঝতে পেরেছি। তুই আজ হতে শ্রীবিষ্ণু তেল মাথায় মাখ বাপু, মাথা ঠাণ্ডা হোক, নচেৎ তোকে

নিয়ে আমার পোষাবে না। দিনরাত তোর সঙ্গে বকতে বকতে আমারই মাথা খারাপ হয়ে গেল, কোনো ভদ্রলোক চাকরকে বুঝাতে এমন করে কথা ব্যয় করে না—বুঝলি? দিন দিন তোর জ্ঞানবুদ্ধির পরিমাণ যা বাড়ছে, তাতে মনে হয় কোন্‌দিন তোকে রাঁচিতে পাঠাতে হবে।"

তারণ দন্তবিকশিত করিয়া বলিল, "রাঁচি খুব ভালো জায়গা বাবু, দেখার জিনিস ওখানে ঢের আছে। আমার এক মামা ওখানে গিয়েছিল, সে রাঁচির কত গল্প করতো। সেখানে মস্ত বড় বড় পাহাড়, কত নদী, কত বাঘ, সিংহ, হাতী, গণ্ডার, কত ময়ূর—"

মুখভঙ্গী করিয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমায় সেখানে সেই সব শোভা দেখতেই পাঠানো হবে বই কি। সেখানে পাগলা গারদ আছে জানো তো, সেইখানে তোমায় হাওয়া খেতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, সেখানে তোমায় পাহাড় দেখানো হবে, ময়ূরের ডাক শোনানো হবে। নিরেট মূর্খ হতভাগা কোথাকার,—একটা কথা বললে বুঝবার ক্ষমতা নেই। তুনিয়ায় এত লোক আছে, একটা চালাক লোক আমার কপালে জুটলো না, এসে জুটলো কিনা এই এক নিরেট গবেট,—।"

দাঁড়াইয়া তিরস্কার সহ্য করিবার পাত্র তারণ নয়, কলিকাতে আগুন আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া সে ধীরপদে বাহির হইয়া গেল।

শম্ভুনাথ উঠিলেন—।

বেলা অনেক হইয়া গেছে, এখনও স্নান হয় নাই, সন্ধ্যাহ্নিক হয় নাই, আহার তো দূরের কথা। স্নানান্তে পূজার্চ্চনা শেষ করিতে, গীতাপাঠ শেষ করিতে কোন না এক ঘণ্টা লাগিবে। ইহারই ফাঁকে একবার ঘড়িটার পানে তাকাইয়া দেখিয়াছেন বারোটা বাজিয়া গেছে, বেলা একটা দেড়টার মধ্যেও তিনি তাঁহার নিত্যকার কাজে ছুটি পান কিনা সন্দেহ।

রাগটা পড়িল গিয়া সেই হতভাগা নিমাইয়ের উপর।

কে নাকি অপমান করিয়াছে, লাটসাহেবের অমনি রাগ হইয়া গেল, কাজেই আর আসিল না। যে যাহাই বলুক, সে কথা শম্ভুনাথকে জানানো তো উচিত ছিল—সে শম্ভুনাথেরই কাজ করে—না? শুধু সেই সম্পর্কই তো নয়, যে সম্পর্ক ধরিয়া তাহার শুষ্ক মলিন মুখ দেখিয়া শম্ভুনাথ অন্তরে ব্যথা পাইয়াছিলেন, পিতৃবন্ধুর সেই সম্বন্ধটা ধরিয়াও কি সে জানাইতে আসিতে পারিল না, না ইহা জানাইতেও তাহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে?

স্নান করিতে করিতে শম্ভুনাথ ভাবিতেছিলেন, আজকালকার ছেলে-মেয়েগুলা এমন বেপরোয়া হইল কেমন করিয়া, নিজে যাহা ভালো বলিয়া জানিবে তাহাই করিবে, গুরুজন বলিয়া কাহাকেও সম্মান দেখায় না।

কিছুদিন আগে যখন তিনি বহরমপুরে গিয়াছিলেন এবং কিছুদিন সেখানে ছিলেন, সহরের উদ্ধতপ্রকৃতি ছেলেগুলাকে তখন তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারেন নাই, এবং প্রকাশ্যভাবে তাহাদের সমালোচনাও করিয়াছেন। প্রকাশ্যভাবেই তিনি বলিয়াছিলেন, "ছিল আমাদের সেকাল, যখন আমরা মাথা উঁচু করে গুরুজনদের স্মুমুখ দিয়ে হাঁটতুম না,—মাথা নীচু করে চলতুম, চোখ তুলে কোনোদিন তাঁদের পানে চাইবার সাহস পর্য্যন্ত আমাদের হয় নি। একালের ছেলেগুলো আমাদের একেবারে কেয়ার করতে চায় না, কিরকমভাবে বুক ফুলিয়ে সিগারেট টেনে সামনে দিয়ে চলে দেখ,—দেখে আমাদেরই মনে হয়—ধরিত্রী, তুমি দ্বিধা হও, আমরা তোমার গর্ভে বিলীন হই।"

এই ছেলেদের দলের নায়ক সেদিন যে ছিল তাহার নাম মনি অধিকারী। পরদিন যখন তাঁহারা দুচারজন বৃদ্ধ বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিলেন, সেই সময় মনি অধিকারীও তাহার আর দুচারটি বন্ধু সর্পগতিতে বুকে ভর দিয়া পথ চলিয়াছিল, ঐ দৃশ্য তাহাদের বড়

কম আশ্চর্য্য করে নাই। বৃদ্ধ শ্যামাচরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি হে মনি, তোমরা এমন করে বুকে হাঁটছো যে ?"

অতি বিনীতভাবে মনি অধিকারী জানাইয়াছিল—সে সমগ্র ছেলের প্রতিনিধি স্বরূপ—বুক ফুলাইয়া পথ চলিবে না বলিয়া পণ করিয়াছে এবং বয়োজ্যেষ্ঠগণের সামনে এমনই ভাবে চলিবে বলিয়া ঠিক করিয়াছে।

আজ তেরো চৌদ্দ বৎসর আগেকার সেই কথাই মনে পড়িয়া গেল।

বর্ত্তমানদিনে ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে কোনো কথা বলিবার যো নাই, ইহারা সমানতালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে,—কোনদিকে—কোথায় ? ইহার মূলে কি আছে—ধ্বংস না গঠন, মৃত্যু না জীবন ?

পূজা ও গীতাপাঠের ব্যাপারটা একটু তাড়াতাড়ি সারিয়া লইয়া তিনি আহার করিলেন।

মৃদুলা তখনও অভুক্তা ছিল, গৃহকর্ত্তাকে আহার না করাইয়া সে আহার্য্য গ্রহণ করিতে পারে নাই।

শম্ভুনাথ বলিলেন, "বেলা যে আড়াইটে বাজলো বউমা, এত বেলা পর্য্যন্ত তুমিও উপোস করে রয়েছো ?"

অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা মৃদুলা কেবল মাথাটা কাত করিল, সে শম্ভুনাথের সহিত কোনোদিন কথা বলে নাই।

শম্ভুনাথ বলিলেন, "আমার এরকম দেরী মাঝে মাঝে হবে, তাই বলে ব্রাহ্মণের মেয়ে—তোমাকেও যে আমি উপোস করিয়ে রাখব, তা হতে পারে না বউমা, তুমি বাপু ওদের খাইয়ে দিয়ে নিজেও খেয়ে নিয়ো, আমি বলে রাখছি।"

অস্ফুটকণ্ঠে মৃদুলা বলিল, "আমার কোনো কষ্ট হয় না বাবা, মাঝে মাঝে উপোস দেওয়া, এর চেয়ে বেলায় খাওয়া আমার বেশ অভ্যেস আছে, এটুকু বেলায় আমার কিছু ক্ষতি হবে না। আপনার এখানে থেকে

একবেলা করে পেট ভরে দুটো খেতে পাই, এতে আমি বেঁচে আছি, বেঁচে থাকবোও। কিন্তু আপনার কেন এত দেরী হল বাবা, দেরী তো এতদিন হতো না।"

শম্ভুনাথ উত্তর দিলেন, "আবার কাঁচিয়ে গণ্ডুষ করতে হচ্ছে যে, কাজেই দেরী হবে। জমিদারির কাজ, প্রজাদের সব অভিযোগ না শুনে তো উঠতে পারি নে,—কাজেই স্নানাহার পূজাহ্নিক আর ঠিক সময়ে হবে কি করে বল? আজকালকার ছেলেরা কৃতজ্ঞতা মানতে চায় না—নিজেদের মতটাই বজায় রেখে চলতে চায় কিনা, নইলে যে ওদের মান যাবে। ওবেলার দিকে নিমাইকে আসতে বলেছি, সোজা জবাব চাই সে কাজ করবে কিনা, তা বুঝে আবার অন্য কাউকে কাজে রাখতে হবে, নিজে তো আর এই ভুতের বোঝা বইতে পারিনে বাপু।"

মৃদুলা চুপ করিয়া রহিল।

(৯)

আশ্চর্য্য হইয়া শম্ভুনাথ দেখিলেন নিমাই কাছারি ঘরে ঠিক নিজের স্থানটিতে বসিয়া যথারীতি নিজের কাজ করিয়া চলিয়াছে।

বিস্মিতনেত্রে তিনি ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন, সে মুখে কোনো ভাব বা বৈচিত্র্য দেখা গেল না, নির্ব্বিকারভাবে সে প্রতিদিনকার মত কাজ করিয়া চলিয়াছে। যত রাজ্যের ফাইল স্তূপীকৃত হইয়াছে, আবেদন নিবেদন যা কিছু সব তাহার সামনে জড়ো হইয়াছে।

শম্ভুনাথ কেবলমাত্র বলিলেন "হুঁ"—

তিনি ফরাসের উপর বসিলেন, তারণ তামাক দিয়া গেল।

মুখর অতীত

নিত্যকার মতই কতকগুলো পত্র শম্ভুনাথের সামনে আনিয়া নিমাই বলিল, "এগুলোতে নাম সাইন করে দিতে হবে, কাল সকালের ডাকেই পোষ্ট করা চাই—।"

যেন কিছুই হয় নাই, সে যেন নিয়মিতভাবে প্রত্যহ কাজে আসিতেছে, তাহার কথাবার্ত্তায়, ব্যবহারে ঠিক এই ভাবটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শম্ভুনাথ নির্ব্বাকে সমস্ত পত্রগুলিতে নাম সাইন করিয়া দিলেন।

নিমাই সেগুলি গুছাইয়া তুলিতে তুলিতে বলিল, "নপাড়ার রহিম শেখের মামলার দিন সামনের সোমবারে পড়েছে;—সে কাল আমার বাড়ী গিয়েছিল, আমি তাকে আপনার কাছে আসতে বলেছি।"

শম্ভুনাথ স্তব্ধভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন।

নিমাই বলিয়া চলিল, "বেচারা ভয়ানক গরীব, তারপর এই মামলা চালাতে তার ভিটেমাটি বিকিয়ে যায়, দুদিন খেতে পায় নি—"

গম্ভীরমুখে শম্ভুনাথ বলিলেন, "তুমি তো রয়েছো, খেতে দিলেই পারতে—"

"আমি—" নিমাই হাসিল, বলিল, "বেশকথা, বলেছেন আপনি। আমি নিজেই খেতে পাইনে, আপনার এই চাকরিটুকু সম্বল করে তবে কোনো রকমে দুবেলা দু মুঠো ভাত খেয়ে বাঁচছি,—আমি আবার পরকে খেতে দেব—কি যে বলেন আপনি—"

গড়গড়ার নলটা পাশে ফেলিয়া শম্ভুনাথ সোজা হইয়া বসিলেন, তীক্ষ্ণ দুইটি চোখের দৃষ্টি নিমাইয়ের মুখের উপর রাখিয়া বলিলেন, "কেন পারবে না? শুনেছি তুমিই তাদের একমাত্র বন্ধু, তাদের যুক্তি পরামর্শ দাও, আমার পা জড়িয়ে ধরে চোখের জল ফেলবার উপদেশ দিতে পারো, কান্নাভেজা স্বরে বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলবার ভঙ্গী শিখিয়ে দিতে পারো, —দুটো খেতে দিতে পারো না? বলি, আমি তো তোমার হাতের

সাক্ষীগোপাল, তোমার কথায় নাকি উঠি বসি, যা করাবে তাই করব, তাই না যত জোর, যত নির্য্যাতন আমার ওপরেই চালাচ্ছো নিমাই। ধড়িবাজী বুদ্ধিটা বেশ শিখেছো দেখছি,—তোমার বাবা শশধর আর যাই হোক, এ সব জানতো না; তোমরা নাকি এ কালের ছেলে তাই পাতায় পাতায় বেড়াও। এই যে চিঠিপত্রগুলোতে আমার নাম সই করিয়ে নিলে, আমি অথচ জানিনে ওতে কি আছে। কারণ চশমা চোখে নেই, যেখানটিতে তুমি নাম সই করতে বললে, আমি অন্ধের মত সেইখানটিতে নাম সই করে দিলুম। তুমি যদি লিখে নাও যে আমার সমস্ত কিছু আমি তোমাকে লেখাপড়া করে দিলুম, তাতেও আমার টু শব্দটি করবার যো থাকবে না, কারণ তাতে নাম সই থাকবে আমার হাতের—জালসই নয়।"

নিমাইয়ের মুখখানা লাল ও অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিল, তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত সূর্য্যের মত জ্বলিতে লাগিল; মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে সংযতকণ্ঠে বলিল, "আপনার মনে যদি এই সন্দেহ-ই জন্মে থাকে চৌধুরী মশাই, আপনি এখনই তার প্রতিবিধান করতে পারেন। আমি কোনো চিঠি এখনও পোষ্ট করিনি, তারণকে দিয়ে চশমা আনিয়ে দিচ্ছি, আপনি নিজের চোখ দিয়ে পড়ে দেখুন, তারপরে যা হয় করবেন।" সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

শম্ভুনাথ নিজেকে নিতান্ত অসহায় ও বিব্রত মনে করিলেন, পাংশু মুখে বলিলেন, "থাক থাক, চশমা আনতে হবে না, চশমার দরকার নেই। তুমি এতকাল এ সব কাজ করছো তবুও যখন করনি তখন—"

বাধা দিয়ে অন্ধকারপূর্ণ মুখে নিমাই বলিল, "তবু মানুষের মন তো, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে অবিশ্বাস করতে পারেন, কারণ বন্ধুর ছেলেই হই আর যাই হই আমি চাকর ছাড়া আর কিছু নই, আপনার সঙ্গে আমার চাকর মনিব সম্পর্ক।

সর্ব্বনাশ, নিমাই এ সব বলে কি ?

নিজের কথায় নিজেই জড়াইয়া পড়িয়া শম্ভুনাথ হাত কচলাইতে লাগিলেন। সংসারের প্যাঁচের মধ্যে তিনি কোনোদিনই জড়াইতে চাহেন নাই, চিরদিন দূরে দূরেই রহিয়া গেছেন, সেইজন্য একমাত্র আত্মীয় গোষ্ঠী ছাড়া তাঁহার কোনো শত্রুও ছিল না, হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ভালোবাসিত। আত্মীয় গোষ্ঠীরা নেহাৎ স্বার্থের জন্যই এই সদাশিব লোকটির সম্পর্কে অনেক কথা বলিয়াছেন, এখনও বলিয়া থাকেন, এবং যাহাতে এই লোকটির অনিষ্ট হয় তাহার চেষ্টাও করিয়া থাকেন। শম্ভুনাথ গ্রামের অনেক কাজের ভার স্বেচ্ছায় নিজের মাথায় লইয়াছেন, গ্রামরক্ষা সমিতি তিনিই তৈয়ারী করিয়াছেন, লোকালবোর্ডের তিনি চেয়ারম্যান, সাধারণ সকল কিছুর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সকলে তাঁহাকে চেনে এবং চেনে বলিয়াই নির্ব্বিচারে তাঁহার মাথায় সকল বোঝা চাপাইয়া তাহারা নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটায়।

নিমাই না থাকিলে কোনো কাজ চলে না,—আসলে নাম থাকে তাঁহার, যুক্তি পরামর্শ দেয় এবং কাজ করে নিমাই, কাজেই সে একদিন না আসিলে তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে।

তারণ চশমা আনিয়া উপস্থিত করিল।

নিমাই বলিল, "চশমাটা চোখে দিয়ে প্রত্যেক পত্র আপনি দেখুন। এই দেখুন, একখানা এস, ডি, ও.র পত্র, এখানা কলকাতার লোন কোম্পানীর নামে, এখানা সমবায় ভাণ্ডারের—"

শম্ভুনাথ চশমাটা পকেটে ফেলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি ক্ষেপেছো নিমাই, আমার এসব পড়বার অবসর কোথায় আগে তাই ভাবো ? তুমি বাপু বড় বেশী রকম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছো, এ রকম ব্যবহার তোমার কাছ হ'তে পাওয়ার আশা আমি মোটেই করিনি। অবশেষে নিজেকে

চাকর বলতে স্থরু করেছো, আমায় মনিব বলে অতিরিক্ত সম্মান দিতে চলেছো। কয়দিন বাড়ীতে চুপচাপ মহা আরামে বসে থেকে আমার যে কতটা ক্ষতি করেছো তাই ভাবো দেখি। তারপর এই সব গরীব প্রজাদের শিখিয়ে দিয়েছো—আমার পায়ে ধরে কেঁদে পড়লেই তাদের সাতখুন মাপ হয়ে যাবে—তাই না ? বাপু, ওইটুকু চোখের জলে ভিজবার পাত্র শম্ভুনাথ চৌধুরী নয়, অমন নরম মন হলে এত বড় জমিদারি শাসন করা চলতো না, এতদিন কবে জমিদারি বিকিয়ে যেতো ; সে কথা ভাবো ?"

নিমাইয়ের অধর কোনে এতটুকু হাসির রেখা জাগিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল, সে গম্ভীর হইয়া বলিল, "কিন্তু আমি আজ সকালেই রহিম শেখের হাতে খান তিনেক দশটাকার নোট দেখলুম, সে আবার আমায় ডেকে জানিয়ে গেল—আপনি নাকি তাকে উপস্থিতকার খরচ চালাতে দিয়েছেন, আর সোমবারেই যাতে মামলাটা মিটে যায় তার জন্যে তাকে ভরসাও দিয়েছেন। আপনি নিজেই প্রশ্রয় দিয়ে ওদের মাথায় তুলেছেন, আমি আজ তাদের কিছু বলতে গেলে তারা আমার কথায় কান দেয় না ; জোর করতে গেলে তারা আমার অজ্ঞাতে আপনার কাছে এসে কাঁদাকাটা করে আপনাকে গলিয়ে দেয়, অথচ আপনি অনায়াসে আমারই মাথায় সব দোষ চাপিয়ে দেন।"

শম্ভুনাথ বাঙনিষ্পত্তি করিলেন না, কেবল নিষ্পলকে নিমাইয়ের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

নিমাই বলিল, "আমি মনে করছি—এ রকমভাবে কাজ করার চেয়ে আমার জবাব দেওয়াই ভালো। আপনি যদি ছুটি না দিতে চান, আমি নিজেই আপনার কাছ হতে ছুটি চাচ্ছি।"

শম্ভুনাথ কেবলমাত্র একটা শব্দ করিলেন, "হুঁ।"—

তারপর বলিলেন, "কোথাও কাজটাজ ঠিক করে আটঘাট বেঁধে এসেছো বুঝি?"

নিমাই মাথা নাড়িল, বলিল, "না, আজকালকার দিন যে একেবারে বদলে গেছে তাতো জানেন? বি, এ, পাশ করে দেড়টি বছর ঘুরেও একটা কুড়িটাকার কাজ যোগাড় করতে পারিনি, তাই না আপনি আপনার এখানে এই চাকরিটা দিয়েছেন—যাতে করে আজ দুইখানা তরকারি দিয়ে ভাত খেতে পাই, নচেৎ নুন ভাতও জুটতো না। আপনি বেশই জানেন আপনার এখানকার কাজ ছাড়লে আবার আমাকে সেই অবস্থাতেই পড়তে হবে—।"

শম্ভুনাথ একটা বিরাট হুঙ্কার ছাড়িলেন, "থাক—থাক, আর ডেঁপোমী করতে হবে না, ভালোয় ভালোয় কাজকর্ম্ম যেমন করেছো—তেমনি করো। লোকে বলে বেশী লেখাপড়া শিখলে ছেলেমেয়েরা জেঠা হয়ে যায়, সে কথা সত্য; বাইরে রয়েছো তুমি, আর ভেতরে রয়েছে আমার ভায়ার কন্যে মহামায়া। যেমন সুখস্বচ্ছন্দে নির্ঝঞ্ঝাটে দিন কাটাচ্ছিলুম, তেমনি তোমরা দুজন আমার বুকে পিঠে এসে জুটেছো, রাত্রে ঘুমিয়ে পর্য্যন্ত শান্তি নেই। পাকামী ছেড়ে দিয়ে যেমন কাজ করছিলে তেমনই কর, বুড়ো পিসীমাটাকে আর নাকের জলে চোখের জলে ভাসিয়ো না। স্বস্তিতে বিধবাকে একবেলা দুটো ভাত খেতে দাও। যাও, কাজকর্ম্ম কর গিয়ে, আর আমাকে জ্বালিয়ো না।"

নিমাই কি বলিতে গিয়া শম্ভুনাথের মুখের পানে তাকাইয়া থামিয়া গেল, আস্তে আস্তে সে সরিয়া গেল।

শম্ভুনাথ হাঁক দিলেন, "তামাক দিয়ে যাও তারণ চন্দর, গলা বুক যে শুকিয়ে উঠলো।"

বাহির হইতে তারণ সাড়া দিল।

(১০)

প্রফেসর স্বরমা দাসের পত্রখানা সামনে পড়িয়াছিল, মিলি চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল।

এখানে আসার পরে সে স্বরমাদিকে পত্র দিয়াছিল, সেই পত্রের উত্তর এতদিনে আসিয়াছে। তিনি অসুস্থতার জন্য তিন মাসের ছুটি লইয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, আজ দু তিনদিন মাত্র ফিরিয়াছেন।

মিলি স্বরমাদিকে এখানকার সমস্ত কথা লিখিয়াছিল, এখানে আসিয়া তাহার অবস্থা যে জলছাড়া মাছের মত হইয়াছে তাহা জানাইতে সে ভুলে নাই। সে স্পষ্টই লিখিয়াছিল—আমার আর এখানে থাকতে ভালো লাগছেনা স্বরমা দি, আজ প্রায় দুই মাস এসেছি, আমার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠছে। সন্ধ্যা হলে ভারী ভয় হয়, অন্ধকারের এমন একাধিপত্য আমি কল্পনা করেছি মাত্র, চোখে দেখিনি। সমস্ত দিন অন্ধকার কোথায় জানি লুকিয়ে থাকে, সূর্য্য অস্ত যেতেই বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে, চারিদিকে তার অখণ্ড রাজত্ব, কোথাও এতটুকু ফাঁক যেন নেই। এখানে আজও কারও সঙ্গে মিশতে পারিনি, আমার কোনোকিছুর সঙ্গে এ গ্রাম মেলে না, আমি আপনার ঘরে আপনি বন্দিনী হয়ে বাস করছি।

স্বরমাদি দীর্ঘ পত্রের দীর্ঘ জবাব দিয়াছেন। নিজে তিনি পত্রের উত্তর যথাকালে দিতে পারেন নাই—সে কথা তিনি তাঁহার ভ্রাতা বিকাশকে মিলিকে জানাইতে বলিয়াছিলেন।

কয়েকদিন আগে বিকাশের পত্র আসিয়াছে। প্রফেসর বিকাশ দাস স্বরমা দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মিলি বিকাশ দাসের মতের অনুবর্ত্তিনী, সে হিসাবে গুরু ও শিষ্যার সম্পর্কও নিকটতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং তাহা দেখিয়া স্বরমা দাস বড় কম উৎকণ্ঠিতা হন নাই।

সুরমা দাস লিখিয়াছেন—গ্রাম তোমার ভালো লাগছে না শুনে সত্যই ব্যথিতা হয়েছি মিলি। আমি জানি তোমার মত মেয়েরা সহরের মোহ যাদের অভিভূত করে রেখেছে, যারা সহরের বুকে রঙিন প্রজাপতির মতই উড়ে বেড়ায়, গ্রাম তাদের কাছে অতি জঘন্য মনে হবে। সহরের প্রচণ্ড আলোর মধ্য হতে গ্রামের অন্ধকারে গিয়ে সে অন্ধকারের প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখতে পাবে না, তার কদর্য্যতাই চোখের সামনে. বিশেষ রূপ নিয়ে ভেসে উঠবে। সহর হতে গ্রামে গিয়ে চোখ জুড়ায় তাদের যারা শান্তিকামী—তোমাদের নয়। উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ধারা নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা তুমি করবে এ আশা আমি করি।

সকলের পরে তিনি লিখিয়াছেন—তোমার বিবাহ যখন হবে তখন সত্যই আমি আন্তরিক খুশী হব। আমি আশা করছি তুমি তোমার জ্যেঠামণির নির্ব্বাচিত পাত্রকেই বরণ করবে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ তুমি করবে না।

ইত্যাদি—

এই পত্র পাইয়া মিলি বিশেষ খুশী হয় নাই।

সুরমাদি জানেন না, পল্লীজীবন কি রকম একঘেয়ে বলিয়া ঠেকে। সহব হইতে দুদিনের জন্য এখানে বেড়াইতে আসিয়া এখানকার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়া চলে, বাস করিতে গেলে রূপের সে মাদকতা আর থাকে না।

বিকাশ দাস সেদিনকার পত্রে স্পষ্টই ইহা লিখিয়াছে—গ্রামের মধ্যে এতটুকু সৌন্দর্য্য সে দেখে নাই, গ্রামের বীভৎসতা সে স্পষ্টভাবে আঁকিয়া দিয়াছে।

সুরমাদির ছোট ভাই কোন একটা কলেজের অধ্যাপক, মিলি তাহার পরম ভক্ত বলিয়াই তাহার সকল কথা সে মানিয়া লয়। মিলির মনের এইটুকু দুর্ব্বলতা বুদ্ধিমতী সুরমা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তিনি ইহা মানিয়া

লইতে পারেন নাই কারণ মিলির মুখেই তাহার পিত্রালয়ের কথা শুনিয়াছেন। স্বরমা নিজে ব্রাহ্ম, নিজের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যেমন সচেতন, পরের ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠিক তেমনই। মিলিকে তিনি আবছাভাবে দু একদিন আভাসও দিয়াছিলেন—বিকাশের পত্নী হওয়া তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

আজ দূরে আসিয়া বিকাশের কথাই তাহার মনে পড়ে।

আজও মিলি স্বরমার কথা ভাবিতে বিকাশের কথাই ভাবিতেছিল।

মৃদুলা কখন আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ তাহার দিকে চোখ পড়িতে মিলি সোজা হইয়া বসিল, পত্রখানা কুড়াইয়া লইয়া বিছানার তলায় রাখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কাছে কোনো দরকার আছে কি ?"

মৃদুলা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "পুঁটুর আজ বড় জ্বর এসেছে, ওর অবস্থা বলে ডাক্তারখানা হতে একটু ওষুধ এনে খাওয়াবো ভেবেছিলুম; কিন্তু আমি নিজে কোনোদিন যাইনি, তাই ভাবছি কি কোরব কাকে পাঠাবো ?"

মিলি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কেন, আমাদের তারণকে বলে পাঠালেই তো হয়। একটু বসুন, আমি তারণকে ডাকি।"

সে তাড়াতাড়ি বাহির হইল।

কিন্তু কোথায় তারণ—সে তখন বাহির বাড়ীতে। দূর গ্রাম হইতে কয়েকজন মাতব্বর প্রজা আসিয়াছে, নিমাই তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করিতে ব্যস্ত, তারণ সেখানে চরকির মত ঘুরিতেছে, ফরমাস খাটিতেছে। শম্ভুনাথ এই দুই জনের উপর সমস্ত ভার ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্তভাবে পূজার্চ্চনার জন্য ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, অন্ততঃপক্ষে তিন ঘণ্টার আগে তিনি বাহির হইবেন না।

দাসীকে দিয়া খবর পাঠাইলেও তারণ আসিল না, বলিয়া পাঠাইল সে এখন ব্যস্ত আছে, আসিতে পারিবে না, তখন মিলি রাগ সামলাইতে পারিল না, নিজেই একেবারে বাহিরে আসিয়া পড়িল।

তাহাকে বাহিরে এত লোকের মাঝখানে আসিতে দেখিয়া নিমাই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, নিকটে আসিয়া বলিল, "বাইরে অনেক লোক, নানা গ্রাম হতে ওঁরা এসেছেন, এসময় বাইরে না এলেই ভালো হতো।"

মিলি মুখ বাঁকাইয়া উত্তর দিল, "অগত্যা বাধ্য হয়েই আসতে হয়। তারণকে আমি ডেকে পাঠানো সত্ত্বেও সে যায় নি, তাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই—আমি কি তাকে হুকুম করতে পারিনে ?—"

ক্রোধে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

বিনীতভাবে নিমাই বলিল, "নিশ্চয়ই পারেন, হাজারবার পারেন, লক্ষবার পারেন। হুকুম তামিল যদি না করে, আপনি ওকে বেত মারতে পারেন, পায়ের জুতো খুলে পটাপট মারতে পারেন, তাতে যদি ও একটা কথা বলে, আমি তখন আচ্ছা করে মার দেব। তবে একটা কথা হচ্ছে কি, আপনার হুকুম তারণ শুনতে পায়নি, ঝি আমায় এসে বলেছিল, আমিই তারণকে যেতে দেইনি।"

মিলি শুষ্ককণ্ঠে কেবল বলিল, "বেশ করেছেন—।"

নিমাই একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, "উঁহু, রাগ করবেন না ; একবার মনে ভেবে দেখুন, এতগুলি লোকের খাওয়া দাওয়া সবই নির্ভর করছে ওই তারণের পরে, কাজেই—"

অকস্মাৎ চেঁচাইয়া উঠিয়া মিলি বলিল, "আমি কি তাতে কিছু বলেছি, বারণ করেছি ? আমি আপনার কাছে কোনো কৈফিয়ৎ চাচ্ছিনে, কাজেই আপনার আর কথা বলারও দরকার নেই।"

সে যেমন আসিয়াছিল তেমনই ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে

নিমাই বলিল, "কিন্তু আপনি অনর্থক রাগ করছেন মিস চৌধুরী। আপনি পুঁটুর অসুখের কথা বলতে এসেছেন জানি, কিন্তু এ সময় যে দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা থাকে না, সে খবরটা যদি রাখতেন, তা হলে রাগ করতে পারতেন না, এ কথা আমি বলে দিচ্ছি।"

মিলি চলিতে চলিতে থামিল, বলিল, "এই কথাটা বলে পাঠালেই হতো।"

নিমাই হাসিল, বলিল, "বেশ কথা, কিন্তু আপনি আমাকে এ কথা তো বলে পাঠান নি।"

মিলি গম্ভীর হইয়া বলিল, "না বললেও আপনি যখন জেনেছেন পুঁটুর অসুখের জন্যে ওষুধ বা ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে তারণকে ডেকেছি, তখন—"

নিমাই শান্তকণ্ঠে বলিল, "ভুল করবেন না মহামায়া দেবী, আমি জ্যোতিষী নই যে গণে জানতে পারব। জেনেছি আপনারই প্রেরিত ঝিয়ের মুখে—পুঁটুর অসুখ আর তাই আপনি ডাকাডাকি করছেন। পুঁটুর ওষুধ তবু বিকেলে আনা চলবে; কিন্তু এই যে লোকগুলি অভুক্ত অবস্থায় কতদূর হতে এসেছে ওদের এখনই খাওয়াতে হবে, সেইজন্যেই আমি তারণকে পাঠাইনি মহামায়া দেবী, দোষ যদি হয়ে থাকে সে দোষ আমার, তারণের নয়।"

মিলি কথা বলিতে পারে না।

হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া রূঢ় ভাষায় কথা বলার জন্য তাহার নিজেরই লজ্জা করিতেছিল; মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "দেখবেন—আবার যেন ভুলে যাবেন না। আপনাদের ভুল করতে বাধবে না অথচ সেই ভুলের বশে একজনের প্রাণ যেতে পারে; আপনাদের তাতে কিছুই আসবে যাবে না।"

নিমাই আবার হাসিল, সে হাসিতে ফুটিল ব্যঙ্গের ভাব এবং সেই মৃদুহাসি মিলিকে যেন চাবুকাঘাত করিল। নিমাই বলিল, "চাকরি করতে এসেছি, অবশ্য কর্ত্তব্য হিসাবে আপনার আদেশ মেনে চলবো, কাজেই ভুল যে হবে না সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন মহামায়া দেবী।"

ভ্রূকুটি করিয়া মিলি বলিল, "আমি লক্ষ্য করছি আপনি বার বার আমায় মহামায়া দেবী নামে সম্বোধন করছেন, আপনার মনে রাখা উচিত আমি মহামায়া নই, মিলি চৌধুরী।"

নিমাই মাথা নাড়িয়া বলিল, "আপনার ও নাম কলকাতার পোষাকি নাম হিসেবে থাক, এখানে আপনি মহামায়া দেবী। মূল হারাবেন না, আমাদেরও মনে করতে দেবেন আপনি আটআনি সরিকের জমিদার মহামায়া দেবী, আমরা আপনার চাকর,—ম্যানেজার হলেও হুকুম পালন করতে বাধ্য। কিছু মনে করবেন না; কথাগুলো একটু তিক্ত বোধ হলেও খাঁটি সত্য; বলতেও হবে অত্যন্ত স্পষ্ট করে—যাতে আপনি বোঝেন। যারা আপনার চাকর নয়, আপনার বন্ধু স্থানীয় তারা আপনার মিলি চৌধুরী নাম ব্যবহার করবে। ডাক্তার আপনি বিকেলের দিকে ঠিকই পাবেন, মনিবের হুকুম পালন না করলে আমার যে চাকরি যাবে, একথা আমার সর্ব্বদাই মনে আছে।"

সে ফিরিল।

বজ্রাহতার মত মিলি দাঁড়াইয়া রহিল।

সে রাগ করিবে না দুঃখ করিবে?

তাহারই প্রদত্ত আঘাত নিমাই ফিরাইয়া দিয়াছে, কাজেই রাগ করা চলে না।

খানিকদূর গিয়া নিমাই আবার ফিরিল :—

চিন্তিতমুখে বলিল, "হ্যাঁ, দেখুন, একটা বড় কথা হঠাৎ মনে পড়ে

ভূলে]। আজ বিকেল চারটের সময় আমাদের ডাক্তারখানায় একটা বড় মিটিং আছে। মেডিকেল কলেজের একজন বড় ডাক্তার আসছেন, তিনি পল্লী-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে লেকচার দেবেন। কাঁদি হতে এস, ডি, ও. আসবেন, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বহরমপুর হতে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন, গ্রামের সকলকেই ওখানে যেতে হবে, সেইজন্যে এঁরাও এসেছেন। তাই ভাবছি, আজ বিকেলে যে আপনার পুঁটুকে ডাক্তার দেখানো যাবে সে আশা নেই, শেষে আপনি আমাকেই মিথ্যাবাদী ঠিক করবেন। বরং কাল সকালে আমি ডাক্তার সঙ্গে করে নিয়ে যাব, দেখিয়ে ঔষধের ব্যবস্থা করব, আশা করছি আমার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্যে মনে কিছু করবেন না।"

উৎসুক হইয়া মিলি বলিল, "সেখানে মেয়েদের জন্যে নিশ্চয়ই জায়গা থাকবে।"

দুই চোখ কপালে তুলিয়া নিমাই বলিল, "বাপরে, তা কখনও হতে পারে? কত জায়গা হতে কত লোক আসবে, গ্রামের ছোট বড় সব থাকবে, সেখানে কি মেয়ে ছেলেদের যাওয়া পোষায়? এই যে সব লোক আজ এসেছেন এঁরাও যাবেন, এই চেনা অচেনা লোকের মধ্যে বাড়ীর মেয়েরা যাবে কি করে? আমাদের এখানে এসব প্রথা নেই—অর্থাৎ কিনা—"

মিলি রুদ্ধরোষে গর্জ্জন করিল, "অর্থাৎ কিনা যাত্রা থিয়েটার দেখতে শুনতে মেয়েরা দল বেঁধে যেতে পারে, এরকম জায়গায় তারা যেতে পারে না, এই তো?"

নিমাই সবিনয়ে মাথা কাত করিল, "ঠিক বলেছেন—এই দু-তিনমাস এখানে থেকেই আপনি এখানকার মেয়েদের চিনতে শিখেছেন দেখছি, সে জন্যে সত্যি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই মহামায়া দেবী।"

মিলি বলিল, "থাক, আপনার ধন্যবাদে আমার দরকার নেই। মেয়েরা যাক বা নাই যাক, আমাকে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন কিনা জিজ্ঞাসা করি।"

নিমাই মাথা নাড়িল—"না, সেটা আপনার প্রেষ্টিজে বাধে। আপনার জ্যেঠামশাই শম্ভুনাথ চৌধুরী, আপনি আটআনি জমিদার মহামায়া দেবী, আপনার পাবলিক মিটিং জয়েন করা কিছুতেই চলতে পারে না; এতে চৌধুরী মশাই মুখ দেখাতে পারবেন না। আর কিই বা হবে মিটিংয়ে গিয়ে, হৈ চৈ করে তাই বলুন? ডাক্তার এসে বলে যাবেন এই এই করলে শরীর ভালো থাকে অতএব তোমরা কর, সে সব কথা বুঝবে কে, নিয়মই বা শুনবে কে? কতকগুলো লোক এক হয়ে শুধু হৈ চৈ করবে—কাজ কিছুই হবে না।"

মুহূর্ত্ত থামিয়া সে বলিল, "আপনি কলকাতায় অনেক মিটিংয়ে গেছেন, অনেক লেকচার শুনেছেন; কত লোকের চোখে জল দেখেছেন, কত লোকের কত প্রতিজ্ঞা শুনেছেন, সত্যি করে বলুন দেখি—সে জল ফেলা কি আন্তরিক, প্রতিজ্ঞা পালন করতে কয়জন লোক সমর্থ হয়েছে? মেয়েরা মিটিং ডাকে, লেকচার দেয়, কিন্তু কি দরকার তার—কেন তারা পুরুষের মত চলে, লাফালাফি করে? যাদের কাজ ঘরের মধ্যে তারা যে কেন ঘর ছেড়ে বার হয়, কেন যে পুরুষদের সমান অধিকার পাওয়ার জন্যে দাঁড়ায়, তা আজও আমার বোধগম্য হল না। আমি জানি মেয়েরা মেয়েই থাকবে, পুরুষও চিরদিন পুরুষ হয়েই থাকবে, ভগবান শারীরিক মানসিক সব দিক দিয়ে পুরুষ ও মেয়েকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় তৈরী করেছেন, কাজেই—"

মিলি গরম হইয়া বলিল, "থাক থাক,—আপনি আর জানবেন কী? থাকবেন এই পাড়াগাঁয়ে পড়ে, বেড়াবেন যত সব ইতরদের সঙ্গে, ও সব

কথা বোধগম্য হবে কি করে? ব্রেণের ফার্টিলিটি নিজেদেরই অমনোযোগিতায় নষ্ট হয়ে যায় সেটা মানবেন তো? আপনি কি বি, এ. পড়েছেন, ডিগ্রী লাভ করেছেন, কি দরকার ছিল, তার চেয়ে না পড়লেই ভালো হতো।"

নিমাই যেন অকূলে কূল পাইয়াছে ঠিক সেই রকম উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছেন, আমার মনের কথা টেনে বার করেছেন। এই বি, এ. ডিগ্রীটার জন্যে আমি কিছুমাত্র লালায়িত হইনি মহামায়া দেবী, না পড়ার জন্যেই আমার ঝোঁক ছিল এবং যাতে না পড়তে হয় তার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছি,—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি, শেষ পর্য্যন্ত আমাকে পড়তেই হল, আমার মত অযোগ্যকে বি, এ. ডিগ্রী দিয়ে তবে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়লে। আপনাকে বলব কি, বাবা যখন মারা যান তখন আমি কেবল ম্যাট্রিক দিয়েছি, সেই সময়ই অমৃতসর হতে চলে আসি, ভাবলুম আর পড়তে হবে না—বাঁচলুম, কিন্তু পিসীমার দৌরাত্ম্যে আবার ভর্ত্তি হতে হল কৃষ্ণনাথ কলেজে, পড়ব না বলেও আবার বি, এ. পর্য্যন্ত পড়তে হল, এই চারটে বছর অনর্থক পুঁথিগত বিদ্যালাভ না করে যদি জমিতে লাঙ্গল দিতুম, একটা গোশালা করতুম, অন্ততঃ পক্ষে পোলট্রি ফারম খুলতুম, দেখতেন আজ কত বড় লোকই না হতে পারতুম, কি চেহারাই না বাগাতুম।"

তাহার উল্লাসে মিলি থতমত খাইয়া গেল, খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বড় লোক কি রকম হতেন বলতে পারিনে, তবে চেহারার জন্যে দুঃখ করবার আপনার কিছু নেই, যা চেহারা আপনার তাই যথেষ্ট। এর পর যদি জমিতে লাঙ্গল দিতেন, মুরগী শূয়োর নিয়ে ঘুরতেন, তাতে পৃথিবীর পক্ষে আপনার ভার বওয়া দুঃসহ হতো।"

নিমাই হাসিল,—

বলিল, "আচ্ছা, আজ আসুন; আমার ওদিকে কাজ আছে, ওঁদের এখনও খাওয়া দাওয়া হয়নি, সে দিকটা আগে দেখাশোনা করা উচিত।"

সে চলিয়া গেল।

(১১)

কলিকাতার বড় ডাক্তার মিঃ ঘোষাল—কেবল কলিকাতাতেই নয়, দেশবিদেশে তাঁহার প্রচুর সম্মান, প্রচুর নাম। তিনি মেডিকেল কলেজে একটা বড় ডিপার্টমেণ্ট পরিচালনার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন,—চিকিৎসাতেও যথেষ্ট নাম করিয়াছেন।

আজ তাঁহার মত লোকের গোকর্ণের মত গ্রামে আসা একেবারেই বিস্ময়কর। সঙ্গে আসিয়াছেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ দত্ত, এদিক হইতে মহকুমা হাকিমও আসিয়াছেন।

গ্রামে লোকসংখ্যা বড় কম নয়। সরকারী ডাক্তারখানার সামনের ময়দানে ডক্টর ঘোষাল স্বাস্থ্য সম্পর্কে বক্তৃতা করিলেন।

গ্রামের লোক আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। ডক্টর ঘোষাল বিলাতে দীর্ঘকাল কাটাইয়াছেন এবং অত বড় একজন ডাক্তার শুনিয়া গ্রামবাসী ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল, ভাবিয়াছিল ডাক্তার ইংরাজীতেই তাঁহার বক্তব্য ব্যক্ত করিবেন, কিন্তু তিনি যখন খাঁটি বাংলায় চলিত ভাষায় কথা বলিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

এস, ডি, ও. শম্ভুনাথ চৌধুরীর সহিত ডক্টর ঘোষাল ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহারা শম্ভুনাথের করমর্দ্দন করিলেন এবং তাঁহারই জন্য যে এ গ্রামের এতটা উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

সন্ধ্যার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সদলবলে বিদায় লইলেন।

গ্রামের অধিকাংশ লোক চলিয়া গেল, রহিলেন শুধু শম্ভুনাথ, নিমাই ও গ্রামের আর দুই একজন মাত্র। শম্ভুনাথ নিস্তব্ধে বোধ হয় ডক্টর ঘোষালের কথাই ভাবিতেছিলেন, তাঁহার চারিদিকে যে সব আলোচনা চলিয়াছিল তাহাতে কান দেন নাই। নিমাই যখন ডাকিল, "উঠুন চৌধুরী মশাই, চলুন, বাড়ী যাওয়া যাক।" তখন তিনি সচেতন হইয়া উঠিলেন।

উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "সত্যি শিক্ষিত লোক বটে, আমাদের গ্রামের অনেক সৌভাগ্য যে এখানকার হাঁসপাতালের এই বার্ষিক উৎসবের দিনে আমরা একজন যোগ্যতর লোককেই পেলুম, কি বল হে বিনয়?"

ডাক্তার বিনয় বিনীত হাসি হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়, ওঁর মত একজন শিক্ষিত গুণী লোককে পাওয়া কি বড় মুখের কথা? উনি ভাগ্যে এ সময় সহরের হাঁসপাতাল ইনস্পেক্‌সান করতে এসেছিলেন তাই ওঁকে পাওয়া গেল।

দেবনাথ চৌধুরী মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "না কিন্তু ওঁর চেয়ে উপযুক্ত লোক আরও ছিল। আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না আজ ডক্টর ঘোষালকে এখানে নিমন্ত্রণ করবার, কারণ সত্যই লোকটাকে যতখানি সম্মান দেওয়া হল, ততখানি সম্মান নেওয়ার পাত্র উনি নন। ওর পূর্ব্ব পরিচয় যে জানে সে—"

নিমাই বাধা দিল, বলিল, "যে সত্যকার পুরুষ হয়, সে নিজের ক্ষমতায় ছোট হতে বড় হয়ে থাকে, ভাগ্যলক্ষ্মী খুব কম লোককেই কৃপা করে থাকেন। আমরা সাধারণ লোক, কারও অতীতের পানে না চেয়ে বর্ত্তমান চেয়েই আমরা পরম সুখী হব। আমরা দেখছি তাঁর বর্ত্তমান কাজ, তিনি সংসারের, দেশের, দশের কতখানি উপকার করেছেন, সেইটুকু।"

বিরক্ত হইয়া দেবনাথ বলিলেন, "কেবল সেইটুকু নিলেই যদি ফুরিয়ে

যেত, তাহলে তো কথাই থাকতো না, মানুষ যত বড়ই হোক, তবু লোকে তাদের অতীত জীবন নিয়ে আলোচনা করে থাকে এ কথা সত্য।"

নিমাই শান্তকণ্ঠে বলিল, "চলার পথ যতই বন্ধুর হোক, যতই কলঙ্কময় হোক, সেই কলঙ্কময় বন্ধুর পথ পার হয়ে ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানোই তো মানুষের বীরত্ব, তার জীবনের সার্থকতা। আপনি কি বলেন—যে ছোট হয়ে জন্মেছে সে বড় হওয়ার অধিকার কোনোদিন পাবে না, তাকে চিরদিন ছোট হয়ে বড়দের পায়ের তলায় পড়ে দলিত পিষ্ট হতে হবে?"

দেবনাথ আগুন হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তুমি থামো নিমাই, ছোট মুখে বড় কথা যে মানায় না, সেটা যদি নাই বুঝতে পারবে, এতখানি লেখাপড়া শিখেছো কেন? আমি তোমার বাবার বয়সী সে কথাটা মনে রেখে নরমস্বরে কথা বোলো।"

নিমাই অত্যন্ত নম্রভাবে নত হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল, বলিল, "আজ্ঞে, সে কথাটা দিনরাত আমার মনে আছে; যদিই কখনও কাজের চাপে ভুলে যাই, আপনারা নিজেরাই তা মনে করিয়ে দেন। আপনি যে আমার পূজনীয় গুরুজন, সে কথা কোনোদিন ভুলব না, অস্বীকারও করব না।"

দেবনাথ খুশী হইয়া বলিলেন, "তা আমি জানি। শশধরের ছেলে তুমি, কখনও আমাদের অস্বীকার করতে পারো? তোমার বাবা শশধর, সে পাঞ্জাবেই যাক আর মাদ্রাজেই যাক, ছোটবেলায় একসঙ্গে বেড়িয়েছি, খেলেছি, সেদিনকার কথা কি ভুলবার? সে সব কথা তোমরা আর কি জানবে বাবাজি, তখন তোমরা কেউ ছিলে না, আমাদের বিয়েও হয় নি। সেদিনকার সেই শশধরের ছেলে, আজ বি. এ. ডিগ্রী পেয়ে যদি আমাদের মত বুড়োদের একেবারে বাদ দিতে চাও, সেটা যে আমাদের কাছে কতখানি কষ্টকর হয়, তা তো তোমরা বুঝবে না বাবাজি।"

নিমাই কেবল একটু হাসিল, শম্ভুনাথের দিকে তাকাইয়া বলিল, "আবার বসলেন যে, উঠুন।"

দেবনাথ বলিলেন, "উঠছেন—অত তাড়াতাড়িই বা কেন, দুটো কথাবার্ত্তাই না হয় হোক। বলছিলুম কি, এতটা জাঁকজমক করার কোনো দরকারই ছিল না, এতটা বাড়াবাড়ি করবার দরকার দাদার ছিল না। ডক্টর ঘোষাল বা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ডাকবার কোনো হেতু ছিল না, আমাদের এস. ডি. ও. যেমন বরাবর এসে থাকেন, তেমনই এসে যা হয় করতেন। আমাদের এখানে যা কিছু কাজ হয়, ওঁকেই আমরা নিমন্ত্রণ করে সভাপতির আসন দিয়ে থাকি, আজ ওঁকে বাতিল করা আমাদের কোনোমতেই উচিত কাজ হল না। দেখলে না—এস. ডি. ওর মুখখানা কিরকম অন্ধকার, দেখে মনে হয়—উনি মোটেই খুশী হন নি; কাজের জন্যে এলেও নিজেকে বেশ একটু অপমানিত মনে করেছেন।"

শম্ভুনাথ মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "তা তা—আমি তো বিশেষ কিছু জানিনে, জানে আমাদের নিমাই, সে-ই সব বন্দোবস্ত করেছে। বলি হ্যাঁ হে নিমাই, এস. ডি. ও. সত্যিই রাগ করেছেন নাকি, ওঁর মুখখানা কি সত্যিই অন্ধকার দেখলে?"

নিমাই রাগ করিয়া বলিল, "ক্ষেপেছেন আপনি, খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে ইচ্ছে করে আজকের এই উৎসবে প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন, এই যে আমাদের পরম সৌভাগ্য; এস. ডি. ও. এজন্যে নিজেকে গর্ব্বিত বলেই মনে করছেন। এস. ডি. ও. কাল আমাকে সঙ্গে করে নিজেই বহরমপুরে ওঁদের নিমন্ত্রণ করতে নিয়ে গিয়েছিলেন, নচেৎ ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে যাওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না।"

দেবনাথ রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার কথাগুলো কিন্তু মোটেই ভদ্রোচিত নয় নিমাই।"

নিমাই বিনীতকণ্ঠে বলিল, "আমার অপরাধ মাপ করবেন, বন্ধুর ছেলে আর নিজের ছেলে একই সমান, যদি কথাবার্ত্তায় এতটুকু ঔদ্ধত্য প্রকাশ হয়ে থাকে, তার জন্যে আমি আগে হতেই ক্ষমা চাচ্ছি। আপনি যে কথাগুলো বলছেন, বাধ্য হয়ে আমাকে তার বিরুদ্ধে অন্যায় জেনেও সত্য কথা বলতে হচ্ছে, তাতে দোষ নেবেন না। আমার কথা—এই লোকে যে যাই করুক, তার অতীত জীবনের কাজ নিয়ে আলোচনা করার দরকার আমাদের নেই; আমাদের কাজ বর্ত্তমান নিয়ে এবং এই বর্ত্তমান নিয়েই আমরা খুশী হয়ে থাকতে চাই।"

শম্ভুনাথকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল, "উঠুন, রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে। আমার পিসীমার অসুখ, আপনাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আমি একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরব।"

শম্ভুনাথ উঠিলেন।

দেবনাথ গজ গজ করিতেছিলেন, তাঁহার পানে না তাকাইয়া নিমাই শম্ভুনাথের সহিত অগ্রসর হইল।

দু চার পা অগ্রসর হইয়া মনে পড়িয়া গেল—রূপার ফুলদানিটা এখনও এখানে পড়িয়া আছে, সেটা লইয়া যাইতে হইবে।

শম্ভুনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিরলে যে—"

নিমাই বলিল, "ফুলদানিটা হাতে করে নিয়ে যাই।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "থাক, আমার লোকজন তো এখানে আছে, গোমস্তাও আছে, ওরাই নিয়ে যাবে এখন।"

নিমাই বলিল, "অনেক জিনিসপত্র আছে ওদের নিয়ে যাওয়ার মত, এটা ছোট জিনিস—আমিই নিয়ে যাই।"

টেবলের উপর মিনা-করা ফুলদানি দুইটি যেখানে ছিল, ঠিক সেইখানে একটি সুন্দর শোভন ফাউণ্টেন পেন খোলা অবস্থায় পড়িয়াছিল।

মুক্তাখচিত এই অতি সুন্দর ও মূল্যবান পেনটিকে দেখিয়াই নিমাই চিনিল, এইটি ডক্টর ঘোষালের ফাউণ্টেন, উপরে তাঁহার নাম জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে—যাহা অতি সহজেই লোকের চোখে পড়ে।

নিমাই ফাউণ্টেনটা নিজের পকেটে ফেলিয়া ফুলদানি দুইটি লইয়া বাহির হইল, পথে গিয়া দেখিল শম্ভুনাথ তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন।

পথ চলিতে চলিতে ফাউণ্টেনটা তাঁহাকে দেখাইয়া নিমাই বলিল, "এই দেখুন, ভাগ্যে ফুলদানিটা আনতে গেলুম তাই ডক্টর ঘোষালের ফাউণ্টেন পেনটাকে পাওয়া গেল। এই মূল্যবান কলমটা খোয়া গেছে জানতে পারলে ডক্টর ঘোষাল যে সারারাত ঘুমাতে পারবেন না তা আমি বেশ বুঝছি। কাল সকালেই হয় নিজে এসে হাজির হবেন, নয় কাউকে পাঠাবেন এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি।"

মাথার উপরে আকাশে জাগিয়াছিল উজ্জ্বল চাঁদ, তাহার উজ্জ্বল শুভ্র আলোয় পেনটার পানে তাকাইয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "ওই আবার তোমাদের এক ফ্যাশান। আমাদের কালে এ সবের চলন ছিল না, সোজা দোয়াত কলম দিয়ে কাজ চলতো বাপু, তাতে সামান্য একটু ফ্যাঁসাদ থাকলেও হারানোর ভয় ছিল না।"

উভয়ে চলিতে ছিলেন।

জ্যোৎস্নার শুভ্র আলোয় সব কিছু উজ্জ্বল দেখাইতেছিল, স্নিগ্ধ মৃদু বাতাসে গাছের পাতাগুলা ঝির ঝির করিয়া কাঁপিতেছিল, তাহার সর সর শব্দ কানে আসিতেছিল।

নিমাই কি ভাবিতেছিল, হঠাৎ শম্ভুনাথের কণ্ঠস্বরে চমকাইয়া উঠিল।

শম্ভুনাথ বলিতেছিলেন, "দেশে হয়তো আরও ভালো কাজ করা যেতো নিমাই, হলো না কেবল এই দলাদলির জন্যে। ওই যে আমার সব

আত্মীয়স্বজন রয়েছে, যারা আমার জ্ঞাতি, মরলে অশৌচ বহন করতে হয়, ওরাই দেয় পদে-পদে বাধা; ওরাই চায় আমাকে একেবারে ছোট করে ফেলতে। অনেক কাজ করবার ইচ্ছে আমার ছিল—এখনও আছে, তবু করতে পারলুম না কেবল এই সব আত্মীয়দের জন্যে; এরা আমার সকল উৎসাহ নষ্ট করে দিলে।"

তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

নিমাই বলিল, "দলাদলি সব দেশে সব সমাজেই আছে, পাড়াগাঁয়েই যে শুধু আছে, তা নয়। তবু যারা সত্যিকার মানুষ হয়; যার বুকের মধ্যে দরদী প্রাণ আছে, সেই প্রাণ গ্রামের দুঃখে কাঁদে,—সকল বাধা ঠেলে তারা এগিয়ে যাবেই, ঝড়ের শক্তি নিয়ে সকল বাধা সে উড়িয়ে দেবে, আগুনের দহনে যা কিছু মন্দ পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। আসুক না শত বাধা, করুক না লোকে হাজার মুখে নিন্দা, তাতে তার এতটুকু ক্ষতি বৃদ্ধি করতে পারবে না।"

শম্ভুনাথ বিষন্নকণ্ঠে বলিলেন, "বাইরের শত্রুকে পার আছে নিমাই, জ্ঞাতি শত্রুকে কেউ কোনোদিন এড়াতে পারে নি, পারেও না। অতি ক্ষুদ্র ত্রুটি ওরা খুঁজে বেড়াচ্ছে—আর পায়ও ঠিক তাই, আমি তাই দেখেই না আশ্চর্য্য হই।"

মৃদুকণ্ঠে নিমাই বলিল, "শকুন যত উপরেই উঠুক, তার দৃষ্টি ঠিক ভাগাড়েই থাকে চৌধুরীমশাই; তাদের চোখ খুঁজে বেড়ায় কোথায় মড়া পড়ে আছে।"

উৎসাহিত হইয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "ঠিক কথা বলেছো, হ্যাঁ, তোমার এ উপমাটা আমি ঠিক মেনে নিলুম। এই দেখ না,—হাতে হাতে প্রমাণ দিচ্ছি, আমাদের মহামায়া দিব্য কলকাতায় ছিল, এবারে বি. এ. একজামিনটা দিত, তবু যা হোক, ওর মনেও একটা সান্ত্বনা থাকতো।

আর কয়দিনই বা বাকি ছিল একজামিনের, তবু তো একটা ডিগ্রী পেত, হল না কেবল এই গ্রামের লোকেদেরই জন্যে, না ? আমাকে যা না তাই বলার জন্যেই না তোমায় পাঠিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে এলুম। এখানে এসেও তেমনি অবস্থা, যেন জেলখানায় বন্দী হয়েছে,—একটা মিশবার লোক পর্য্যন্ত নেই, একটা কথা বলবার লোকও নেই।"

নিমাই বলিল, "পরের কথা শুনে ওঁকে এই সময়ে আনাটা সত্যই আপনার অন্যায় হয়েছে, চৌধুরীমশাই। এতো বড় কম দুঃখের কথা নয় যে সামনে মার্চ্চ মাসে ওঁর একজামিন, আপনি এই কয় মাস আগেই তাঁকে টেনে আনলেন। যাই হোক, এখানে প্রাইভেট পড়ে একজামিনের সময় কলকাতায় গিয়ে একজামিনটা দিয়ে আসবেন। তবে এখানে যখন ওঁকে থাকতেই হবে, এখানকার অবস্থার সঙ্গে ওঁকে খাপ খাইয়ে নিতেই হবে, এতে ওঁর কাহিল অবস্থা হওয়ার কোনো মানে নেই।"

শম্ভুনাথ একটা হাই তুলিয়া বলিলেন, "যদিই হয় তাতে তো আর কথা বলা চলে না বাপু, সেই জন্যেই বলছি তুমি যদি এক আধবার আমাদের বাড়ী যাও, ওর সঙ্গে দুদণ্ড কথাবার্ত্তা বল, পড়ার বিষয়টা আলোচনা কর, তাহলে ওর প্রাণটা বাঁচে। তুমি বলবে—লোকে নিন্দে করবে, কিন্তু এইমাত্র তুমিই বলেছো লোক-নিন্দেয় পেছিয়ে গেলে কোনো কাজ-ই হয় না, কাজেই তুমিও কান দেবে না আশা করি।"

নিমাই খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর বলিল, "দেখি, যদি আমার কাজের মধ্যে সময় হয় যেতে পারব, না হয় পিসীমার অসুখটা ভালো হোক, তখন তাঁকে পাঠিয়ে দেব।"

মুখ ফুটিয়া সে বলিতে পারিল না মিলি তাহাকে মোটেই পছন্দ করে না, রীতিমত অবজ্ঞা করে।

তারণের হাতে শম্ভুনাথকে সমর্পণ করিয়া নিমাই যখন ফিরিতেছিল, তখন হঠাৎ তাহার দৃষ্টি দ্বিতলের খোলা জানালার উপর পড়িল।

ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছিল, বাহিরে ছিল ভাদ্রের মেঘমুক্ত নীল আকাশের মুক্তা-শুভ্র চাঁদের আলো; জানালায় যে দাঁড়াইয়াছিল সে যে মিলি ছাড়া আর কেহ নহে, তাহা বুঝিতে নিমাইয়ের বিলম্ব হইল না।

নিমাই মুখ তুলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র তাহার পানে তাকাইল, তাহার পর হন হন করিয়া পথ চলিল।

পথের পাশেই পুঁটুর মায়ের জীর্ণ কুটীরখানি, বেড়ার দেয়ালে মাটি লেপা, সে-মাটি অনেক জায়গায় খসিয়া পড়ায় ঘরের ভিতরকার প্রদীপের আলোর মৃদুচ্ছটা বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল। ঘরখানা একদিকে হেলিয়া পড়িয়াছে, কোনদিন হয়তো হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যাইবে,—ইহাই পুঁটুর মায়ের স্বামীর ভিটা, পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

ঘরের ভিতরে জ্বরে অচেতন মেয়েটিকে বুকে ধরিয়া পুঁটুর মা হয়তো বসিয়া আছে, তাহার যুগল চোখের দৃষ্টি হয়তো পুঁটুর মুখের উপরে ন্যস্ত; সারারাত্রি তাহার এমনইভাবে কাটিয়া যাইবে, সকালে আবার তাহাকে কাজ করিতে ছুটিতে হইবে, নহিলে পেট চলিবে না।

দুর্ভাগিনী বাংলার মেয়ে—

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিমাই দাঁড়াইল। একবার ভাবিল পুঁটুর মায়ের সহিত কথা বলিয়া কাজ নাই, কারণ কোনোদিনই পুঁটুর মা তাহার সামনে আসে নাই; আবার ভাবিল—কাল সকালে আটটার মধ্যে বিনয় ডাক্তার পুঁটুকে দেখিতে আসিবে সে কথাটা পুঁটুর মাকে জানাইয়া যাওয়া দরকার।

খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া সে ডাকিল, "পুঁটু, পুঁটু কি জেগে আছ?"

কেহ উত্তর দিল না, কেবল দরজাটা খুলিয়া গেল, সেই দরজার উপরে দেখা গেল পুঁটুর মাকে।

নিমাই তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "কাল সকাল আটটার মধ্যে বিনয় ডাক্তার আসবেন, অন্ততঃপক্ষে সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত যেন বাড়ীতে থাকা হয়। আজ আমাদের ডাক্তারখানায় খুব বড় মিটিং ছিল, কলকাতা হতে ডক্টর ঘোষাল আরও অনেক লোক এসেছিলেন, সে জন্য ডাক্তার আসতে পারেন নি, কাল সকালে আসবেন।"

নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া খুশী মনে সে পথ চলিল। খানিকদূর গিয়া পিছন ফিরিয়া একবার চাহিয়া দেখিল—কুটীরের দরজা তখনও খোলা এবং সেই দরজায় পুঁটুর মা তখনও দাঁড়াইয়া আছে।

(১২)

"মৃদুলা—মৃদুলা—"

পুঁটুর মা চমকাইয়া উঠে, তাহার তন্দ্রা টুটিয়া যায়, সে উঠিয়া বসে। ঘরে আলো জ্বলে, সেই আলোয় সে চারিদিক তাকাইয়া দেখে—ঘরে কেহ নাই, পুঁটু তাহার কোলের কাছে ঘুমাইতেছে। তাহারই জোর নিঃশ্বাস টানার শব্দটাই তন্দ্রাচ্ছন্ন মনে "মৃদুলা" নাম ধরিয়া কোন সেই অতীত আহ্বানের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছে।

ঘরের কোনে প্রদীপ শিখা স্তিমিত অবস্থায় কাঁপিতেছিল, বেড়ার ফাঁক দিয়া নৈশ বাতাস প্রবেশ করিয়া শিখাটিকে কাঁপাইতেছে। মৃদুলা প্রদীপ শিখা বাড়াইয়া দিল, বেড়ার ফাঁকে পুঁটুর একখানা ছিন্ন বস্ত্র ঠাসিয়া দিয়া বাতাস আসার পথ বন্ধ করিয়া দিয়া আ[illegible] শুইয়া পড়িল, তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া [illegible]।

"মৃদুলা—মৃদুলা,—"

কে যেন ডাকে।

বাহির সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ,—এ তাহারই অন্তরের ধ্বনি মাত্র, কোন এক হারানো দিনের স্মৃতি।

কে কবে তাহাকে ডাকিয়াছিল, কে কাছে আসিয়াছিল, তাহার স্মৃতি রাখিয়া গেছে মনের মাঝে, আজ তাহার উপর হাজার আচ্ছাদন দিলেও অন্তরের সে মরে নাই, কোন দিন কোন এক দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে সুযোগ পাইয়া জাগিয়া উঠে।

পাগল, স্মৃতি কখনও মন হইতে মুছিয়া যায়?

মৃদুলার দুই চোখ দিয়া নিঃশব্দে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কোথায় ছিল সে, আজ সে আসিয়াছে কোথায়? এই ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর, এই দারিদ্র্য, প্রতিদিনকার ছোট বড় সহস্র অনটন, লোকের দুয়ারে দাসীবৃত্তি, মৃদুলার অদৃষ্টে এও ছিল?

ভগবান,—

মৃদুলা চমকাইয়া উঠে।

তবু সে ভগবানকে আজও ডাকে, আজ ও বিশ্বাস করে,—নিজের জন্য নয়,—তাহার মেয়ের জন্য, তাহার জীবন সর্ব্বস্বধন পুঁটুর জন্য। নিজের জন্য সকল প্রার্থনা তাহার শেষ হইয়া গেছে, আজও তবু সে প্রার্থনা করে—তাহার পুঁটুর জন্য।

নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে।

অনুপম সুন্দরী ছিল তাহার মা, ক্ষুদ্র গৃহে তাহার উজ্জ্বল রূপ ধরিত না, উপছাইয়া পড়িত। সকল মা যেমন সন্তানকে ভালোবাসে, তেমনই তাহার মাও যে তাহাকে ভালোবাসিত তাহাতে তাহার সন্দেহ নাই, তবু সে ভাবিয়া পায় না—মা কেমন করিয়া একদিন রাত্রে তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সেই রাত্রের কথা আজও সে ভুলিতে পারে নাই। পাশ

ফিরিতে গিয়া হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, অন্ধকার ঘরে হাত বাড়াইয়া সে মাকে খুঁজিয়াছিল,—শূন্য শয্যায় মাকে সে পায় নাই।

মাকে হারাইয়া সে পাইল পিতাকে এবং পিতাকে নির্ভর করিয়াই সে বাঁচিয়া রহিল।

একে একে কাটিল কত দিন, কত মাস, কত বৎসর, শিশু মৃদুলা যৌবনে পদার্পণ করিল।

এই সময়ে আসিল মণিময় ঘোষাল।

মণিময়ের মাসীমার বাড়ী এখানে, ছুটিতে সে বেড়াইতে আসিয়া সুন্দরী মৃদুলাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। আলাপ পরিচয় করিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না, এবং সে নিজেই নিজের বিবাহের প্রস্তাবও করিয়া বসিল। ধনী গৃহের একমাত্র পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ হইবে এই আনন্দে দরিদ্র পিতা উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, মৃদুলার আনন্দও গোপন রহিল না।

দশ দিনের জন্য মাসীমার বাড়ী আসিয়া এক মাস থাকিয়া মণিময় বিদায় লইল, কথা দিয়া গেল ঢাকায় গিয়াই সে পিতামাতাকে বিবাহের কথা জানাইবে ও সামনের মাসেই বিবাহ করিয়া স্ত্রীরূপে মৃদুলাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবে।

পিতা ও কন্যা উৎসুকভাবে তাহার আশাপথ চাহিয়া রহিলেন।

দিনের পর দিন আসে; সামনের মাস আসিল এবং অতীত হইয়া গেল, মণিময়ের নিদর্শন পাওয়া গেল না। মৃদুলা পিতাকে লুকাইয়া পত্র দিল, উত্তর আসিল না। দরিদ্র পিতা ধার করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া একদিন ঢাকায় মণিময়ের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেখান হইতে যে অবস্থায় তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তাহাও মৃদুলার মনে আছে। মণিময় বিলাতে চলিয়া গেছে, এখানে সে ডাক্তারী পাশ

করিয়াছিল, বিলাতে গিয়া সে সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ফিরিবে। মণিময়ের পিতা দরিদ্র মৃদুলার পিতাকে দারোয়ান দিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়াছেন,—যৎপরোনাস্তি অপমানও করিয়াছেন।

তাহার পর?

তাহার পর আর কি।

মৃদুলার বিবাহ হইল সুদূর মুর্শিদাবাদে আসিয়া; মৃদুলা আসিল স্বামীর গৃহে গোকর্ণ গ্রামে, স্বামীর কুটীরে সে আশ্রয় পাইল, মাত্র এক বৎসরের জন্য সে শাঁখা সিঁদুর পরিয়া বাংলার সাধ্বী নারীর শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু সে স্বামীও বেশীদিন বাঁচিল না, মৃদুলাকে জগতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য পুঁটুকে দিয়া সে তাহাকে মুক্তি দিয়া গেল।

মৃদুলা শতবার—সহস্রবার বলিয়াছে—এ মুক্তি কেন, কে চাহিয়াছিল এ মুক্তি,—সে তো মুক্তি চাহে নাই। সংসারের আর পাঁচজন মেয়ের মত সেও চাহিয়াছিল সুখে শান্তিতে স্বামী পুত্র কন্যা লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে, বাংলার বিধবা শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকার কামনা সে তো কোনোদিন করে নাই।

সে আজ কত দিনের কথা।

মৃদুলা হিসাব করিয়া দেখে সে আজ এগারো বৎসরের কথা, তখন তাহার বয়স মাত্র পনেরো যোল বৎসর মাত্র।

তরুণ মনে কত ছিল আশা, সেই তরুণ মনে প্রথম এই আশার বীজ রোপণ করিয়াছিল মণিময়,—সে বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেছে।

দীর্ঘ এগারো বৎসর পরে আজ এখানেও আসিয়াছে সেই মণিময়, যাহাকে সে অন্তর হইতে মুছিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে। মণিময় ফিরিয়াছে, বড় কাজ পাইয়াছে, যথেষ্ট নাম করিয়াছে। আজ কোথায় মণিময়, আর কোথায় মৃদুলা?

মৃদুলার চোখ দিয়া অজস্রধারে জল ঝরিয়া পড়ে, সে চুপি চুপি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে।

বাহিরে স্ফুট জ্যোৎস্নায় জাগিয়া উঠিয়া একটা নাম-না-জানা পাখী কোথায় বসিয়া ঘুম-জড়ানো কণ্ঠে থাকিয়া থাকিয়া ডাকিতেছে। অদূরে কোথায় কে জানি জ্যোৎস্নালোকে বাঁশী বাজাইতেছে, তাহার করুণ সুরে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে।

বাঁশীর করুণ সুর মনের গোপন ব্যথা জাগাইয়া তোলে, বাঁশী অনেক কথাই টানিয়া আনে। মৃদুলা সহ্য করিতে পারে না, বাঁশী থামিয়া গেলে সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে; সে ঘুমাইতে পায়। বাঁশী থামিল না, নিস্তব্ধ রাতে বাঁশীর সুরে কান্না ঝরিয়া পড়ে। বাঁশী কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাহাকে ডাকিতেছে—এসো গো, ফিরে এসো,—সুর যেন ভাষা পাইয়াছে।

কোন সেই পুরাতন দিনে গাওয়া গানটি মনে পড়ে—

আমার সব সুখদুখমন্থনধন—
অন্তরে ফিরে এসো—
এসো হে ফিরে এসো।

কে চলিয়া গেছে, কে কাহাকে ডাকিতেছে, যুগ যুগান্তর ধরিয়া চিরবিরহী হিয়া এই একই সুরে, একই ভাষায় ডাকিতেছে, তাহার চিরাকাঙ্ক্ষিত প্রিয়কে—যে চলিয়া গেছে অনেক দূরে, জীবনে যাহার নাগাল আর হয়তো কোনোদিনই পাওয়া যাইবে না। তাই বিরহী হিয়া জীবনে জাগরণকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে—

আমার মুখের হাসিতে এসো হে—
আমার চোখের সলিলে এসো—
আমার শয়নে আমার স্বপনে—
আমার জীবনে মরণে এসো—

জাগরণের ওপারে নিদ্রা, তবু তাহাতে আছে মধুর স্বপ্ন, যাহার বুকে আশার অতীতেরও দেখা মিলে, জীবনের ওপারে আছে মৃত্যু,—অন্ধকার, শীতল, তবু তাহার বুকেও উষ্ণ আলোকের কল্পনা করা অসম্ভব নহে।

মৃদুলা হাঁপাইয়া উঠে।

সর্ব্বনাশা বাঁশী, ওরে তুই থাম, একেবারে থামিয়া যা, মৃদুলার সর্ব্বনাশ করিস নে। মৃদুলা ঘর বাঁধিয়াছে, সে শান্তিতে কাল কাটাইতে চায়, সব আশা ছাড়িয়া দিয়াও সে পুঁটুকে লইয়া সংসার পাতিতে চায়, তাহার সে আশা ঘুচাইয়া দিস না।

কখন বাঁশী থামিয়া গেল, মৃদুলার দুই চোখ ভরিয়া কখন ঘুম নামিয়া আসিল।

জানালার ফাঁক দিয়া প্রভাত সূর্য্যের অরুণ আলো ঘরের মেঝেয় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহারই স্পর্শে মৃদুলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। এই সকালেই ডাক্তার আসিবেন কথা আছে, ইহার মধ্যে কাজকর্ম্মগুলি সারিয়া লওয়া চাই।

পুঁটু ঘুমাইতেছে।

মৃদুলা অতি সন্তর্পণে তাহার গায়ে হাত দিল।

জ্বর কমিয়া আসিয়াছে, একেবারে এখনও ছাড়ে নাই। মৃদুলা গৃহকর্ম্ম সারিতে নিযুক্ত হইল।

সকালবেলাই বড়তরফে একটা খবর দিয়া পাঠানো উচিত; তাঁহারা জানিতে পারিবেন না আটটা পর্য্যন্ত মৃদুলাকে ডাক্তারের প্রতীক্ষায় বাড়ী থাকিতে হইবে।

পথে কালু বাগ্‌দীকে দেখা গেল; অদূরে বাগদীপাড়ায় তাহার বাড়ী, দেবনাথ চৌধুরীর বাড়ীতে সে কাজ করে।

মৃদুলা তাহাকে ডাকিল—"বাবুপাড়ার দিকেই তো যাচ্ছো কালু,

একটিবার যদি বড়তরফে খবর দিয়ে যাও—আমি আটটার পরে যাব, ডাক্তার আসবে কিনা তাই—”

কালু বাগদী গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, “না বামুনমা, আমি তো ওদিকে যেতে পারব না; এ কথা শুনলে আমার বাবু আমাকে জবাব দেবেন।”

মৌখিক সম্প্রীতি থাকিলেও জ্ঞাতিদের মধ্যে চৌধুরীবংশের এমনই বিরোধ ছিল, দাস-দাসীরাও তাহা জানে।

কাতরভাবে মৃদুলা বলিল, “তুমি চুপি চুপি তারণ কি আর যাকে পাও, কথাটা বলে যেয়ো কালু, আমার এই উপকারটি কর। ওঁরা জানেন না, দেরী দেখে হয়তো রাগ করে কাজ হতে ছাড়িয়ে দেবেন, তখন এই মেয়েটি নিয়ে পেটের দুটো ভাতের জন্যে আবার কার দ্বারস্থ হব কালু?”

বামুনমায়ের কাতরতা কালু বাগদীর অন্তরে আঘাত দিয়াছিল, সে তাই রাজি হইল; কিন্তু যাইবার সময় মৃদুলাকে সতর্ক করিয়া দিল—যেন কোনোক্রমে প্রকাশ না হয় সে বড়তরফে যাইতেছে, তাহা হইলে মেজোতরফে তাহার অন্ন মারা যাইবে।

সব ব্যবস্থা ঠিক হইল, ডাক্তারের দেখা নাই। বেলা বাড়িয়া উঠিতেছে, সময় দ্রুত আগাইয়া চলিল, ডাক্তার আসিয়া পৌছাইল না। মৃদুলা ছটফট করিতে লাগিল।

বাহিরের বার্তা তাহার কানে পৌছায় নাই। তাহার ঘরের বাহিরে গ্রামের বুকে তখন তুমুল আন্দোলন পড়িয়া গেছে এবং সেইজন্যই বিনয় ডাক্তার পথে আসিতে বাধা পাইয়া ফিরিয়া সোজা ডাক্তারখানায় গিয়াছেন।

ইহার নায়ক নিমাই; গত রাত্রে সে পুঁটুর মায়ের দরজায় দাঁড়াইয়া

কথা বলিয়াছে, এই কথাটুকুই শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া সমস্ত গ্রামে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পুঁটুর মায়ের কুটীরে সে কথা না পৌঁছাইলেও সকল গৃহে গিয়া পৌঁছাইয়াছে।

একই ঢিলে লোকে দুই পাখী মারিবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায়, দেবনাথ চৌধুরী এক ঢিলে তিন পাখী মারিয়াছেন। অব্যর্থ লক্ষ্যে দর্পিতা পুঁটুর মা, উদ্ধত নিমাই এবং নিমাইকে জড়াইয়া বড়তরফ অর্থাৎ শম্ভুনাথকে জব্দ করিবার সুযোগ তিনি পাইয়াছেন—এবং এ সুযোগ তিনি হারান নাই।

সুন্দরী পুঁটুর মায়ের উপর গ্রামের অনেকেরই লক্ষ্য ছিল, তাহাকে এতটুকু সাহায্য করিতে পারিলে অনেকেই চরিতার্থ হয়, কিন্তু দর্পিতা এই নারী সকলকেই অবহেলা করিয়াছে, কাহারও এতটুকু সাহায্য সে এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই। তাহার উপর অনেকের আক্রোশ থাকিলেও এতটুকু অত্যাচার করিবার যো ছিল না, কারণ বড়তরফের মৃত গোমস্তার স্ত্রী বলিয়া আশ্রিতা হিসাবে সে বাস করিত, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছিলেন শম্ভুনাথ নিজে। তাঁহার ভরসাতেই এই অল্পবয়স্কা সুন্দরী মেয়েটি নিজের কুঁড়ে ঘরে মেয়েটিকে লইয়া বাস করিতে সাহসী হইয়াছিল।

পুঁটুর মায়ের সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অনেক কল্পনা জল্পনা চলিয়াছে, অনেক কথা হইয়াছে, কেহ সাহস করিয়া তাহার সামনে কোনো কথা বলিতে পারে নাই। তাহার নামে কেহ প্রত্যক্ষভাবে কলঙ্ক আরোপ করিতে কোনোদিন পারে নাই, অথচ সকলেই এই সুযোগটির প্রত্যাশায় ছিল, আজ দৈবাৎ সেই সুযোগ মিলিয়া গেছে।

নিমাইয়ের উপরেও দেবনাথ চৌধুরীর বড় কম রাগ ছিল না।

কিছুদিন আগে এই ছেলেটির সহিত নিজের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব

তিনি অন্য লোককে দিয়া করাইয়াছিলেন, নিমাই স্পষ্টই বলিয়াছিল, সে দরিদ্র বলিয়াই ধনী জমিদার কন্যাকে এখন বিবাহ করিতে পারিবে না ; যদি কোনোদিন সে ধনী হয়, অবস্থার সহিত মিলাইয়া তখন সে বিবাহ করিবে।

এই কথায় দেবনাথ বড় কম অপমানিত হন নাই। নিমাইকে সে কোন রকমে জব্দ করিবেন এই হইয়াছিল তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প, এবং এই উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি সুযোগের প্রত্যাশায় ছিলেন, সে সুযোগ তাঁহার আসিয়াছে।

আটআনি জমিদার শম্ভুনাথের উপর তাঁহার দ্বেষ বড় কম ছিল না। নিমাইকে কোনোরকমে জব্দ করিতে পারিলে শম্ভুনাথের দক্ষিণ হস্ত অচল হইয়া পড়িবে। আর যে সব কর্ম্মচারীরা বড় তরফে কাজ করে তাহাদের তিনি কেয়ার করেন না। সেবার পুরন্দরপুরের জমি লইয়া যখন বড় ও মেজ তরফে বিবাদ বাধে, তখন গোমস্তা প্রভৃতিকে হাত করিয়া লইতে দেবনাথের এতটুকু কষ্ট পাইতে হয় নাই। সব ঠিকঠাক হইয়াছিল, এমনই সময় নিমাই আসিয়া পড়িয়া গোলমাল বাধাইয়াছিল বড় কম নয়, যাহাতে দেবনাথ কেবল পরাজিতই হন নাই, তাঁহাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেও হইয়াছিল।

দেবনাথের অন্তরের পুঞ্জীকৃত ক্রোধ এতদিন ধূমোদ্গিরণ করিয়া এইবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে; একসঙ্গে সকলকে অপমানিত, নির্য্যাতিত করিবার জন্য তিনি দাঁড়াইয়াছেন। পুঁটুর মায়ের বাড়ীতে গিয়া রোগী দেখা তাই বিনয় ডাক্তারের পক্ষে সম্ভব হইল না।

বেচারী পুঁটুর মা,—সে কিছুই জানিল না। দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অবশেষে অসুস্থ পুঁটুকে বাড়ীতে রাখিয়াই সে কেবলমাত্র কাজ বাঁচাইবার জন্যই কাজে গেল।

(১৩)

শম্ভুনাথ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কি দরকার ছিল বউমা অসুস্থ মেয়েকে ঘরে রেখে কাজে আসবার ; একদিন না এলে কি হতো না ?"

অর্দ্ধাবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে চাপাস্বরে মৃদুলা বলিল, "না এলে আপনাদের যে খাওয়া হবে না বাবা—"

"হ্যাঁ, খাওয়া নাকি হবে না—"

শম্ভুনাথ প্রচুর হাসিতে লাগিলেন, তাহার পর হাসি থামাইয়া বলিলেন, "তাই কি হয় বউ মা, খাওয়া বন্ধ করে কেউ কোনোদিন থাকে দেখেছো ? হ্যাঁ—বলতে পারো—তরকারিটাই না হয় হবে না, বলি, আলু সিদ্ধ ভাত কেউ তো বন্ধ করতে পারবে না। এতকাল এই খেয়েই তো কাটিয়ে এসেছি, আজও না হয় তাতেই চলতো। ওই যে কি বলে,—একটা যে কথা আছে না—ওই যে,—

কথাটা মনে আসে না, অপ্রস্তুত শম্ভুনাথ মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। পাশেই তারণকে দাঁত বাহির করিতে দেখিয়া তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন, "আমি কথাটা ভেবে পাচ্ছিনে আর তুই বেটা দিব্যি দাঁত বার করে হাসছিস, তোর লজ্জা করছে না একটু ? সেই কী কথাটা, সেই যে আমি দিনকতক খুব বললুম—"

তারণ ঘাবড়াইয়া গেল, কি কথা কবে তিনি বলিয়াছেন, দীর্ঘকাল পরে সে আজ তাহা মনে করিতে পারে না। না বলিতে পারিলে লাঞ্ছনা কম জুটিবে না এবং এইরূপভাবেই তাহাকে গালাগালি সহ্য করিতে হয়। শম্ভুনাথ যে সব কথা হারাইয়া ফেলেন, সে সব খুঁজিয়া আনিতে হইবে তারণকে, এবং এইটি তামাক সাজার মতই একটি প্রধান ও অবশ্য করণীয় কাজ বলিয়া গণ্য।

বুদ্ধিমান তারণ ধাঁজ বোঝে, কয়েক সেকেণ্ড মাত্র ভাবিয়া উত্তর দিল, "সেই কথা বাবু—যদি থাকে আগে পাছে, কি করে রে শাকে মাছে।"

হারানো হাজার টাকা পাইয়া লোকে যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, শম্ভুনাথ তেমনই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, সোল্লাসে বলিলেন, "ঠিক, এই কথাই বটে। হতভাগা কোথাকার এতক্ষণ মনে করিয়ে দিতে পারো নি, শুধু আমায় ভাবিয়ে মারছো। হ্যাঁ, এই কথাই আমি বলেছিলুম বউ মা, যদি দুধ আর ঘি থাকে, কুছ পরোয়া নেই, একটা আলুভাতে উপলক্ষ্য করেও খাওয়া চলে। তাই বলছি, মেয়েটার যে কয়দিন অসুখ থাকবে, তোমার এসে দরকার নেই। আজ আমার ভাত রান্না হয়ে গেছে, ও বেলা লোচনের বোন রাঁধবে, যে কয়দিন তুমি না আসতে পারো—সে-ই করবে বলেছে।"

মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার হাতে কিছু নেই বুঝেছি। খরচের দরকার হবে তো, পুঁটুর পথ্য আছে, তোমার নিজের যাহোক একবেলা খাওয়া আছে, এই টাকা কয়টা নিয়ে যাও।"

তিনি সামনের হাত বাক্সটা খুলিয়া খুচরা দশটা টাকা বাহির করিয়া বলিলেন, "নোট দেব না, ভাঙ্গাতে ফ্যাসাদে পড়বে, খুচরো টাকা কয়টা নিয়ে যাও। আর যখন যা কিছু দরকার হবে, কোনো লজ্জাসঙ্কোচ না করে আমার কাছ হতে চেয়ে নিয়ে যেয়ো।"

মৃদুলা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার চোখে জল আসিয়াছিল, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "আপনি আমাকে মাসিক যে টাকা দেন, তার আড়াইটাকা এখনও আমার কাছে আছে বাবা, ওতেই এখন আমাদের খরচ চলে যাবে। আপনার দয়াতেই তো এই কয় বছর খেয়ে পরে বেঁচে আছি, নইলে এতদিন কোথায় ভেসে যেতুম—"

অসহিষ্ণু শম্ভুনাথ বলিয়া উঠিলেন, "থাক থাক, অতটা কৃতজ্ঞতা আর

নাই বা জানালে, ওসব আমার গরম ধাতে সহ্য হয় না বাপু। আমি কিছু বিলিয়ে দিচ্ছিনে, নেহাৎ নাকি পুঁটুর বাপ অনেক কাল আমার কাছে কাজ করেছিল, তারই জন্যে আমি তার স্ত্রী কন্যাকে দেখছি, এতে এমন কিছু বাহাদুরী নেই। তুমি বুঝি যার তার কাছে এসব কথা বলে বেড়াও বউমা—এ কিন্তু আমি মোটেই পছন্দ করিনে। তোমায় তাই অনেক আগেই আমি বার বার বারণ করেছি, সে-কথা বোধ হয় ভুলে যাও নি।"

মৃদুলা গোপনে চোখ মুছিয়া বলিল, "না বাবা, সামান্য মৌখিক ধন্যবাদ জানানো আমার ভালো লাগেনা—জানি তাতে দাতাকে অপমানই করা হয় মাত্র। আমি কারও কাছে না বললেও লোকের জানতে তো বাকি নেই বাবা—।"

"বলনি তবু লোকে জানে—"

শম্ভুনাথ মুখভঙ্গী করিলেন,—

"পার তো আজ আবার সারা গাঁয়ে ঢেঁটরা পিটিয়ে দিয়ো—তোমায় আবার দশটাকা দিলুম। এই কথাটি নিমাইয়ের কাণেও যাবে—সে তো কাণ উঁচু করেই আছে, একবার শুনতে পেলে হয়। যেমন শোনা তেমনই ছুটে আসবে আর যা না তাই বলবে,—এ যেন নিজের ঘরে নিজে চোর হয়েছি বাপু, এতটুকু স্বাধীনতা নেই। কাউকে কিছু যে হাতে তুলে দেব তার যোটি নেই, খাড়া পাহারা দিয়ে রয়েছে আমার নিমাই চন্দর,—পাঞ্জাবি পালোয়ান—"

অত্যন্ত রাগ করিয়াই তিনি ঘন-ঘন তামাক টানিতে লাগিলেন।

মৃদুলা মাথা নত করিয়া তখনও সামনে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

শম্ভুনাথ তাহা দেখিতে পাইলেন না, আপন মনেই বলিয়া চলিলেন, "একটা কথা শোন বউমা, তুমি যে তোমার স্বামীর ওই ভাঙ্গা ভিটে ছেড়ে

আর কোথাও বাস করতে পারবে না তা জানি। কতবার বলেছি আমার এতবড় বাড়ী—জনশূন্য—খাঁ খাঁ করছে—এখানে এসে যে কোনো একটা ঘর নিয়ে থাকো। আমার একটি কথা কাণে তুললে না, ওই ঘরেই মেয়েকে নিয়ে থাকলে। আমিও রাগ করেছি বাপু, দেখলুম—শেষ পর্য্যন্ত তুমি কি কর; এখন দেখছি জিদের বশে এই মেয়েটার অসুখ করালে তুমিই নিজে। তারণ বলছিল ঘরের চাল নাকি অনেক জায়গায় সরে গেছে, সেখান হতে জল পড়ে নাকি পুঁটু ভিজেছিল, তাইতেই তার অতবড় অসুখটা হয়েছিল—"

বলিতে বলিতে তিনি তারণের পানে তাকাইলেন—"সংয়ের মত দাঁড়িয়ে রইলি যে, যা সত্যি তাই বল না—ভয়টা কিসের তোর।"

মৃদুলা বলিল, "ওকে আর বলতে হবে না, আপনার কথা যে সত্যি তা আমি স্বীকার করছি।"

রুষ্টভাবে শম্ভুনাথ বলিলেন, "স্বীকার না করার উপায় আর আছে, স্বীকার করতেই হবে যে। এখন ঠেকে বুঝেছো বাছা, আগে বুঝতে চাও নি তাই বুড়ো মানুষের কথা উড়িয়ে দিয়েছো। তোমাদের বয়েসটাই খারাপ, রক্তের জোর আছে কিনা, ভালো মন্দ বিবেচনা না করে নিজেদের জিদটাই বজায় রাখো—যেমন আমার নিমাই চন্দর করে।"

নিমাইয়ের কথাটাই সব সময় মনে পড়ে।

শম্ভুনাথ মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন, "কি আর বলব বল; পরের মেয়ে, তারপরে স্ত্রীলোক, তোমায় কিছু বলা চলে না। থাকতো যদি যাদব, তোমায় আমি জব্দ করতুম বউমা, ওই মেয়েকে কেড়ে নিয়ে নাকের জলে চোখের জলে এক করাতুম।"

মৃদুলা চুপ করিয়া রহিল; কথা বলিতে গেলেই বাড়িবে তাহা সে জানে।

শম্ভুনাথ বলিলেন, "নাও, আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, টাকা কয়টা আঁচলে বেঁধে বাড়ী যাও। হ্যাঁ, আসল কথাটা বলতে ভুলে গেছি, কাল তোমার বাড়ী জনমজুর যাবে, নতুন করে না হোক, নতুন খড় দিয়ে ঘরটা ভালো করে ছেয়ে দেবে যাতে জল আর না পড়ে। আবার যেন দাঙ্গা করতে যেয়ো না তাদের সঙ্গে। মেয়েদের অত তেজ দর্প থাকা ভালো নয় এ কথাটা মনে রেখো বউমা, মিলিটারী মেজাজ সব জায়গায় চলে না।"

প্রতিবাদ মাত্র না করিয়া নিঃশব্দে টাকা দশটা তুলিয়া লইয়া মৃদুলা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই দেবতার মত লোকটিকে অন্তরের সমস্ত ভক্তি শ্রদ্ধা ঢালিয়া দিয়া একটা প্রণাম করিবার জন্য তাহার সারাচিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার সাহসে কুলাইল না; এখনই হয়তো শম্ভুনাথ চীৎকার করিয়া সারাবাড়ী সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিবেন, চারিদিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিবে। এতদিন দেখিয়া শুনিয়াও মৃদুলা বুঝিতে পারে না এই লোকটি কিসে চটিয়া যান, কিসে ঠাণ্ডা হন। কোনো অপরাধ না করিয়াও কখনও কেহ ভর্ৎসিত হয়, হয়তো গুরুতর অপরাধ করিয়াও অপরাধী এতটুকু ভর্ৎসিত হয় না। আসল কথা তাঁহার মনের প্রসন্নতা এবং সেইটির উপর নির্ভর করিয়াই কেহ বাঁচিয়া যায়, কেহ মরে।

টাকা কয়টা অঞ্চলে বাঁধিতে বাঁধিতে মৃদুলার চোখের জল হঠাৎ উপছাইয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

নিঃস্ব ভিখারিণীর মান নাই তবু অন্তরে আঘাত লাগে, কারণ বাহিরটা আঘাতে আঘাতে অসাড় হইয়া গেলেও অন্তরের অনুভূতি বিলীন হয় নাই, সেখানে তাহার নিজস্ব কিছু আছে। লোকের কাছে যে কে কতখানি সঙ্কুচিতভাবে হাত পাতে তাহা বুঝিবে কে,—কে তাহা জানিবে?

মৃদুলা চোখ মুছে।

(১৪)

প্রথম যখন মৃদুলা বিধবা হয়—শম্ভুনাথ তাহার কথা ভাবিয়াছিলেন, অনেক দিক দেখিয়া তাহাকে এ বাড়ীতে আসিয়া বাস করিবার কথা তখনই তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু মৃদুলা রাজি হয় নাই। স্বামী মৃত্যুকালে তাহাকে মুক্তি দিয়া গিয়াছেন, তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন—মৃদুলাকে বিবাহ করা তাঁহার উচিত হয় নাই, সেইজন্যই তিনি সুখী হন নাই—মৃদুলার সুখশান্তিও তিনি নষ্ট করিয়াছেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে মৃদুলাকে এই কর্ত্তব্যের বোঝা বহিয়া বেড়াইতেই হইত, মৃত্যু মৃদুলাকে মুক্তি দিবার জন্যই তাহাকে গ্রহণ করিল। তিনি মৃদুলাকে সকল বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া গেলেন,—সামাজিক নিয়ম পালন না করিলেও তাহার পাপ হইবে না। বর্ত্তমানে বিধবার বিবাহে কেহ আপত্তি করিবে না, সে অনায়াসেই বিবাহ করিতে পারিবে, তিনি অনুমতি দিয়া যাইতেছেন।

স্বামীর প্রদত্ত মুক্তি সে গ্রহণ করে নাই, সামাজিক সংস্কার মানিয়া লইতে সে বাধ্য কারণ সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যেই সে মানুষ হইয়াছে। সুখে দুঃখে এই জীর্ণ ঘরখানাকেই সে আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবে ভাবিয়াছিল।

স্বামী যে মুক্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন, সে-মুক্তির কল্পনাও সে করিতে পারে না।

তাহার অতীত মরিয়া গেছে। বর্ত্তমান যতই দুঃখময় হোক ভবিষ্যৎ যখন নিকটে আসিবে, তখন তাহার পুঁটুরাণীর সংসারে আসিয়া সে সুখী হইবে, সেই ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া পুঁটুর মারূপে মৃদুলা বাঁচিয়া থাকিবে।

মৃদুলা জাগিয়া স্বপ্ন দেখে,—

পুঁটু বড় হইয়াছে, স্বামীর গৃহে সে কল্যাণী বধূরূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, সংসারের কাজকর্ম্ম করে। পুঁটুর সিঁথায় সিঁদুর দপ দপ করিয়া জ্বলে, ললাটে সিঁদুরের ফোঁটা উজ্জ্বল হইয়া থাকে। মৃদুলার সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ জাগে, সে দুইহাত কপালে ঠেকায়, মাটিতে মাথা লুটাইয়া প্রার্থনা করে—নিজের জন্যে কোনোদিন কিছু চাইনি ঠাকুর, আমার পুঁটুর জন্যে চাচ্ছি। তাকে যেন আমার মত পোড়া অদৃষ্ট দিয়ো না, বিধবা হওয়ার আগে সে যেন মরে যায়—আমি তাও সইব, আমার মত অবস্থা আমি সইতে পারবো না।”

যতবার সে চোখের জল মুছে ততবারই ঝরিয়া পড়ে।

তারণ পাশ দিয়া যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইল, ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, “তুমি কাঁদছো মা,—কাঁদছো কেন?”

মৃদুলা আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, “না তারণ, আমি কাঁদছি নে।”

তারণ হাসিবার চেষ্টায় মুখখানা বিকৃত করিয়া তুলিল, বলিল, “কাঁদছো বই কি মা, মুখে তুমি না বললেও চোখের জল কি লুকাতে পারো? বড়বাবুকে ফাঁকি দিতে পারো; বুড়ো মানুষ তিনি, চোখের সামনে অনেক কিছুই এড়িয়ে যায়; তাই বলে এই তারণ দাসের সামনে চোখের জল লুকানো চলবে না মা, তারণ মানুষের নাড়ীনক্ষত্র চেনে, সব কিছুই সে একটিবার দেখে বুঝতে পারে।”

“কই, কে আবার কাঁদতে বসলো রে তারণ,—নাঃ, স্বস্তিতে আর থাকতে দিলে না—জ্বালিয়ে খেলে দেখছি।”

বলিতে বলিতে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন শম্ভুনাথ।

মৃদুলা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল; তারণ কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে থামাইয়া দিয়া রুক্ষকণ্ঠে শম্ভুনাথ বলিলেন, “একটা কথা জিজ্ঞাসা

করি বউ মা, এমনি সময়ে গৃহস্থের বাড়ীতে চোখের জল ফেলা কি ভালো না সেটা উচিত ? সাধে কি তোমাদের মেয়েমানুষ বলে—সময় নেই, অসময় নেই, স্থান নেই, অস্থান নেই—চোখের জল ফেললেই হলো। তোমার মেয়ে রুগ্ন, এখন চোখের জল ফেলতে আছে—তুমিই একবার বল দেখি বাছা,—ঐরকম অকল্যাণ কোনো মায়ে করে ? তোমাদের জাত তো—যাদের বারোহাত কাপড়েও —"

নেহাৎ মেয়েদের সামনে বলা অন্যায় বলিয়াই তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

মৃদুলা আর দাঁড়াইল না, দ্রুত অগ্রসর হইল। তারণ সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে বলিল, "বড়বাবু বড্ড কড়া কথা বলেন, যাকে যা না বলবার তাকে তাই বলে বসেন। তাই বলে সত্যি ওঁর মন ওরকম নয় মা, বড্ড নরম মন—বড্ড —"

অসহিষ্ণু মৃদুলা বলিল, "আমি সব জানি তারণ, ওঁকে চিনতে আমার বাকি নেই, আজ সাত আট বছর ধরে ওঁকে দেখছি তো ?"

উৎসাহিতভাবে তারণ বলিল, "ঠিক দেখবে ওই একই রকম, এতটুকু এদিক ওদিক নেই। এই আমাকেই দেখ না—দিনের মধ্যে না হোক পঞ্চাশবার মুখে মুখে জুতো মারছেন, বেত মারছেন, আবার তুলেও আছাড় দিচ্ছেন। লোকে তো বোঝে না, তারা বলে—"কেন বাপু অত অপমান সয়ে থাকা,—কাজ ছেড়ে দাও, একটা মানুষের পেট তো—যেমন করে হোক চলে যাবে।" আমি কিন্তু বাবুকে চিনি, জানি, ও কেবল মুখের কথা মাত্র, গায়ে তিনি কোনো দিন একটা আঙ্গুলও ছোঁয়ান নি।"

বলিতে বলিতে গলার স্বর খাদে নামাইয়া বলিল, "তা ছাড়া—বুঝলে মা, ওই মানুষকে আমি কার জিম্মায় দেব বল, কে ওঁকে আমার মত করে দেখবে ? ওই তো ভুলো মানুষ, কখন স্নান করতে হবে, কখন খেতে

হবে তাই হুঁস থাকে না। ওই মানুষকে আমি যদি একটা দিন না দেখি, কি যে হবে আমি তাই এক একবার ভাবি। উনি রাগ করুন, গালাগালি দিন—আমার ও সব গা সওয়া হয়ে গেছে। এমন অভ্যেস হয়ে গেছে মা, যেদিন গালাগালি না করেন, মনে হয় আমার ওপর রাগ করেছেন, আমার দিনটাই মিথ্যে হয়ে গেল মনে হয়।”

সে গলা ছাড়িয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

মৃদুলার মুখে হাসি ছিল না, গম্ভীরভাবে কেবল বলিল, “বটে—”

তারণ পরম উৎসাহিতভাবে বলিয়া চলিল, “এ সব অভ্যেসের দোষ মা, সব অভ্যেসের দোষ। কোন সেই এতটুকু বেলায় এ সংসারে এসেছি, চিরদিন ওই এক সমান গালাগালি খাওয়া আমার ভাত ডাল খাওয়ার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই যে একটা গল্প আছে জানো মা—একজন লোক ভিক্ষে করতো, ছেঁড়া কাপড়ে কোনো রকমে লজ্জা নিবারণ করে পথের ধারে শুয়ে রাত কাটাতো। বাদশা তাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে সাবান মাখিয়ে ভালো পোষাক পরালেন—সেই সুগন্ধি সাবানের গন্ধে সে বমি করে ফেললে। মখমলের পোষাক তার গায়ে কুটকুট করে, পোলাও কালিয়ার এতটুকু সে মুখে দেয় নি, গদীওয়ালা পালঙ্কে শুয়ে তার শয্যাকণ্টক সুরু হলো। রাত দুপুরে যখন বাড়ীর সব ঘুমুলো, তখন চুপি চুপি সেই রাজপোষাক ছেড়ে নিজের ছেঁড়া, দুর্গন্ধময় কাপড়জামা পরে রাজবাড়ীর বাইরে পথের ধারে এক হাঁটু ধূলোর পরে শুয়ে পড়ে মহা আরামে এক ঘুমে রাত কাবার করে দিলে।”

মৃদুলা শান্তকণ্ঠে বলিল, “সে তার অভ্যাস বাঁচিয়ে চলেছে।”

তারণ চিন্তিত মুখে বলিল, “ঠিক তাই। এই জন্যেই না বলে যার যা অভ্যেস তা না করতে পেলে ভারি অস্বস্তি বোধ করে—যেমন আমার অবস্থা হয়েছে আর কি।”

সে আবার হাসিবার উদ্যোগ করিতেই মৃদুলা বাধা দিল, বলিল, "আমি এবার চলি তারণ, মেয়েটা একলা ঘরে পড়ে আছে, দেখতে কেউ নেই।"

তারণ শশব্যস্ত হইয়া বলিল, "বটে—বটে ; না না মা তুমি যাও, দেরী করো না। সত্যই তো মেয়েটা এতক্ষণ একলা ঘরে পড়ে আছে, কেউ দেখতে নেই, তোমার এতক্ষণ যাওয়া উচিত ছিল।"

মৃদুলা দ্রুতপদে অগ্রসর হইল, খানিকদূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া চিন্তিত মুখে বলিল, "একটা কথা আছে তারণ —"

তারণ ফিরিয়া বলিল, "কি কথা মা ?"

রুদ্ধকণ্ঠে মৃদুলা বলিল, "ডাক্তার তো আসেন নি, তবু বলেও যদি ওষুধটা আনা যায়। অনেকে তো বলেও ওষুধ নিয়ে যায় তারণ।"

উৎসাহিত হইয়া তারণ বলিল, "কেন আনা যাবে না—তুমি অবস্থাগুলো বলো মা, আমি কর্ত্তাবাবুকে বলে এখনই ওষুধ এনে দিচ্ছি।"

মৃদুলার চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; "যাবে তুমি তারণ, আঃ, তা যদি যাও আমার মেয়েটা বাঁচে। আমার পুঁটুর যদি কিছু হয় তারণ, আমিও সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করব—"

বলিতে বলিতে তাহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

বিপন্ন হইয়া তারণ বলিল, "আবার কাঁদতে বসলে মা, ওষুধ আমি এখনই এনে দিচ্ছি। সামান্য একটু জ্বর, একটু ওষুধ দিলেই বন্ধ হয়ে যাবে, এর জন্যে আবার ভাবনা ? তুমি বাড়ী যাও, আমি বাবুকে বলে এখনই আসছি, তুমি রোগীর অবস্থা লিখে আর একটা শিশি ঠিক করে

রাখো গিয়ে—আমি গিয়েই যেন পাই ; অমনি ডাক্তারকেও শুনিয়ে আসব —তিনি কথা দিয়ে কেন আসেন না, আগে শুনি তিনি কি বলেন, তারপর বাবুকে জানাব।”

মৃদুলা চোখ মুছিয়া অগ্রসর হইল।

(১৫)

মিলি একাই বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

নিমাইয়ের পিসীমার অসুখ, জানাইয়াছেন তিনি একটু ভালো হইলে নিজেই মিলিকে বেড়াইতে লইয়া যাইবেন ; মিলি তাঁহার অপেক্ষা করে নাই।

বংশের সম্ভ্রম—কথাটা যেমন বিরক্তিকর—তেমনই হাস্যজনক। বর্ত্তমান এই সময়ে মানুষ বংশের সম্ভ্রম লইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে না, তাহাতে ঠকিতে হইবে নিজেকেই।

চুলোয় যাক বংশের সম্ভ্রম ; দীর্ঘ দিন ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া মিলি এদিকে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, মুক্ত বাতাস ও মুক্ত আলোর জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে ; চিরকালের মুক্ত মিলি আর কতদিন বদ্ধ থাকিতে পারে ?

পথেই দেখা হইল নিমাইয়ের সহিত,—মহোল্লাসে সে মিলির সাথী হইল, উভয়ে চলিল মাঠের দিকে।

দূরে সেই দুপুরে রৌদ্রে গরু চরাইতে আসিয়া রাখাল বালক গাছের ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছিল, সেখান হইতে তাহার গানের সুর ভাসিয়া আসিল—

একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর
দিন দুই একের মত—

তাহার সেই গানের সুরে উভয়েই সচকিত হইয়া উঠিল। নিমাই চোখ ফিরাইয়া দেখিল মিলি সামনেই দাঁড়াইয়া আছে।

একটা নিঃশ্বাস হালকাভাবে টানিয়া লইয়া সে বলিল, "আত্মবিস্মৃতি জাগে—যখন মনে করি এই পথের উপর দিয়ে আমার পিতৃপুরুষ হেঁটে যেতেন,—আমি শুনতে পাই দূর হতে আমার পিতৃপুরুষের কণ্ঠের স্বর, তাঁরা আমায় যেতে দিতে চান না। আপনি জানেন না মহামায়া দেবী এই গ্রামের প্রতি ধূলিকণা আমার কাছে স্বর্ণরেণুর মত মূল্যবান, আমি একে তাই মাথায় রাখি। এই গ্রামের আলো আজ আমায় প্রচুর আনন্দ দেয়, এর বাতাস আমায় প্রচুর শক্তি দেয়—আমার প্রাণে উৎসাহ আনে। সত্য কথা বলছি—আমি আমার এই দেশকে বড় ভালোবাসি, নিবিড় করে ভালোবাসি।"

মিলি বলিল, "কিন্তু কালই যে বলেছেন আপনি কাজ ছেড়ে দেবেন—"

বাধা দিয়া নিমাই বলিল, "কাজ ছাড়তে পারি, দেশ ছাড়তে পারিনে মহামায়া দেবী—"

তাহার কণ্ঠস্বর বেদনামিশ্রিত।

মিলি মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "আপনি দেশকে ভালোবাসেন বুঝলুম, এই সব নিন্দুক লোককেও ভালোবাসেন কারণ এরা তো দেশ ছাড়া নয়।"

তাহার কণ্ঠে বিদ্রূপের স্বর—।

নিমাই উত্তর দিল, "ভালোবাসি বই কি, কারণ সত্যি ওরা কিছু তৈরী করে নিন্দে করে না। তারা আমার কোনো দোষ দেখলে তবে নিন্দে করবে, একেবারে মিথ্যের পরে বনিয়াদের ভিত গাঁথা চলে না। সব কিছুর মধ্যেই কিছু সত্য মিশানো থাকে, শুধু শুধু কেউ কি কারোও সম্বন্ধে কথা বলতে পারে?"

মিলি একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "তবে ওরা যা বলেছে তা সত্য—মিথ্যে নয় ?"

নিমাই হাসিল, "সম্পূর্ণ না হলেও কতকটা বটে।"

মিলি চুপ করিয়া গেল।

চলিতে চলিতে হঠাৎ সে দাঁড়াইয়া পড়িল,—"আর যাব না, বাড়ী যাই।"

নিমাই পাশে পাশে চলিতেছিল, বলিল, "এতদূর যদি এসেই পড়লেন, আর একটু চলুন—ওদিকে নৃসিংহদেবের মন্দিরটা আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে যাই। খুব পুরাণো মন্দির, দেখলেই বুঝতে পারবেন। এদিকে যাঁরা আসেন তাঁরা কেউ এ মন্দির না দেখে যান না।"

মিলি বলিল, "আজ থাক, আর একদিন জ্যেঠামণির সঙ্গে এসে বরং দেখা যাবে।"

নিমাই মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, "অগত্যা তাই, তবে ফিরুন বাড়ীর দিকে, জ্যেঠামণির সময় হলে আসবেন।"

তাহার হাসি মিলি লক্ষ্য করিল, তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল, বলিল, "হাসছেন যে বড় ? আপনি বুঝি ঠিক জানেন জ্যেঠামণি আসবেন না ?"

চলিতে চলিতে গম্ভীর মুখে নিমাই বলিল, "একটা কথা বলি মহামায়া দেবী, গরীবের কথাটা মনে রাখবেন। শোনা কথায় চট করে বিশ্বাস করে মূর্খে—শিক্ষিত কেউ করে না। আপনি বি, এ, পর্য্যন্ত পড়েছেন, কাজেই আপনাকে কেউ মূর্খ বলবে না, আপনার যে এত সহজে কোনো কথা বিশ্বাস হবে, সে কথা যেন আমিই বিশ্বাস করতে পারিনে। আমি বুঝেছি আপনি কি জন্য আমার সঙ্গে যেতে চাচ্ছেন না, কিন্তু নিশ্চিন্ত

থাকুন—আমার দ্বারা আপনার এতটুকু ক্ষতি হবে না—আমি আপনাকে এ ভরসা দিচ্ছি।"

মিলি হাসিবার চেষ্টা করিল, সে চেষ্টার ফলে তাহার মুখটাই বিকৃত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আপনি অবান্তর কথা এনে ফেলছেন কারণ আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলছিনে। মোট কথা—ওসব মন্দির দেখার ইচ্ছে আমার নেই, ভক্তি শ্রদ্ধা আমার হয় না।"

নিমাই বলিতে গেল, "দেখার ইচ্ছে মানে—"

মিলি শ্লেষপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "আমার ওসব বিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি নেই নিমাইবাবু, ঠাকুর দেবতা আপনারাই জন্মে জন্মে মানুন, স্বর্গ যদি থাকে আপনাদের জন্যেই তা নির্দ্দিষ্ট করা থাকবে, আমি না হয় নরকে পচে মরব।"

নিমাই তাহার মুখের পানে চাহিল, মিলির মুখ গম্ভীর।

নিমাই বলিল, "ভয়ানক ভুল করেছেন মহামায়া দেবী, আমি ঠাকুর দেবতা দেখানোর উদ্দেশ্যে আপনাকে মন্দিরে নিয়ে যেতে চাই নি, কেবলমাত্র প্রাচীন একটা কীর্ত্তি দেখানোর উদ্দেশ্যে আমি আপনাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম। এই পুরানো স্থাপত্য শিল্প দেখবার জন্যে অনেক জায়গা হতে অনেক লোকই এখানে এসে থাকেন, আপনিও না হয় একবার দেখতেন তাতে আপনার এমন কিছু ক্ষতি হতো না।"

মিলি মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "হয় তো হতো না, তবু আমার দেখবার ঔৎসুক্য মোটেই নেই নিমাইবাবু, ওতে আমার জ্ঞানের বৃদ্ধিও বিশেষ হবে না, না হয় দেখে মুহূর্ত্তের জন্যে তারিফ করতুম এই মাত্র।"

নিমাই শক্ত হইয়া বলিল, "সেই তারিফটুকু পাওয়াও যে প্রাচীন শিল্পের প্রচুর লাভ। আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে মন্দিরটা ভেঙ্গে

পড়ছে, মেরামত করলে হয় তো আরও কিছুকাল টিঁকে থাকতে পারে।”

মিলি উদাসভাবে বলিল, “তাতে কোন লাভ নেই নিমাইবাবু—অনর্থক এই ভাঙ্গা সারাবার জন্যে কতকগুলো টাকা নষ্ট করবার পক্ষপাতী আমি নই। পুরাতনকে টিকিয়ে রাখবার কোনো দরকার নেই, ওর মহিমা নিয়ে ও ধরাশায়ী হয় হোক, ওরই বুকে নতুন ইমারত গড়ে উঠুক যা সত্যিকার স্থায়ী হবে। ভাঙ্গা জিনিস জোড়াতাড়া দিয়ে কতদিন চালাতে পারবেন বলুন তো?”

নিমাই বলিল, “কথাটা আপনার পক্ষে উপযুক্ত হলেও আমাদের পক্ষে নয়, যেহেতু আমরা পাশ্চাত্যের শিক্ষা কিছু লাভ করলেও আমাদের মন আজও সেই পুরাতন প্রাচীন যুগের আবছায়ায় পড়ে আছে। তার ভিত গাঁথা রয়েছে আমাদের মনে, বাইরের ভাঙ্গা গড়া যতই চলুক, ভিত তার এতটুকু নষ্ট হয় নি। আজ আপনি সর্ব্বান্তঃকরণে পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করুন, তার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাচীনকে গুঁড়িয়ে দিয়ে নূতনের পত্তন করতে চান করুন—নূতন ইমারত গড়ে তুলুন, কিন্তু এটা জানবেন স্থায়ীত্ব তার নেই, যে কোনোদিন এ ইমারত ধ্বসে পড়বে। আমার ধারণা বর্ত্তমানে যা চলছে সবই মেকি, ওর মধ্যে আসল জিনিস কিছুই নেই।”

মিলি অন্তরে চটিয়াছিল তাহার মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝা গেল, বলিল, “আপনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা পেয়েও একশতাব্দী পেছিয়ে আছেন, আপনার মন আজও সেই পুরাতন অন্ধ গুহায় ঘুরে মরছে, তাই জোর করে বলতে চান একালের যা কিছু সবই মেকি, সবই মিথ্যে—।”

নিমাই অতি সহজেই মানিয়া লইল, বলিল, “আমার বিশ্বাস তাই।

এই দেখুন না—আমাদের শিক্ষা সভ্যতা যা কিছু পেয়ে আজ আমরা অহঙ্কার করি, সে সবই ভুয়ো ; এর মধ্যে এমন কি আছে যা নিয়ে আমরা গর্ব্ব করতে পারি, যার পরে ভর দিয়ে আমরা দাঁড়াতে পারি ? আমি জোর করে বলব—আমরা মিথ্যের হাটে মিথ্যের বেসাতি করছি, বেশ জানছি আমার এই শিক্ষা আমায় মানুষ হতে দেয় নি, বরং মনে প্রাণে অমানুষ করেছে, আমায় প্রকৃত জ্ঞান দিতে পারে নি, আমায় মূর্খেরও অধম করেছে। আমার চেয়ে ঢের বেশী জ্ঞান আছে তার, যে লোকটা মাথায় মোট নিয়ে চলেছে, যে লোকটা হাটে বেগুন মুলো বিক্রি করছে।”

“মোট বওয়া—বেগুন মুলো বিক্রি—”

মিলি ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

কথার উপর জোর দিয়া নিমাই বলিল, “হ্যাঁ, বেগুন মুলো বিক্রি—কারণ ও লেখাপড়া শিখে নিজের বৈশিষ্ট্য হারায় নি, ছদ্মবেশ ওর দরকার হয় নি, ও যা—তাই আছে। পুরাতনকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন দিয়ে নূতনকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে যাওয়ার ফলে আজ আমরা অন্তঃসার-শূন্য হয়ে পড়েছি। বিশ্বাস করুন—আমাদের অভাব দিন দিন বেড়ে চলেছে সব দিক দিয়ে, সব দিক দিয়ে আমরা রিক্ত হয়েছি অথচ অভাব পূরণের কোনো উপায় আমরা ঠিক করতে পারি নি। আমরা আজ মাঠে চাষ করতে যেতে পারিনে পাছে চাষা নাম নিতে হয়, নিজের মোট নিজে বইতে পারিনে পাছে লোকে কুলি ভাবে। পেটে দুদিন কিছু পড়ে না, আমরা মিথ্যা অহঙ্কারের বোঝা মাথায় চাপিয়ে মাথা নোয়াতে পারিনে—অথচ আত্মহত্যা করার সাহস আমাদের আছে। আমরা আজ ভুলে গেছি বিনা স্বার্থেও কেউ কাউকে ভালোবাসতে পারে, কেউ পরের উপকারের জন্যে জীবন সমর্পণও করতে পারে—তাই দধিচীর

আত্মত্যাগ, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃস্নেহ, সীতা সতীর পাতিব্রত্য ইত্যাদি আমরা গাঁজাখুরি কাহিনী বলে উড়িয়ে দেই। আজ আমাদের মন গেছে বদলে, মানুষ 'মানুষ' হওয়ার বদলে হয়েছে অমানুষ, পৃথিবীকে স্বর্গ গড়তে গিয়ে নরক করে তুলেছে।"

মিলি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, "শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মার্জ্জিত হওয়া, মনকে সংস্কারমুক্ত করে তোলা। আপনি অতখানি পড়েছেন, বি, এ. ডিগ্রীও নিয়েছেন, তবু আজও সেই পুরাতন পন্থীই রয়ে গেলেন নিমাইবাবু, আর কোনোদিন আপনাকে উন্নতি করতে হবে না।"

নিমাই বলিল, "মাপ করবেন, আপনি যাকে উন্নতি বলছেন আমি তা চাই নে, আমি যেমন আছি তেমনই থাকি, আর এমনই ভাবে থাকা আমি গৌরবজনক বলে মনে করি মহামায়া দেবী। নিজের যা কিছু সব ভাসিয়ে দিয়ে সর্ব্বাংশে পরের অনুকরণ করে নিজেকে বড় বলে ভাবতে আমি চাইনে, আর সেটা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক বলে আমি মনে করি নে। আমি চাই এই বাংলামায়ের ছেলে হয়ে থাকতে, গ্রামের সকলের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে থাকতে, আমার পিতৃপুরুষের আদর্শ বাঁচিয়ে রাখতে। যে পুরাতন রয়েছে আমি তার সংস্কার করে তাকেই রাখতে চাই, নূতনের প্রতি আকর্ষণ তাই আমার কাম্য নয়।"

বাড়ীর দরজার কাছে ততক্ষণ তাহারা পৌছাইয়াছে।

নিমাই নমস্কার করিল, "আহা, কিছু মনে করবেন না, হয়তো এমন অনেক কথা বলেছি যা আপনাকে আঘাত করেছে, সে জন্যে মাপ করবেন।"

শুষ্ক হাসিয়া মিলি প্রতিনমস্কার দিল, বলিল, "না, সেজন্যে মনে

কিছু করি নি, সোজাসুজি কথাটা হয়ে গেল যাতে আপনিও আমাকে বুঝলেন, আমিও আপনাকে কতকটা বুঝতে পারলুম।"

"কতকটা—মানে—?" নিমাই প্রশ্ন করিল।

মিলি বলিল, "সম্পূর্ণ পরিচয় মানুষের পাওয়া এমন সহজ ব্যাপার নয় নিমাইবাবু, সেই জন্যেই 'কতকটা' বললুম।"

নিমাই কেবলমাত্র বলিল, "হুঁ—"

সে ফিরিল—।

মিলি ভিতরে গেল না, যতক্ষণ নিমাইকে দেখা যায়, ততক্ষণ সে দরজার উপরেই দাঁড়াইয়া রহিল।

(১৬)

সামান্য একটা ফাউণ্টেন পেনের জন্য ডক্টর ঘোষালের মত সম্মানীয় লোক যে নিজেই অতি সামান্যভাবে গোকর্ণে আসিয়া উপস্থিত হইবেন তাহা নিমাই স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। সে ভাবিয়াছিল কাল সে যখন মামলার জন্য সহরে যাইবে তখন নিজেই পেনটা লইয়া যাইবে। সেদিনে কথাবার্ত্তা বলিয়া জানিয়াছিল ডক্টর ঘোষাল তাঁহার বন্ধু ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে দিন চার পাঁচ থাকিবেন।

তথাপি নিমাই ভাবিয়াছিল সহর হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোনো চাপরাসী আসিতেও পারে। ডক্টর ঘোষাল যে নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইবেন তাহা সে ভাবে নাই এবং এ জন্য সে প্রস্তুতও ছিল না।

সেইজন্যই সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এতবড় এবং বিখ্যাত একজন লোক আসিয়াছেন, তাঁহাকে কিরূপ সম্বর্দ্ধনা করিবে, কোথায় বসাইবে তাহাই সে ঠিক করিতে পারে না, নিরুপায়ভাবে সে কেবল হাত কচলাইতে লাগিল।

তাহার অবস্থা দেখিয়া ডক্টর ঘোষাল হাসিলেন, বলিলেন, "আপনাকে কিছুমাত্র ব্যস্ত হতে হবে না, আমি নিজেই বসছি, আপনাকে সেজন্যে ডাকাডাকি ছুটোছুটি করে অনর্থক লোকজনকে ব্যস্ত করে তুলতে হবে না।"

তিনি নিজেই একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন।

অত্যন্ত বিব্রতভাবে মাথা চুলকাইয়া নিমাই বলিল, "কিন্তু সামান্য ফাউণ্টেনের জন্যে আপনার নিজে এত কষ্ট করে আসার কোনো দরকার ছিল না—"

ডক্টর ঘোষাল হাসিয়া মাথা দুলাইলেন, "সামান্য বলবেন না, ওই ফাউণ্টেনের সঙ্গে আমার স্মৃতি জড়ানো আছে। যাঁর কাছ হতে ওটা পেয়েছিলুম, তিনি এখন মৃত—কাজেই তাঁর স্মৃতিরূপে ওর দাম নেই।"

নিমাই বলিল, "তবু কাউকে পাঠিয়ে দিলে হতো, না হয় কাল আমি যখন যেতুম, নিয়ে গিয়ে আপনাকে দিতুম।"

ডক্টর ঘোষাল রুমালে মুখ মুছিয়া বলিলেন, "আমি এসেছি তাতে আর কি হয়েছে বলুন—যাতে আপনাকে এত সঙ্কুচিত হয়ে উঠতে হচ্ছে? আপনাদের গ্রামটা আমি নিজে ঘুরে ভালো করে দেখবার উদ্দেশ্যে এসেছি, কেবল পেন নেওয়ার উদ্দেশ্য আমার নয়। সেদিনে নিমন্ত্রিত রূপে এসে কিছুই দেখা হয় নি, অথচ আপনারা যা সুখ্যাতি করলেন তাতে এমন আদর্শ গ্রামটাকে ভালো করে না দেখলে নিজেরই মনে অস্বস্তি হবে। এখনও দু চার দিন আমায় বহরমপুরে থাকতে হবে, এর মধ্যে হসপিটালের কাজ আমার সকাল বেলায় একঘণ্টা মাত্র, সারাদিন আমায় শুধু বই পড়ে বেড়িয়ে কাটাতে হয়। সেই জন্যেই ভাবলুম এই সময়টায় এ দিককার গ্রামগুলো বরং বেড়ানো যাক, অনেক কিছু জানা যাবে।"

নিমাই অত্যন্ত খুসি হইয়া উঠিল, বলিল, "তবে বেশ করেছেন; আমি

আপনাকে সঙ্গে করে সমস্ত গ্রামখানা দেখিয়ে দেব। তার আগে আমাদের কর্ত্তা বাবুকে আপনার খবরটা দিয়ে আসি, নইলে উনি আমার'পরে বড় বেশী রকম চটবেন। আপনি একটু বসুন ডক্টর ঘোষাল।"

কাগজপত্রগুলি একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া সে বাহির হইল।

সম্মানীয় অতিথি আসিয়াছেন, যোগ্য সম্বর্দ্ধনা করা চাই এবং সে সম্বর্দ্ধনার ভার লইতে হইবে বাড়ীর কর্ত্তা শম্ভুনাথ চৌধুরীকে।

ভিতর বাড়ীতে নিমাইয়ের অবারিত দ্বার হইলেও সে কোনোদিন স্বেচ্ছায় ভিতরে যায় নাই, আজ খানিকটা ইতস্তত করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সে নিজেই যখন কুণ্ঠিত চরণে প্রবেশ করিতেছিল, সেই সময়ে দেখা হইয়া গেল শম্ভুনাথের সঙ্গে,—তিনি বাহিরে আসিতেছিলেন।

ব্যস্তভাবে নিমাই বলিল, "ডক্টর ঘোষাল তাঁর সেই কলমটার জন্যে এসেছেন চৌধুরী মশাই।"

"ডক্টর ঘোষাল,—" শম্ভুনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।

নিমাই বলিল, "হ্যাঁ, আপনি চলুন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলুন, আমি ততক্ষণ চা খাবারের যোগাড় করি।"

হাঁপাইয়া উঠিয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "তুমি বলছো কি নিমাই, আমাকে নিয়ে ছেলেখেলা করছো নাকি? তিনি অতবড় একজন বিখ্যাত লোক কত দেশ বিদেশ ঘুরেছেন, আর আমি—নিরক্ষর গাঁয়ের লোক, আমি—"

নিমাই তিরস্কারের সুরে বলিল, "আঃ, কি যে বলেন তার ঠিক নেই,—ভয়েই গেলেন যে। হোন না তিনি জগদ্বরেণ্য লোক, আপনি তাঁর তুলনায় তা বলে কম নন। মানুষ হিসাবে আপনি তাঁর চেয়ে কিসে কম, জ্ঞান তাঁর চেয়ে আপনার অনেক বেশী। চলুন আপনি, আমি আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।"

ডক্টর ঘোষাল নিজেই একখানা পাখা লইয়া বাতাস খাইতেছিলেন, প্রবেশ করিবার মুখেই এই দৃশ্য দেখিয়া শম্ভুনাথ ভয়ানক চটিয়া উঠিলেন, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন, "ওরা সব গেল কোথায়—কাছারীর দারোয়ান পেয়াদাগুলো, গোমস্তাই বা গেল কোথায়? এতগুলো লোককে অনর্থক মাইনে দিয়ে পোষা হচ্ছে নিমাই, দেখ গিয়ে—এতক্ষণ নবাবপুত্তুরেরা সব নাকে সরষের তেল ঢেলে কোথাও আরাম করে ঘুম দিচ্ছে। এসব তোমার আস্কারা পেয়ে হয়েছে নিমাই, এ আমি স্পষ্ট কথা বলছি। তোমার কাছে ওরা কাজ করে—হাজার দোষ করেও এড়িয়ে যায়, মাসের প্রথমে মাইনে পাবেই—ওদের বুকে যে বল বাঁধা আছে। এ রকম করলে কি সংসার করা চলে—না আমি কিছু করতে পারি।"

দোষটা বেপরোয়া নিমাই বেচারার স্কন্ধেই চাপানো হইল, কিন্তু কে যে আস্কারা দেয় তাহা নিমাই জানে, তাই প্রতিবাদ মাত্র না করিয়া কেবল মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

অপ্রস্তুতভাবে হাতের পাখা নামাইয়া ডক্টর ঘোষাল সম্পূর্ণ বাঙ্গালী ভাবেই দুই হাত যোড় করিয়া নমস্কার করিলেন, বলিলেন, "থাক থাক, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। বেচারারা সারাদিনটা খেটে দুপুর বেলায়—"

বাধা দিয়া শম্ভুনাথ মাথা দুলাইয়া বলিলেন—"আপনি ওদের চেনেন না তাই একথা বলছেন। এই সব ছোটলোকগুলো আস্কারা পেয়ে মাথায় উঠেছে, মনিবকে ওরা গ্রাহ্যই করে না। ওদের সঙ্গে কখনও ভদ্রব্যবহার করতে নেই, করলে আমারই মত ঠকতে হবে। সামনে দিয়ে চলে যায়, ডাকলে সাড়া দিতে চায় না, নেহাৎ ধরা পড়ে গেলে বলে, ডাক শুনতে পাই নি। বুঝুন একবার ব্যাপারখানা,—আমি যে ওদের মনিব তা ওরা তো ভুলে গেছেই, আমাকেও মনে করতে দেয় না—উঃ—"

খুব বেশীরকম ক্লান্তভাবে চেয়ারে বসিতে গিয়া তিনি একেবারে ফরাসেই বসিয়া পড়িলেন।

ডক্টর ঘোষাল একটু হাসিয়া বলিলেন, "আজকালকার এই নব জাগরণের যুগেও আপনি যদি ওদের সেই সেকালকার মত পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে চান, সেটা কিন্তু ভয়ানক অন্যায় অবিচার হবে। দেশের সব জায়গায় আজকাল এই ছোট বড়র পার্থক্য নিয়ে আন্দোলন স্থরু হয়েছে, ছোট বলে যাদের বরাবর ঘৃণা করে এসেছেন তারাও আজ সমানাধিকার চায় কারণ তারাও মানুষ—সেই দাবি নিয়েই তারা দাঁড়িয়েছে।"

উষ্ণ হইয়া উঠিয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "কিরকম সমান অধিকার চায়। তারা চাইবে আমাদের পাশে বসে খেতে, আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে, ওদের সেই দাবি আমরা মেনে নেব, সে অধিকার তারা পাবে?"

ডক্টর ঘোষাল কি বলিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় দেখা গেল দরজার কাছে দু তিন জন ভৃত্যকে; একজন মস্তবড় পাখাখানা ঘাড়ে লইয়া অত্যন্ত বিনয়ের সহিত কোনো রকমে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

অকস্মাৎ যেন বারুদের গোলায় অগ্নিসংযোগ হইল, শম্ভুনাথ বোমার মত ফাটিয়া পড়েন আর কি।

"এই যে নবাব পুত্তুরেরা সব দয়া করে এলেন, এতক্ষণে ওঁদের ঘুম ভাঙ্গলো। দেখছেন কিরকম গদাইনস্করি চালের হাঁটা, কি রকম নবাবী চালে বাতাস করা—এতটুকু হাওয়া গায়ে লাগছে না। বুঝলেন তো—এরা সবাই একদিন কাজের লোক হতে পারতো, কিন্তু ওদের মাথা খেয়েছে আমাদের নিমাই, কেবল আস্কারা দিয়ে দিয়ে ওদের মাথায় তুলেছে। উঃ, হতো আমার সেকাল, আপনি দেখতে পেতেন—চাবুক দিয়ে ওদের শায়েস্তা করে দিতুম।

ব্যাঘ্রের মত তিনি গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অত্যন্ত বিনীতভাবে হরিদাস পেয়াদা ঘরে ঢুকিয়া তামাক বদলাইয়া দিয়া গেল।

দারুণ ক্রোধে শম্ভুনাথ দু চার টান তামাক টানিয়া মুখ তুলিলেন, "দেখুন, কিরকম পাজি এরা,—তামাকটা যা সেজেছে তাও অশ্রদ্ধা করে, এতটুকু ধোঁয়া পর্য্যন্ত বার হচ্ছে না। তোকে সাত তাড়াতাড়ি তামাক আনতে কেইবা সেধেছিল বাবু, তারণকে একবার ডেকে দিলেই হতো। সে নবাবপুত্তুর গেলেন কোথায়, ভাত খাওয়ার পরে আর তো তাঁর চুলের টিকিটি পর্য্যন্ত দেখতে পাই নি।"

নিমাই ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, "সে পুঁটুর মায়ের ওখানে গেছে চৌধুরী মশাই। মেয়েটার বড্ড অসুখ হয়েছে কিনা, ভয়ানক বকছে, ঠেলে ঠেলে উঠছে, একা ওর মা ওকে সামলাতে পারছেন না। আমি শুনে এখানে এসে বারোটার সময় তারণকে পাঠিয়ে দিয়েছি; সে গিয়ে বস্‌লে তবে তার মা স্নান করবেন—যা হোক দুটো রেঁধে খাবেন তো—। এর জন্যে যদি কিছু বলতে হয় আমাকেই বলুন চৌধুরী মশাই।"

শম্ভুনাথ একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

চুপচাপ গড়গড়ায় দুই তিন টান দিয়া বলিলেন, "হুঁ, তোমার এই অতিরিক্ত দয়াদাক্ষিণ্যের জন্যেই তুমি গেছ, তা বুঝেছি; এখনও অনেক কিছু ঘটবে তাও জানা যাচ্ছে।"

শান্তভাবে নিমাই বলিল, "তা আমিও জানি চৌধুরী মশাই। আমার মেরুদণ্ডে এটুকু শক্তি আছে—যত বিপদই আসুক আমি ভাঙ্গবো না, আমার কর্ত্তব্য আমি অবহেলা করব না। বেচারী বিধবা, তার বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য—তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ওই মেয়েটী, মায়ের জন্যেই মেয়ে আর মেয়ের জন্যেই মা—তাই ওদের দুজনকেই বাঁচাতে

হবে। লোকে অনেক কথা বলছে—আরও অনেক কিছু বলবে, সে ভয়ে আমি পেছুব না।"

ডক্টর ঘোষাল উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "কার অসুখ হয়েছে, আমি একবার দেখতে পারি কি?"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "আর বলবেন না মশাই, এই দায় নিয়ে আমি গেলুম। অসুখ হয়েছে একটী মেয়ের, তার মাকে আমি বউমা বলি, মানে সেই মেয়েটীর বাপ আমারই একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিল। আমার মায়ের রূপের কথা আপনাকে বলতে পারব না ডাক্তার, সেই রূপের জন্যেই মায়ের আমার হয়েছে বিপদ, কেবল আমার আর আমার এই নিমাইচন্দ্রের জন্যে কেউ এগিয়ে আসতে পারে নি। এতদিন পরে তারা আমার নিমাইয়ের মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়েছে কেবল এই দয়াদাক্ষিণ্যের জন্যেই। আর বলেন কেন—পাড়াগাঁয় বাস করে পদে পদে জ্বালাতন।"

এই সময় ভৃত্যের হাতে চা ও খাবার আসিয়া পৌঁছাইল; নিমাই টেবিলের উপর সেগুলি সাজাইয়া দিতে দিতে বলিল, সব চেয়ে বড় বেশী দুঃখের কথা ডক্টর ঘোষাল, মেয়েটীকে ডাক্তার দেখানো হয়নি, বিনা চিকিৎসায় মেয়েটী মারা যেতে বসেছে; মায়ের কাছে এ যে কতখানি বেদনাপ্রদ তা বলে বুঝানো যায় না। গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর বড় লোক ডাক্তারকে ভয় দেখিয়েছে। সেই জন্যেই তিনি সাহস করে রোগী দেখতে যেতে পারেন নি। কিন্তু এ সব কথা এখন থাক ডক্টর ঘোষাল, আপনি আগে খেয়ে নিন, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

ডক্টর ঘোষাল বড় বেশী রকম বিচলিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এরকম স্থলে আমি যখন এসে পড়েছি, তখন আগেই আমার রোগীকে

একবার দেখা কর্ত্তব্য নিমাই বাবু। চা খাবার এখন থাক, আপনি আমাকে নিয়ে চলুন, ফিরে এসে না হয় খাওয়া যাবে।"

শশব্যস্ত হইয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "না না, তাই কি কখনও হয়। আপনি যা হয় একটু খেয়ে নিন, তারপর আমি নিজে আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব, নিমাইয়ের আর ওখানে গিয়ে দরকার নেই।"

ডক্টর ঘোষাল চা পান করিতে করিতে বলিলেন, "তবু একেই আপনারা আদর্শ গ্রাম বলতে চান? যেখানে এত দলাদলি, মারামারি, অসহায়া বিধবার পরে নির্য্যাতন—"

শম্ভুনাথ মাথা নাড়িলেন, "এ সব জ্ঞাতি সম্পর্ক, ডাক্তার, অন্য লোকের মধ্যে এসব দেখতে পাবেন না। বলছেন বিধবাকে নির্য্যাতন করা, কিন্তু সেটা সেই বিধবার জন্যেই হচ্ছে না, হচ্ছে আমারই আশ্রিতা সে—কেবল সেই জন্যে; আমার জন্যেই সেই সতী সাধ্বী মেয়েটীর এই লাঞ্ছনা সইতে হচ্ছে। অমন লক্ষ্মী প্রতিমা আমি দ্বিতীয় আর দেখিনি, মা আমার রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। এই যে এত দুঃখ এত লাঞ্ছনা সইছে, তবু কোনোদিন একটা অভিযোগ সে করেনি, কত দুঃখই পাচ্ছে ডাক্তার, তবু নিজের দীনতা সে কাউকে জানাতে পারেনি।"

মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বিষণ্নস্বরে বলিলেন, "এই দেখুন এ দেশের মেয়েদের স্বভাব—দেখুন এদের মন, এরা মরবে তবু স্বামীর ভিটে ছাড়বে না, সন্ধ্যায় স্বামীর ভিটেয় প্রদীপ জ্বালবার জন্যে এরা স্বর্গে যেতেও চায় না। কয়েকটা বছর আগে আমার গোমস্তা যেদিন এই লক্ষ্মী প্রতিমাটীকে বিয়ে করে নিয়ে এলো—তখন আমি একে দেখে আকাশ হতে পড়লুম। কে এমন হতভাগ্য বাপ আছে যে জেনে শুনে চতুর্থ পক্ষ পঞ্চাশ বাহান্ন বছরের বুড়োর হাতে এমন মেয়ে অর্পণ করলে? সেদিন

আমার মনে হয়েছিল তিলে তিলে এমন করে মেয়েটীকে দগ্ধ করার চেয়ে ওকে একেবারে মেরে ফেলাও হাজার গুণে ভালো ছিল।”

ডক্টর ঘোষাল মুখখানা এমনভাবে বিকৃত করিলেন যাহাতে মনে হয় অকস্মাৎ তিনি একটা টক কুলে কামড় দিয়াছেন।

নিমাই ফাউণ্টেন পেন বাহির করিয়া আনিয়া ডক্টর ঘোষালের সামনে রাখিল, ধন্যবাদ দিয়া তিনি সেটা পকেটে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; হাসিমুখে বলিলেন, “আমি কিন্তু ডাক্তারদের ব্যতিক্রম চৌধুরী মশাই, কারও অসুখে চিকিৎসা হচ্ছে না শুনলে আমি কিছুতেই থাকতে পারিনে, যে করেই হোক, তার চিকিৎসার ভার আমি নিজের হাতে নেই! এদিক দিয়ে সাপের ওঝার সঙ্গে আমার নৈকট্য আছে, তারা যেমন সাপে কাটা শুনলেই ছোটে, আমিও তেমনি অসুখ শুনলেই ছুটি। যাক, এবার উঠুন চৌধুরী মশাই, রোগীকে একবার দেখে যাই, আমায় আবার সাড়ে পাঁচটার আগে সহরে পৌছাতে হবে কিনা—”

শম্ভুনাথ উঠিলেন—ভাবটা অনিচ্ছাব্যঞ্জক।

নিমাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আমি তো যাচ্ছি কিন্তু ওঁর সব কথা বুঝবার ক্ষমতা যে আমার নেই তা তুমি বেশই জানো নিমাই। আমি বললুম তোমার গিয়ে কাজ নেই—তুমিও সুবোধ বালকের মত সেই কথা মেনে নিলে—বেশ যা হোক।”

তাঁহার কণ্ঠস্বরে উষ্মা—।

নিমাই ততক্ষণ কাগজপত্র লইয়া বসিয়াছে, বলিল, “সুবোধ বালকের মত না মানা ছাড়া উপায়ই বা কই চৌধুরী মশাই। জানেন তো—আত্মরক্ষা করার অধিকার সবারই আছে, আমিও সেই অধিকারটাই চাচ্ছি।”

বলিতে বলিতে মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল, “কোনো ভয় নেই, আপনি

নির্ভয়ে ডক্টর ঘোষালের সঙ্গে যেতে পারেন। ডক্টর ঘোষাল নিশ্চয়ই এমন কোনো দাঁত ভাঙ্গা ইংরেজী কথা বলবেন না যা বুঝতে আপনার কষ্ট হবে।"

শম্ভুনাথ জুতা পায়ে দিয়া গজ গজ করিতে করিতে ডক্টর ঘোষালের সহিত বাহির হইয়া গেলেন।

(১৭)

তারণের জিদে মৃদুলাকে শয়ন করিতে হইয়াছে। কয়টা রাত্রি সমান সে জাগিয়া কাটাইয়াছে, আজ শয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঘুম আসিয়াছে।

শয়নের আগেও সে তারণকে বলিয়াছে—"দরকার নেই তারণ, তুমি বাড়ী যাও; কর্ত্তাবাবু উঠে যদি তোমায় না দেখতে পান, সাংঘাতিক কাণ্ড বাধাবেন।"

তারণ নিশ্চিন্তভাবে বলিয়াছে, "কর্ত্তাবাবুর জন্যে তোমায় একটুও ভাবতে হবে না মা লক্ষ্মি, আমাদের নিমাইবাবু সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে তাঁর জন্যেই ও বাড়ীতে গিয়ে বসেছেন—যেন কর্ত্তাবাবু জেগেই আমায় না দেখে সপ্তমে না চড়ে বসেন।"

মহানুভব নিমাই—

কৃতজ্ঞতায় মৃদুলার চোখে জল আসিয়াছিল।

সেদিনকার রাত্রের কথা যে পল্লবিতরূপে এতখানি হইয়া সারা গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহারই একটুখানি মাত্র সে শুনিতে পাইয়াছে এবং শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছে।

মৃদুলা ঘুমাইয়াছে।

রুগ্না কন্যার পাশে আঁচল বিছাইয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চুলগুলি খুলিয়া গিয়া তাহার অনিন্দ্যসুন্দর

মুখখানাকে বেষ্টন করিয়া আছে, মনে হইতেছে অচ্ছই কালো জলের বুকে একটি পদ্মফুল ফুটিয়াছে।

তারণের ডাকে মৃদুলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—

"ওঠো মা লক্ষ্মি, কর্ত্তাবাবু সহরের ডাক্তার সাহেবকে সঙ্গে করে এসেছেন তোমার পুঁটুকে দেখাতে, ওঠো মা—।"

ধড়ফড় করিয়া মৃদুলা উঠিয়া বসিল,—চুলগুলা জড়াইবার অবকাশও সে পাইল না, তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় সে তুলিয়া দিল।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া শম্ভুনাথ—

সদুঃখে বলিতেছিলেন, "মেয়েটার অসুখ এমন গুরুতর হয়েছে সে খবরটা আমায় দিতে হয় তো বউমা; আমি দেখে নিতুম একবার বিনয় ডাক্তারকে—তার ঘরের চালা কেটে গাঁ ছাড়া করতুম, ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতুম, অন্য ডাক্তারকে ডাক্তারখানার ভার দিতুম।"

মুখ ফিরাইয়া পিছনে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "অবিশ্যি আমার এটা আগেই করা উচিত ছিল ডাক্তারবাবু, করিনি কেবল গাঁয়ের লোক বলেই। ক্যাম্বেল হতে ওকে পাস করিয়েছি, আমিই ওর পড়ার খরচ সব যুগিয়ে এসেছি কেবল এই ডাক্তারখানাটার জন্যে, নচেৎ আমার কিছু পিতৃমাতৃ দায় পড়েনি। ভাবলুম এই আজকালকার দিন, মেডিকেল কলেজ হতে বছর বছর হাজার হাজার ছেলে যে এম, বি. ডিগ্রী নিয়ে পাস হচ্ছে, কয়জন ছেলে তেমন উপার্জ্জন করতে পারে যাতে তাদের পরিবার প্রতিপালন হয়—নাম করা তো অনেক পরের কথা। বিনয়কে এখানে রাখার উদ্দেশ্য তার পরিবার প্রতিপালনও বটে, গাঁয়ের লোক বিনা-চিকিৎসায় মারা না পড়ে সেজন্যেও বটে। কিন্তু ওই যে কথাই আছে না—গেঁয়ো স্বভাব সহজে ছাড়া যায় না, ওরও তাই হয়েছে, তাই দুদিন না যেতেই ঠিক স্বভাব অনুযায়ী কাজ করতে সুরু করেছে। আজ একে ওকে

ছোবল দিচ্ছে, এর পর আমাকেই ছোবল দিতে আসবে—জাত স্বভাব যাবে কোথায় ?"

তাহার কথার অনুসরণ করিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তুলা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।

একি স্বপ্ন—?

তুই হাতে চোখ মুছিয়া সে আবার চাহিল।—

স্বপ্ন নয়—সত্যই সে আসিয়াছে।

দীর্ঘকাল পরে মনিময় ঘোষাল আসিয়াছে তুঃখিনী মৃত্তুলার জীর্ণতম কুটিরে—তাহারই প্রাণাধিকা কন্যার চিকিৎসা করিতে ?

ভগবান—

একটা অস্ফুট শব্দ মাত্র নিজের অজ্ঞাতেই তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, নিজের কানে সে-শব্দ গিয়া পৌঁছাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে চকিতে নিজেকে সামলাইয়া লইল।

সর্ব্বনাশ,—সে করিতেছে কী ? নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিবে, সকল আশাভরসা দূর করিবে ?

কিন্তু মণিময় ঘোষাল—এখানে এতদূরে—সহর হইতে এই দূর পল্লীগ্রামে কেমন করিয়া আসিলেন,—তিনি তো জানেন না মৃত্তুলা এখানে এমনভাবে দিন কাটাইতেছে।

শম্ভুনাথ ডাকিলেন, "আসুন, ডাক্তারবাবু, মেয়েটাকে একবার দেখুন পরীক্ষা করে। বউমা, এসময় তোমার বাপু বাইরে যাওয়া চলবে না, তোমার মেয়ের অবস্থা তুমি না বললে কে বলবে বল, আর কারও তো জানা নেই। তুমি ওখানেই বসো,—ডাক্তার জীবনদাতা বাপের মত, এ কথাটা মনে রেখো।"

মুখের উপর দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া মৃদুলা একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল, তাহার বুকের কম্পন তখনও যায় নাই।

ডক্টর ঘোষাল ঘরে প্রবেশ করিলেন, রোগীকে পরীক্ষা করিলেন, মৃদুলা তারণকে দিয়া রোগীর অবস্থা সব জানাইল।

এই ফাঁকে ডক্টর ঘোষাল তাহার কুটিরখানা দেখিয়া লইলেন।

শম্ভুনাথ তাঁহার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বলিলেন, "আপনি বিলেত বেড়িয়ে এসেছেন, সেখানে সাহেবদের সুন্দর বাড়ী ঘর দেখেছেন। সহরে বাস করে প্রায়ই তাদের মতই থাকেন, পাড়াগাঁয়ে গরীব লোকেরা যে কতখানি আর কি রকম দুঃখের মধ্যে বাস করে দিন কাটায়, তবু ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরখানাকেই কতখানি দরদ দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকে—তাতো জানেন না। এই যে কুঁড়ে ঘরটা দেখছেন, কত লোকের হয়তো মাথা গুঁজবার জন্যে এমনি একটা কুঁড়েও নেই। আমি তাই চেষ্টা করছি ডাক্তারবাবু—যাতে দেশে থেকে দেশের লোককে কোনো প্রকার কাজ দিয়ে তাদের দুঃখকষ্ট খানিকটা দূর করতে পারি।"

রোগী দেখিয়া গম্ভীর মুখে প্রেসক্রপশান লিখিয়া দিয়া ডক্টর ঘোষাল শম্ভুনাথের সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। পথের ওদিকে দেখা গেল নিমাইকে—।

শম্ভুনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোগীকে কি রকম দেখলেন, বাঁচবার আশা আছে তো?"

ডক্টর ঘোষাল একটু হাসিয়া বলিলেন, "বাঁচামরা ডাক্তারের হাত নয় চৌধুরী মশাই। চেষ্টা আমরা প্রাণপণে করতে পারি, তাতে যদি বাঁচবার হয়—বাঁচবে। ওষুধটা যত তাড়াতাড়ি পান নিয়ে আসুন, ওষুধটা আগে পড়া চাই কিনা—তবে তো ফল হবে।"

উদ্বিগ্ন হইয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "ব্যবস্থা ওর আর আপনি কী করবেন।

ওর ভাগ্য বলে আপনি আজ এসে পড়েছেন,—তাই বলে প্রত্যেক দিন তো আসতে পারবেন না।"

ডক্টর ঘোষাল শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "আমার দস্তর আলাদা চৌধুরী মশাই, যে রোগীর ভার আমি নেই তাকে সম্পূর্ণ আরাম না করে আমার ছুটি হয় না। আমার সেই নীতি রাখতে আমায় এখন আসতেই হবে আপনাদের এই গ্রামে।"

শম্ভুনাথ বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া ফেলেন আর কি—

"আপনি আসবেন ডাক্তার—কিন্তু—"

নিমাই ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল, তাহার পানে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিয়া ডক্টর ঘোষাল বলিলেন, "যখন রোগীকে দেখবার ভারই নিলুম—ওকে প্রতিদিনই দেখতে আসতে হবে বই কি।"

নিমাই বলিল, "আমরা অবশ্য আপনাকে বলতে পারি নে ডক্টর ঘোষাল, আপনার ক্ষতি করে—"

ডক্টর ঘোষাল বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার ক্ষতিবৃদ্ধি আমি বুঝে কাজ করছি নিমাই বাবু। সামান্য একটু কষ্ট আমার হবে, হয়তো এতে একটু আধটু ক্ষতিও সইতে হবে; কিন্তু এই যে দরিদ্র বিধবার একমাত্র সন্তানটি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে—তাতে এঁর যা ক্ষতি হবে, আমার ক্ষতি নিশ্চয়ই ততটা নয়। এই যে আপনাদের চৌধুরী মশাই এই গ্রামের উন্নতির জন্যে এতটা করছেন—এতে ওঁর কত ক্ষতি হচ্ছে, তবু লোকের যাতে মঙ্গল হয়, তা করতে উনি তো পেছিয়ে যান নি।"

শম্ভুনাথকে লজ্জিত হইতে দেখা গেল; হাত দুখানা কচলাইতে কচলাইতে তিনি বলিলেন, "কিন্তু এ যে আমার নিজের দেশ ডাক্তার, এরা আমার দেশবাসী; এদের জন্যে আমি যা করছি সেটা সুখ্যাতির জন্যে নয়—আমার নিজের কর্ত্তব্য হিসাবেই আমি করছি। কিন্তু তাই বলে

সেটা আপনার পক্ষে খাটতে পারে না যেহেতু এ আপনার দেশ নয়। আপনি যে রোজ বহরমপুর হতে এতদূরে আসবেন এতে আপনার দৈহিক পরিশ্রমও বড় কম হবে না তো।”

শান্তভাবে ডক্টর ঘোষাল বলিলেন, “এরা আমার দেশবাসী নয়, এ আমার দেশ নয়, এ-কথা আপনি বললেও আমি মানবনা চৌধুরী মশাই—কারণ এ আমার সেই বাংলা যাকে আমি ভালোবাসি। এর অধিবাসী অর্থাৎ বাঙ্গালী সে যাই হোক—হিন্দু হোক, খৃশ্চান হোক, মুসলমান হোক—সকলকেই আমি ভালোবাসি। এই বাংলাদেশ আমার মাতৃভূমি, সেই জন্যই প্রত্যেক বাঙ্গালীকে আমি ভাই বলতে পারি—তাদের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারি। আপনি আমায় বাধা দেবেন না চৌধুরী মশাই, বাঙ্গালী হিসাবে বাঙ্গালীর প্রতি যে কর্ত্তব্য আছে, সেই কর্ত্তব্য আমাকে পালন করতে দিন।”

শম্ভুনাথ হাসিমুখে কেবল মাথা চুলকাইলেন।

নিমাই বলিল, “আপনি বাড়ী যান চৌধুরী মশাই, আমি ডক্টর ঘোষালকে পৌছে দিয়ে আসি, ওঁকে আর অনর্থক আটক করে রেখে দরকার নেই।”

না যাইতে পাইলেই শম্ভুনাথ বাঁচিয়া যান, তাঁহার তামাকের নেশা ধরিয়া গেছে, তবু বলিলেন, “তাও কি হয় নিমাই, আমার ওঁর সঙ্গে যাওয়া উচিত।”

ডক্টর ঘোষাল বিনিতকণ্ঠে বলিলেন, “কোনো দরকার নেই চৌধুরী মশাই, আপনার প্রতিভূ হয়ে উনি তো যাচ্ছেন, আপনি না গেলেও আমি মনে কিছুই করব না।”

অগত্যা শম্ভুনাথ ফিরিলেন।

নিমাইকে বারবার বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন—সিট রিজার্ভ করিয়া যেন ডক্টর ঘোষালকে বাসে তুলিয়া দেওয়া হয়।

সদর রাস্তার দিকে চলিতে চলিতে নিমাই বলিল, "সাড়ে পাঁচটার মধ্যে আপনার সহরে পৌঁছানো চাই বলেছেন, নচেৎ আপনাকে আজ গ্রামখানা অন্ততঃপক্ষে খানিকটা দেখিয়ে দিতুম। আপনি আবার যদি কোনোদিন আসেন, আমি আপনাকে মোটামুটি কিছু কিছু দেখাতে পারব আশা কর্‌ছি।"

ডক্টর ঘোষাল বলিলেন, "হয়তো আমাকে আর দু এক দিন আসতে হবে—সেটা রোগীর অবস্থার পরে নির্ভর করে। অসুখটা একটু কঠিন বলেই মনে হচ্ছে, এতে কেবল ওষুধই নয় নিমাইবাবু, রীতিমত সেবা করা চাই। আপনি বরং এই ভারটা নিন না নিমাইবাবু—?"

"আমি—?"

নিমাই যেন চমকাইয়া উঠিল, তারপরই ম্লানহাসি হাসিয়া বলিল, "বেশ কথা বলেছেন ডক্টর ঘোষাল—আমি ওদের বাড়ী যেতে পারব না, মেয়ের সেবা করব কিরকম—?"

ডক্টর ঘোষাল স্মিতমুখে বলিলেন—"তুচ্ছ একটা কথার জন্যে একটা মানুষের প্রাণ যাবে নিমাইবাবু?" অবশ্য গ্রামসম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বিশেষ নাই, তবু বলতে পারি—অর্থাৎ শুনে শিখেছি যে, যারা একদিন দূরে সরে থাকে, সময়বিশেষে তারাই আবার উপকার নিতে আসে। আপনিও মেয়েদের মত যদি অত ছোট ছোট কথায় কান দেন, তবে—"

নিমাই বাধা দিল, বলিল, "আপনার কথা সত্য, আমি কাল হতে পুঁটুর ভার নেব, আর পরশু দিন আমাকে সহরে যেতে হবে একটা কাজের জন্যে, তখন আপনাকে খবরটা দিতেও পারব।"

উৎসাহিত হইয়া ডক্টর ঘোষাল বলিলেন, "তবে আর কি, আমি পরশু

এগারোটার মধ্যেই আপনার কাছে খবর পাব, কাল আর আমি আসব না, পরশু আপনার কাছে খবর নিয়ে ওষুধ পত্র ঠিক করে নিয়ে আসব।”

একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, “হ্যাঁ, উনি নিশ্চয়ই লেখাপড়া তেমন জানেন না যাতে—”

বাধা দিয়া নিমাই বলিল, “উনি বেশ লেখাপড়া জানেন ডক্টর ঘোষাল, পুঁটুর মা পূর্ব্ববাংলার মেয়ে, এখানে ভাগ্যদোষে এসে পড়েছেন। অনেক দেশ বেড়িয়েছেন, অনেক অভিজ্ঞতা ওঁর আছে।”

ডক্টর ঘোষাল আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “উনি পূর্ব্ব বাংলার মেয়ে, এখানে এসে পড়লেন কি করে?”

নিমাই ক্লিষ্টকণ্ঠে বলিল, “সে কথা আর বলবেন না, এমন দুঃখময় জীবন খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে। শুনেছি ওঁর বাবা মেয়ে নিয়ে একেবারে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, সেই সময় নিজের কোনো কাজে মুর্শিদাবাদে এসে তাঁর অসুখ হয়, একরকম প্রায় বাধ্য হয়েই বাবুর গোমস্তার হাতে মেয়েটীকে সমর্পণ করে যান।”

ডক্টর ঘোষাল বলিলেন, “বুঝেছি; কিন্তু এখন ওঁর দিন চলে কি করে?”

নিমাই একটু হাসিয়া বলিল, “আমাদের কর্ত্তা থাকতে কেউ কোনোদিন অনাহারে মরবে না ডক্টর ঘোষাল—এতো তাঁরই কর্ম্মচারীর স্ত্রী। পুঁটুর মাকে তিনি নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন, কিন্তু উনি স্বামীর ভিটে ছেড়ে কোথাও যেতে চান না; বাধ্য হয়ে কর্ত্তামশাই এই ঘরখানা নতুন করে দিচ্ছেন—।”

দূরে বাঁকের পথে বাস দেখা গেল—।

একদল ছেলেমেয়ে নিমাইকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল—ডক্টর ঘোষাল জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওরা কী চায়?”

সহাস্যে নিমাই বলিল, "ওরা খেতে চায়—লজেঞ্চস, চকোলেট, বিস্কুট এই সব, এ ছাড়া আর ওদের প্রার্থনীয় কিছু নেই।"

বাস আসিয়া পড়িল, নিমাই থামাইতে সঙ্কেত করিল, বাস থামিয়া গেল। বাসে উঠিতে গিয়া ডক্টর ঘোষাল থামিলেন, বলিলেন, "একটা কথা, রোগীকে বেশী করে ফল খাওয়াতে হবে, কিন্তু আপনাদের এখানে যে কিছুই পাওয়া যাবেনা তা বোঝা যাচ্ছে। আমি যদি পারি কিছু ফল কিনে কাল সকালেই পাঠিয়ে দেব; নিতে যেন আপত্তি করবেন না।"

বাস ছাড়িয়া দিল—।

নিমাই ফিরিল।

(১৮)

পুঁটুর অবস্থা অনেক ভালো, উত্তরোত্তর সে ভালো হইয়া উঠিতেছে।

ডক্টর ঘোষাল আরও দুদিন আসিয়া তাহাকে দেখিয়া গিয়াছেন। কয়েকদিন তিনি আসেন নাই, সম্ভব তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছেন। তিনি অনেক দয়া করিয়া পুঁটুর চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন, কেবল ঔষধ দিয়াই ছুটি লন নাই—পথ্য পর্য্যন্ত দিয়াছেন, এজন্য পুঁটুর মা মৃদুলা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ।

জীবনে যাহাকে কোনোদিনই সে ভাবিতে চায় নাই, নিয়তির চক্রে সে-ই আসিয়া দীর্ঘকাল পরে তাহার সামনে দাঁড়াইল, পরিচয় না পাইয়া কেবল দরিদ্রা বিধবার সন্তান জানিয়া তাহার কন্যাকে চিকিৎসা করিয়া, পথ্য দিয়া বাঁচাইল। পুঁটুর মায়ের দিক হইতে সে কৃতজ্ঞ হইয়াছে, মৃদুলার দিক হইতে সে এতটুকু কৃতজ্ঞ হইতে পারে নাই।

নিমাইকে এড়াইয়া চলা সম্ভব হয় নাই। পুঁটুর অসুখের সময় সে যখন

অত বড় মিথ্যা অপবাদের বোঝা মাথায় লইয়াও অসঙ্কুচিতচিত্তে কেবল-মাত্র সেবার দাবি লইয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল, তখন মৃদুলা তাহার ভবিষ্যৎ হারাইয়া ফেলিয়াছিল, কেবলমাত্র বর্ত্তমানের দারুণ বিভীষিকাই তাহার চোখের সামনে জাগিয়াছিল; এতটুকু আপত্তি সে করে নাই, করিতে মনেও ছিল না।

নিমাই যখন বলিল, "আমাকে পর মনে করবেন না মা, নিজের সন্তান বলে মনে করুন, আপনার বোঝা কতকটা আমাকে দিন। পরে কে কী বলছে ভেবে সঙ্কুচিত হলে আপনারই সর্ব্বস্ব যাবে, পরের কিছুই হবে না।"

তখন মৃদুলার দুটি চোখ ছাপাইয়া অকস্মাৎ ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, সে মুখের অবগুণ্ঠন তুলিয়া দিল।

নিমাই এ পর্য্যন্ত কোনোদিন মৃদুলার মুক্ত মুখ দেখিতে পায় নাই, প্রথম সেই মুখের পানে তাকাইয়া সে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল, বিস্মিতভাবে সেই মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

পরমুহূর্ত্তেই সে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া মৃদুলার পায়ের কাছে নত হইয়া পড়িল, তাহার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া বলিল, "আবার বলছি আমায় এতটুকু সঙ্কোচ করবেন না মা, আমি আপনার সন্তান।"

চোখ মুছিয়া মৃদুলা বলিল, "না বাবা, সঙ্কোচ করব না, ছেলের কাছে মায়ের লজ্জা সঙ্কোচ করার হেতুও নাই। তুমি সত্য কথাই বলেছো, পরের কথা শুনে বর্ত্তমানকে হারালে আমার ভবিষ্যতের সঞ্চয় থাকবে না; সব হারিয়েও আজও আমি যা পাওয়ার আশা করছি, আমার সে-আশা নষ্ট হয়ে যাবে।"

নিমাই রোগীর সেবার ভার গ্রহণ করিল এবং মৃদুলা ভার দিয়া পরম নিশ্চিন্ত হইল।

বাহিরে এদিকে এক তুমুল আন্দোলন চলিল, সে আন্দোলনের ঢেউ গিয়া শম্ভুনাথের অন্তঃপুরে—মিলি যেখানে প্রাইভেটে বি, এ. পরীক্ষার জন্য পাঠ প্রস্তুত করিতেছিল, সেখানেও পৌঁছাইল। মিলির হাতের বইখানা সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল,—সেখানা কুড়াইয়া লইবার কথাও তাহার মনে হইল না।

অনেক দিনের ত্যক্ত বইগুলি লইয়া সম্প্রতি মিলি বসিয়াছে; একজামিন সে দিবে এবং ডিগ্রী সে লইবেই। তাহার এক বন্ধুর গত বৎসর বিবাহ হইয়া গেছে, সেও এ বৎসর বি, এ. একজামিন দিতেছে জানাইয়াছে। এই পত্রখানা পাইয়া মিলির লুপ্ত উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছে, সেও পড়িতে স্থুরু করিয়াছে।

কয়েকখানা বই ছিল না, এই বইগুলির জন্য শম্ভুনাথকে না জানাইয়া উপায় নাই, কাজেই জানাইতে হইল।

মিলি অগত্যা তাঁহাকে জানাইল, শম্ভুনাথ কেবলমাত্র বলিলেন, "হুঁ"—

মিলি অপ্রসন্নমুখে বলিল, "হুঁ বলে চুপ করে রইলেন যে জ্যেঠামণি, সোজা কথায় বলুন না আপনার ইচ্ছে আছে কিনা ?"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "আপত্তি করবার কিছু নেই মা, তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে তুমি একজামিনটা দিতে পারো। তবে কথা হচ্ছে—যদি কিছু জানবার দরকার হয়, তুমি জানবে কার কাছে ?"

মিলি বলিল, "জানবার দরকার বিশেষ হবে না, বই পেলেই আমি সব ঠিক করে নেব, আপনি শুধু বই কয়খানা যদি আনিয়ে দেন।"

শম্ভুনাথ চিন্তিত মুখে বলিলেন, "বইয়ের জন্যে বিন্দুমাত্র ভাবনা নেই, তুমি বরং কিছু টাকা নিজের কাছে রাখো—যা বই লাগে আনিয়ে নাও। হ্যাঁ, তোমার যেখানে বাধবে বরং আমাদের নিমাইকে জিজ্ঞাসা করে

নিতে পারো, সে খুব ভালো হয়ে বি, এ. পাস করেছে, জানো তো? আমি আজই তাকে বলে দেব এখন; বইও না হয় তাকেই যোগাড় করে দিতে বলব—"

সবেগে মাথা নাড়িয়া মিলি বলিল, "কোনো দরকার নেই জ্যেঠামণি, আমি নিজেই সব ঠিক করে নেব, ফোর্থ ইয়ার পর্য্যন্ত পড়েছি, কেবল একজামিনটাই দেওয়া হয় নি। আপনি এই সামনের মাসে একবার কলকাতা যাবেন বলেছিলেন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব, আমাদের প্রফেসরদের কাছে বরং জিজ্ঞাসা করে পড়া ঠিক করে নিয়ে আসব।"

শম্ভুনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, "কেন, আমাদের নিমাই তো মন্দ ছেলে নয়, লেখাপড়ায় সে তো খুব ভালো, বৃত্তি পেয়েছিল সে—"

মিলি অপ্রসন্ন মুখে বলিল, "তা হোক, আমি ওঁর কাছে পড়তে চাইনে জ্যেঠামণি, আমার ইচ্ছে হয় না।"

তাহার মুখের পানে তাকাইয়া শম্ভুনাথ কেবল একটু হাসিয়াছিলেন, সে হাসির উদ্দেশ্য মিলি বুঝিয়াছিল, তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তথাপি সে একটিও কথা বলে নাই, সব সহিয়া গিয়াছিল।

শম্ভুনাথ ইহার পরই বলিয়াছিলেন, "আর পড়ে কিই বা লাভ হবে; যা পড়া হয়েছে, জমিদারি চালাতে ওই ঢের। আমি যে তোমাদের কলেজে পড়িনি, তাতেও কি জমিদারি চালাতে পারি নে?"

মিলি রীতিমত চটিয়াছিল, বলিয়াছিল, "আপনারা আমাদের মুক্তি দিয়েছেন বলে থাকেন, কিন্তু সত্যই কি আমরা মুক্তি পেয়েছি? আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখে বলেন আমরা খুব বড়, যেহেতু আমরা মা। কেবল মা হওয়াটাই যদি মেয়েদের জীবনের সার্থকতা হয়, সন্তানকে গড়ে তুলবার মত শিক্ষা যদি সে মায়ের না থাকে, তবে তার মা হয়েই দরকার নেই।

আপনারা বলে থাকেন, বেশী লেখাপড়া শিখলে জাতজন্ম সব নষ্ট হয়ে যায়। কী যে আপনাদের পাড়াগাঁয়ের স্বভাব জ্যেঠামণি—"

শম্ভুনাথ শান্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "পাড়াগাঁয়ের স্বভাবই বল আর সহরের স্বভাবই বল, আমি ওসব কিছুর মধ্যেই নই। আমার মতে—মেয়েদের যখন বিয়ে করতেই হবে, অত বেশী লেখাপড়া শিখবার কী দরকার?"

মিলি প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল—"কোনো দরকার নেই?"

শম্ভুনাথ বলিয়াছিলেন, "থাকলেও সব সময়ে কাজে লাগে না। ওই আমাদের বউমা—পুঁটুর মা—শুনেছি বেশ লেখাপড়া জানে—জেনে কী লাভটা হয়েছে বল? আজ এই সময়ে ওর শিক্ষা গৌরবজনক নয় বরং লজ্জাকর বলেই ও মোটে কাউকে জানতে দেয় না। যাকে একমুঠো ভাতের জন্যে পরের গলগ্রহ হতে হয় তার লেখাপড়া জানাটা কি লজ্জাজনকই নয় মা,—কারণ ওতে তার আত্মপ্রসাদ লাভ করার কিছু থাকে না—সেই অনুভূতি এবং তার দরুণ লজ্জাটাই বেশী হয়ে দাঁড়ায়।

মিলি নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিল।

অনুসন্ধান লইয়া জানা গেল—কথাটা সত্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সে ঢাকা স্কুল হইতে স্কলারশিপ পাইয়া ম্যাট্রিক পাস করিয়াছিল।

সংবাদটা পাওয়া গেল আশ্চর্য্যরকমে।

মিলি সুরমা দাসকে যে পত্র দিয়াছিল তাহাতে এখানকার আর পাঁচটা কথার সঙ্গে আশ্চর্য্য সুন্দরী পুঁটুর মায়ের কথাটাও বলিয়াছিল। সেই পত্রের জবাবে সুরমা দাস লিখিয়াছিলেন—"যে অদ্ভুত সুন্দরী মেয়েটীর কথা তুমি লিখেছো মিলি, আমার জীবনে আমি এমনই সুন্দরী একটী মেয়েকে দেখেছিলুম—যে ছিল আমাদের স্কুলের গৌরব এবং সত্যই সে-কথা বলা অতিশয়োক্তি নয়। তুমি লিখেছো এই মেয়েটী ঢাকায় ছিল এবং যদিও

সে জানায় সে অশিক্ষিতা তবু তোমার অনুমান হয়, সে বেশ লেখাপড়া জানে। তুমি বলেছো—কয়দিন তোমার ঘরে তাকে ইংরাজী কাগজ পত্র নাড়াচাড়া করতে দেখেছো, কাজেই সে অশিক্ষিতা নয়। আমার মনে হয় এ মৃদুলা ছাড়া আর কেউ নয়। অদৃষ্টক্রমে যে ছিল আমাদের স্কুলের গৌরব, সে আজ তোমার বাড়ীতে রাঁধুনীর কাজ করে।

আমার একবার তোমাদের ওখানে যাওয়ার ইচ্ছা আছে, আমি নিজে একবার মৃদুলাকে দেখব এবং যদি সে চায় তবে তাকে নিয়ে আসব, তার যাতে উন্নতি হয় তাই করব। এখন তুমি তাকে আমার কথা বলো না, আমি হঠাৎ তার সামনে যেতে চাই।

তোমার স্বরমাদি।

মিলি কোনোদিনই পুঁটুর মাকে নাম জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পায় নাই, নিজেকে সে পুঁটুর মা নামেই সকলের কাছে পরিচিত করে।

এই পত্র পাইয়া মিলি একবার পুঁটুর মার কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই সময়ই সে শুনিতে পাইল—নিমাই পুঁটুর শুশ্রূষার ভার লইয়া তাহাদের বাড়ীতে আছে, নিজেদের বাড়ীতেও সে যায় না।

কেবল একজনের মুখেই নয়, সকলের মুখেই সে শুনিতে পাইল নিমাই অধঃপাতে গিয়াছে।

মিলির মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিল, মনটাও অকস্মাৎ তিক্ত হইয়া গেল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সে বইগুলি টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয়া বাহির হইল।

আজ বাহিরে বেড়াইতে যাইবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না—মনে হইতেছিল আবার কে নূতন কোনো কথা তাহার কানে তুলিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে না এবং সেও হয়তো অতর্কিতভাবে কোনো

কথা বলিয়া বসিবে। তাই বাহিরে না গিয়া কোনোদিন যে গোয়ালের দিকে যায় নাই, আজ সেই দিকে চলিল।

লম্বা, টানা একটি ঘর, কুড়ি পঁচিশটি গরু এখানে থাকে। প্রত্যেক গরুর জন্য একটি করিয়া খুঁটি পোতা এবং তাহাদের সামনের দিকে একটি করিয়া খাওয়ার পাত্র আছে। সকালবেলায় দুধ দুহিবার পরে বাড়ীর বেতনভোগী রাখাল সব গরু মাঠে লইয়া যায়, বৈকালে আবার ফিরাইয়া আনে।

হঠাৎ মিলিকে গোয়ালে আসিতে দেখিয়া ভৃত্য নবীন ভারি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। আজ কয়মাস দিদিমণি এখানে আসিয়াছেন, ইহার মধ্যে একদিনও তিনি এখানে আসেন নাই, আজ কী মতলব লইয়া আসিয়াছেন কে জানে। এ সব রাজা রাজড়ার কাণ্ডই আলাদা।

মিলি একেবারে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

নবীন ভয়ে ভয়ে বলিল, "এখানে কি করতেই বা এলেন দিদিমণি, এ ঘর যা নোংরা আর যে রকম দুর্গন্ধ তাতে—

মিলি উদাসভাবে একটু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তুমি তো রয়েছো নবীন, গন্ধ আমার যেমন লাগে—তোমারও তো তেমনি লাগবে; তোমরাও তো মানুষ নবীন—"

নবীন মাথা চুলকাইয়া একটু হাসিয়া বলিল, "আমরা মানুষ নই দিদিমণি, গরীবেরা নাকি মানুষ হয়?"

মিলি অত্যন্ত করুণচোখে তাহার পানে তাকাইল—বেচারা নিজেকে মানুষ বলিয়াও ধারণা করে না। অপরাধ তাহার নয়, অপরাধ তাহাদের—উচ্চবর্ণ হিন্দুর, অহঙ্কারে স্ফীত ধনীর। ইহারা ধনী ও দরিদ্র, অন্ত্যজ ও উচ্চবর্ণের মধ্যে যে মস্ত বড় একটা প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে, নবীনের

শ্রেণীর লোকেরা সসঙ্কোচে একপাশে সরিয়া থাকে, নিজেদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানাইতে তাহারা নারাজ।

নিমাইয়ের একদিনকার কথা মনে পড়ে।

নিমাই এই সব গরীব ছোটলোকদের ভালোবাসে, প্রত্যেকের সুখ-দুঃখের সঙ্গে সে নিজে ইচ্ছা করিয়াই জড়াইয়া গিয়াছে তাই কাহাকেও বাদ দিয়া সে চলে না। ইহা লইয়া মিলি একদিন তাহাকে বিদ্রূপ করিয়াছিল, —বলিয়াছিল সকলের সহিত অন্তরঙ্গভাবে মেশা উচিত নয়, তাহাতে আত্মমর্য্যাদা থাকে না।

নিমাই খানিকক্ষণ তাহার মুখের পানে নির্ব্বাকে তাকাইয়াছিল ;—ঘৃণা বা বিস্ময় কোনো ভাবই তাহার চোখে ফুটে নাই, সে চোখে ছিল কেবল করুণা,—মিলির প্রতি—সমগ্র ধনী-সমাজের উপর করুণা। একদিন একটী ভিখারিণী তিন চারটি সন্তান লইয়া মিলির কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, মিলি দারোয়ান দিয়া যেভাবে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, তাহা নিমাই ভুলে নাই।

দরিদ্রদের উপর মিলির মজ্জাগত বিতৃষ্ণা—; সে স্পষ্টই বলে—উহারা পৃথিবীর কলঙ্ক—ভগবানের জীবন্ত অভিশাপ, উহাদের বাদ দিয়া যদি পৃথিবী সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে সত্যই স্বর্গ হইত।

নিমাই মুখখানা বক্র করিয়া হাসিয়াছিল এবং তাহার সেই হাসি অতি তীক্ষ্ণ ছুরিকার মতই মিলির বুকে কাটিয়া বসিয়াছিল।

আজ নবীনের পানে তাকাইয়া মিলি ভাবিতেছিল ইহারা কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকে। সংসার যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়া পরকে লাভবান করে, নিজেরা মরিয়া সংসার যন্ত্রণা হইতে চিরমুক্তি লাভ করে।

মিলি আস্তে আস্তে ফিরিল।

অকস্মাৎ তাহার গোয়ালে আসা এবং চলিয়া যাওয়ার কোনো অর্থ নবীন পাইল না, সে নিঃশব্দে কেবল মিলির পানে তাকাইয়া রহিল।

আকাশে বেশ মেঘ করিয়া আসিয়াছিল, দমকা বাতাসও বহিতে সুরু করিয়াছিল; টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া হঠাৎ বৃষ্টি নামিয়া আসিল,—ভিজিবার ভয়ে মিলি ছুটিয়া পূজার দালানে উঠিয়া পড়িল, ভিতর বাড়ীতে যাইতে পারিল না।

মাস চারেক আগে পূজা হইয়া গিয়াছে। পূজার একমাস পূর্ব্ব হইতে এই পূজার দালানের শ্রী একেবারে বদলাইয়া গিয়াছিল। তখনকার দেয়ালের শুভ্রতা এখনও কতকটা আছে,—দেয়ালের বসুধারার চিহ্নও আছে। দেবদারুর শুষ্ক পাতা ঝরিয়া গেছে, দড়িগুলি খুলা হয় নাই। চার মাস আগে ঐ মস্ত বড় উঠানটা সামিয়ানা দিয়া ঘেরা হইয়াছিল, পূজার তিনদিন রঘুনাথপুরের যাত্রার দল এখানে যাত্রাগান করিয়াছে। কত দূর দূর গ্রাম হইতে কত লোক গান শুনিতে আসিয়াছে, অভিমন্যুবধ, সুরথউদ্ধার প্রভৃতি পালা দেখিতে দেখিতে কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে।

মানুষের মনে এখনও এতটা ভক্তি আছে। ঠকিতেছে জানিয়াও তাহারা ঠকে,—ঠাকুর দেবতার নামে কাঁদিয়া ভাসায়, ধর্ম্মের নামে দিনের পর দিন বহুকষ্টও হাসিমুখে সয়।

মিলি জ্ঞান হইয়া অবধি সহরের আবহাওয়ায় মানুষ, যেখানে বাড়াবাড়ি চোখে পড়ে নাই। অভিনয় দেখিয়া এমনভাবে সকলকে কাঁদিতে সে দেখে নাই; এখানে তাই সকলের দিকে চাহিয়া অজস্র চোখের জল ঝরিতে দেখিয়া তাহার মন কতকটা খারাপ হইয়া গেলেও সে জোর করিয়া হাসিয়াছিল। মানুষের এতটা দুর্ব্বলতা সহ্য করা যায় না—ক্ষমা করাও চলে না।

এদিক ওদিক চাহিতে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল পূজার বেদীর পাশেই পড়িয়া

আছে মস্ত বড় একটা সাপের খোলস, তুই একদিনের মধ্যে ছাড়িয়াছে বুঝা যায়।

সর্ব্বনাশ—

মিলি চীৎকার করিয়া উঠে আর কি।

তারণ বলিয়াছে সাপ যেখানে খোলস ছাড়ে, প্রায় তার কাছাকাছি দু চারদিন নাকি বিশ্রাম করে। কাজেই সাপটা যে এইখানেই কোথাও আছে তাহাতে মিলির বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বৃষ্টিকে তুচ্ছ করিয়া মিলি উঠানে নামিয়া পড়িল। সাপকে সে বড় ভয় করে। দু তিন দিন আগে সে দ্বিতলের জানালা হইতে নীচেকার ফুলবাগানের মধ্যে দুইটি বিরাটকায় সাপের খেলা দেখিয়াছিল। তাহারা ফণা তুলিয়া সারা বাগানময় ছুটাছুটি করিতেছিল, তাহাদের হিস্ হিস্ গর্জ্জনের শব্দ দ্বিতলের জানালায় মিলির কানে পৌছাইয়াছিল। কম্পিতবক্ষে মিলি দেখিয়াছিল তাহাদের উজ্জ্বল চোখ, লকলকে জিভ। কি সুন্দর জীব, আঁকিয়া বাঁকিয়া সারা দেহে আকুঞ্চন তুলিয়া চলে; ফণা কি চমৎকার ছড়াইয়া দেয়, স্থিরভাবে থাকিয়া অল্প অল্প ফণা দুলায়। এমন সুন্দর জীব, ইহার চুম্বনে আজ ভয়াবহ মৃত্যু—এই না আশ্চর্য্য!

ভিজিতে ভিজিতে মিলি ভিতর বাড়ীতে গিয়া পৌছাইল, উপরে উঠিয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

(১৯)

দীর্ঘ একখানা পত্র সেদিন যখন মৃদুলার হাতে আসিয়া পৌছাইল সেদিন সে বড় কম বিস্মিত হয় নাই, কারণ তাহাকে পত্র দিবার লোক

কেহ নাই এবং এই দীর্ঘকালে তাহার নামে পোষ্ট অফিসে কিছুই আসে নাই।

এনভেলাপখানা সে উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিল, কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, কলিকাতার ছাপ দেওয়া আছে।

পড়িবার অদম্য কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও মৃদুলা পড়িতে পাইল না; ভাত হইয়া গেছে, আগে ভাত নামাইয়া পরে ধীরেসুস্থে পত্র পড়া চলিবে। মৃদুলা পত্রখানা পিঁড়ির পার্শ্বে রাখিয়া আগে ভাতের ফেন ঝরাইতে লাগিল।

পুঁটুর অসুখ সারিয়াছে, তথাপি সে জমিদার বাড়ীর কাজ পায় নাই।

সেদিন পুঁটুকে লইয়াই সে জমিদার বাড়ীর অন্তঃপুরে আবার কর্ম্ম-প্রার্থিনীরূপে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—প্রথমেই তাহার দেখা হইল তারণের সহিত।

তারণ তাড়াতাড়ি কি কাজে যাইতেছিল, মৃদুলাকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল; শুষ্ক হাসি জোর করিয়া মুখে ফুটাইয়া সে বলিল, "তুমি এসেছো মা লক্ষ্মি, বেশ করেছো। বসো একটু, আমাদের মামণি এখনই আসছেন।"

খানিকক্ষণ মামণির জন্য অপেক্ষা করিয়া পুঁটুকে নীচে রাখিয়া পুঁটুর মা উপরে উঠিয়া গেল।

অন্তঃপুরের সমস্ত ভার মিলি গ্রহণ করিয়াছে—মৃদুলা তাহা জানে।

মিলির ঘরের দরজা খোলা, পর্দ্দাটাও একপাশে গুটানো রহিয়াছে, বাহির হইতে সব দেখা যায়। টেবিলের উপর বইগুলি এদিক ওদিক ছড়ানো পড়িয়া আছে, মিলি সেখানে নাই; মনে হয় সে পড়িতে পড়িতে কী দরকারে উঠিয়া গেছে, এখনই ফিরিবে।

মৃদুলা টেবিলের ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

একবার এদিক ওদিক তাকাইয়া সে অতি সন্তর্পণে যে বইখানা তুলিয়া লইল—সেখানা বি, এ. ক্লাসের মিলির একখানা পাঠ্যপুস্তক—।

বাহিরের বিপ্লবে মৃদুলার ভিতর—অর্থাৎ অন্তরটা মরিয়া গেছে, সেখানে জাগিয়া উঠিল নবজাগরণের সাড়া, মৃত প্রাণে জীবনের সঞ্চার। আজ বই দেখিয়া তাহার মনের ক্ষুধার তাড়না অকস্মাৎ অনুভূত হইল, বুভুক্ষিতের মতই সে বইখানা পড়িতে লাগিল। সে এমন নিবিষ্ট হইয়া গেল—নীচে তাহার পুঁটু দাঁড়াইয়া আছে, এ ঘরে মিলি এখনই আসিয়া পড়িবে—সে সব কথা তাহার মনে ছিল না।

সেই রকম সময়ে মিলি যে আসিয়াছে তাহা সে জানে নাই।—

মিলি দরজার উপর নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল—হঠাৎ সে প্রবেশ করিতে পারে নাই। একটু নড়িতে গিয়া পায়ের স্যাণ্ডেলের শব্দ হইতেই মৃদুলা চমকাইয়া মুখ তুলিল, মুখখানা হয়তো তাহার লাল হইয়া উঠিল, আস্তে আস্তে বইখানা সে নামাইয়া রাখিল।

মিলি ঘরে প্রবেশ করিল, গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি ইংরাজী জানেন নাকি?"

মৃদুলা যেন আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, "ইংরাজী? কি যে বল ভাই,—বাংলাই ভালো জানিনে, তার আবার ইংরাজী। বইখানা তুলে দেখছিলুম এত মোটা বই তুমি পড় কি করে, ওতে দন্তস্ফুট করার ক্ষমতা তো নেই। আমার এ হচ্ছে কুঁজোর চিত হয়ে শোওয়ার মত, বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানোও বলতে পারো।"

সে হাসিতে লাগিল।

মিলির মুখ গম্ভীর হইয়া ছিল, বলিল, "আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—কিছু মনে করবেন না যেন। আপনি সুরমা দাসকে

চেনেন, বেথুনের প্রফেসর সুরমা দাস,—কয়েক বৎসর আগে যিনি ঢাকায় একটা স্কুলে কাজ করতেন—?

মৃদুলার মুখখানা পলকের জন্য মলিন হইয়া উঠিয়া তখনই স্বাভাবিক রূপ ধরিল, বলিল, "না ভাই, তাঁকে আমি চিনব কি করে? কোন সেই পাড়াগাঁয়ে জন্মেছি, সহরের সঙ্গে সম্পর্কতো ছিল না ভাই, কাউকেই চিনিনে।"

মিলি বলিল, "এতদিন একসঙ্গেই থাকলুম অথচ আপনার নাম মোটে জানতেও পারলুম না।"

"নাম—"

পুঁটুরমার হাসি আর থামে না—"আমার আবার নাম? পুঁটু হওয়ার আগে যখন এ গাঁয়ে প্রথম এলুম, তখন আমার নাম ছিল বউ, পুঁটু এসে নাম হয়েছে পুঁটুর মা। আমার এখনকার পরিচয়—আমি পুঁটুর মা,—আমাকে ওই নামেই ডেকো ভাই।"

মিলি গম্ভীরভাবে চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর হইতে বইখানা টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল।

অপরূপ সুন্দরী এই মেয়েটীকে মিলি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না;—তাহার সৌন্দর্য্যই তাহার প্রকাণ্ড বড় অপরাধ। পুঁটুর মা যদি সাধারণ একটী মেয়ে হইত মিলি তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতে পারিত, হয়তো নিজের কাছে যেমন করিয়াই হোক আনিয়া রাখিত। কিন্তু পুঁটুর মায়ের অনিন্দনীয় সৌন্দর্য্য দিয়াছে বাধা, যাহার জন্য মিলি কিছুতেই তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না।

মিলির গম্ভীর মুখখানার পানে তাকাইয়া পুঁটুর মা একটু দমিয়া গিয়াছিল, খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে বলিল, "পুঁটু এখন ভালোই আছে; মাসখানেক তাকে নিয়ে ভারি বিব্রত ছিলুম, তাতে

কোনো কাজের কথা মনেই ছিল না। আজ সেই কথাই বলতে এসেছি, আমার কাজটা যদি আমাকে দেন—"

মিলি গম্ভীরভাবেই দুটি চোখ তুলিয়া তাহার মুখের উপর রাখিল, বলিল, "কিন্তু সে-কাজ যে অন্য লোকে করছে, তাকে এখন বিদায় দেওয়া যায় কি করে ?"

মৃদুলা আশা ছাড়িয়াও ছাড়িল না, বলিল, "ওঁকে বলেছিলুম, উনি বললেন তোমার কাছে জানাতে, কারণ বাড়ীর ভেতরকার যা কাজকর্ম্ম তার ভার তোমায় দেওয়া হয়েছে বললেন—"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মিলি বলিল, "উনি মানে—নিমাইবাবু বুঝি ?"

মৃদুলা উত্তর দিল,—"না—আপনার জ্যেঠামণি।"

মিলি বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল, "কিন্তু জ্যেঠামণি বললেই যে হবে তার কোনো মানে নেই, কারণ জ্যেঠামণি সংসারের কোনো খবরই রাখেন না, খাওয়ার সময় চারটি ভাত পেলেই তিনি খুশি—তা সে যে-ই দিক। আপনি যা বলছেন তা একেবারেই অসম্ভব—কারণ এই মেয়েটী যে রাঁধছে, তার কোনো আশ্রয় নেই, তাকে চিরকালের জন্যে আশ্রয় দিচ্ছি বলে কাজে নিয়েছি।"

মৃদুলা নিস্তব্ধে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "অবশ্য তোমরা যদি তাঁকে কথা দিয়ে থাকো, চিরকালের জন্যে আশ্রয় দিয়ে রাখো, তারপরে আমার কোনো কথা বলবার নেই। কিন্তু আমিও বড় অভাবে পড়েই কাজ নিয়েছিলুম, উপায় থাকতে কে পরের দুয়ারে কাজ করতে আসে বল।"

মিলি একটা কথা বলিবার সুযোগ পাইল, বলিল, "আমার মনে হয়—

উনি আপনার চেয়ে বেশী অভাবগ্রস্তা, বেশী কষ্ট পাচ্ছিলেন। আপনাকে দেখবার ঢের লোক আছে, ওঁকে দেখতে কেউ নেই। ওঁর ভাই আছে সত্য, তিনি এই বিধবা বোনকে কোনোদিন দেখেন নি; তিনটি সন্তানকে নিয়ে এই দুর্ভাগিনী বিধবা ভিক্ষা চেয়েও কিছু পান নি। ভগবানের ইচ্ছায় আপনার এ অবস্থা কোনোদিন হয়নি, প্রার্থনা করি যেন না হয়। জ্যেঠামণি আপনাকে মাসিক আট টাকা করে সাহায্য করেন, আপনি না খাটলেও চলে; এইতো সম্প্রতি আপনার ঘর ছাওয়ানো হয়েছে; যাতে আপনার ভালো হয়, নিমাইবাবু তা প্রাণপণে করছেন, জ্যেঠামণিকে দিয়ে করাচ্ছেন। নিমাইবাবু যখন আপনার এত বড় সহায়, আপনার ভাবনার কোনো দরকার নেই। তিনি নিজে যতদূর পারেন আপনার সাহায্য করছেন, তা ছাড়া জ্যেঠামণিকে দিয়ে করাচ্ছেন। জ্যেঠামণি তাঁর কথা বেদবাক্য বলে জানেন, তাঁর কথায় আপনার কোঠা বাড়ী পর্য্যন্ত উঠতে পারে।”

অত্যন্ত মার্জ্জিত ধরণের কটূক্তি; পল্লীর তথাকথিত অশিক্ষিতা মেয়েরা এমন মার্জ্জিতভাবে কথা বলিতে অশক্ত। তাহারা যাহা কিছু বলিবে সোজাসুজিই বলিয়া যাইবে, কিন্তু মিলি শিক্ষিতা মেয়ে; কটূক্তি সে ঘুরাইয়া মিষ্ট করিয়া বলিয়া যায়।

জ্বালা যে কোথায় এবং কতখানি তাহা মিলির কথাতেই মৃদুলার বোঝা উচিত ছিল, কিন্তু মৃদুলা বুঝিল না, ইচ্ছা করিয়াই বুঝিতে চাহিল না।

তবু খানিক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অতি গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদুলা বলিল, “আচ্ছা, আমি চললুম।”

মিলি বইয়ের পাতায় নিবিষ্টভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিল, কোনো উত্তর না দিয়াও পদশব্দে সে বুঝিল পুঁটুর মা চলিয়া গেল। অপাঙ্গে

তাকাইয়া দেখিল পুঁটুর মা অত্যন্ত ক্লান্তভাবে চলিয়াছে, দেহভার যেন সে টানিয়া চলিতে পারিতেছে না।

সে অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে মিলি সশব্দে বইখানাকে টেবিলের উপর ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। দরজার কাছেই দেখা গেল তারণকে ;—আত্মগোপনের চেষ্টা করা সত্ত্বেও দৈবক্রমে সে মিলির কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

শুষ্ক একটু হাসিয়া সে বলিল, "বেচারা পুঁটুর মাকে কাজটা দিলে ভালোই হতো মামণি, সত্যিই ভারি কষ্টে পড়েছে। ভদ্দর লোকের মেয়ে, হাত পেতে ভিক্ষে করাটা ভারি অপমানের কিনা তাই কোনো কাজ করে—"

মিলি রাগ সামলাইতে পারে না, তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু এরকম উঞ্ছবৃত্তি করার চেয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে যদি লোকের দয়া চেয়ে ভিক্ষা নিতো তাও ভালো হতো। দেখছি পুঁটুর মা কেবল নিমাই বাবুরই নয়,—তোমারও মাথা খারাপ করে দিয়েছে তারণ ; তোমাদের নাকে দড়ি দিয়ে বেশ বাঁদর নাচাচ্ছে যা হোক—পুঁটুর মার বাহাদুরী আছে। নিমাইবাবু একজন গ্র্যাজুয়েট, তিনি যেমন নিজেকে হারিয়েছেন—তুমি এই বুড়ো বয়সে—তুমিও কিনা ; ছিঃ! এরকম ভাবে আরও কতজন নাচছে, বলতে পারো ?"

ক্লান্তপদে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে পুঁটুর মা একথাগুলি স্পষ্ট শুনিতে পাইল ; সে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, নচেৎ হয়তো সে পড়িয়া যাইত।

কাল সারারাত সে ঘুমাইতে পারে নাই। আজ কেবল যদি নিজের জন্য হইত সে ভাত রাঁধিত না, উপবাস করিয়া কাটাইয়া দিত ; এমন উপবাস সে মাসে কুড়িদিনও করিতে পারে। নিজের জীবনের উপর

তাহার দারুণ বিতৃষ্ণা জাগিয়াছে,—কেবল পুঁটুকে উপলক্ষ্য করিয়াই সে বাঁচিয়া আছে, নচেৎ এতদিন সে আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইত।

মৃদুলার জীবনের একমাত্র অবলম্বন পুঁটু ;—

তাহার পানে তাকাইয়া মৃদুলার চোখের পলক পড়ে না। এবার অসুখ হইতে উঠিয়া মেয়েটা কি রোগাই না হইয়া গেছে, দেখিলে চেনা যায় না। নিমাই বলে, পুঁটুর যে রকম শক্ত অসুখ হইয়াছিল তাহাতে বাঁচানোই দুঃসাধ্য হইত যদি সঙ্গে সঙ্গে অতবড় ডাক্তার না দেখিত, অমন ঔষধ না পড়িত, পুঁটুর মা অমনভাবে পথ্যের দিকে দৃষ্টি না দিত।

আর সেবা— ?

সে কথাটা নিমাই বলে না, কিন্তু পুঁটুর মা জানে, নিমাই যদি একাগ্রচিত্তে অমনভাবে সেবা না করিত, ডাক্তারই দেখুক আর ঔষধ পথ্যই পড়ুক ; পুঁটু কখনও বাঁচিত না।

এখনও পুঁটুর পথ্যের দিকে পুঁটুর মায়ের দৃষ্টি অতি সতর্ক, এতটুকু ত্রুটি তাহার হইবার যো নাই। সকাল বেলাই স্নান সারিয়া আসিয়া সে পুঁটুর আহার্য্য প্রস্তুত করে, মাপমত তাহাকে খাওয়ায়, এতটুকু ব্যতিক্রম হওয়ার যো নাই।

আজও ভাত নামাইয়া আগে সে তাড়াতাড়ি করিয়া পুঁটুর মাছের ঝোল বসাইয়া দিল। সদ্য আগত পত্রখানা পাশেই পড়িয়া রহিল, সেখানা পড়িবার সময় তখন তাহার ছিল না। বুভুক্ষু পুঁটু পাশেই ভাতের অপেক্ষায় বসিয়া আছে, দুইটা ভাত খাইয়া তবে সে শান্ত হইবে।

সে বলিতেছিল, "মাছের ঝোলটা হলেই ভাত খাব, না মা ? তারপরে তুমি তোমার ভাত তরকারি চড়িয়ে দিয়ো। ওষুধটা বড্ড তেতো লাগে মা, আর না খেলেই তো হয়, এখনতো আমি ভালই আছি—কি বল ?"

পুঁটুর মা সস্নেহে হাসিল, বলিল, "তা বই কি, গাং পার হয়ে কুমীরকে কলা দেখানো চাই তো। ওষুধ না খেলে আবার জ্বর হবে—নিমাইদা একথা বার বার করে বলে দিয়েছে না; এই সবে অতবড় ব্যারামটা থেকে উঠেছো, এখন এতটুকু অবহেলা করলে আবার ঘুরে পড়তে হবে তা জানো তো?"

মাছের ঝোলটা চড়াইয়া দিয়া সে পত্রখানা তুলিয়া লইল, এতক্ষণে তাহার পত্র পড়ার অবকাশ হইল।

দীর্ঘ কয়েক বৎসর সে এখানে আছে, এ পর্য্যন্ত তাহার নামে কোনো পত্র আসে নাই। তাহাকে পত্র দিবার কেহ নাই, সেও কখনও কাহাকেও পত্র দেয় নাই—কারণ আপনার লোক দুনিয়ায় তাহার কেহই ছিল না। আজকার এই পত্রখানা আসিয়া তাহাকে আশ্চর্য্য করিয়াছিল বড় কম নয়, সে ভাবিয়া পাইতেছিল না কে তাহাকে পত্র দিয়াছে।

গোকর্ণ গ্রাম তাহার অসহ্য বলিয়া মনে হইতেছে। এতদিন অনেক অত্যাচার, অনেক নিগ্রহ সহিয়াও সে এখানে এই স্বামীর ভিটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বাস করিতেছিল, আজ তাহার এখানকার সে আকর্ষণ যেন কাটিয়া গিয়াছে। এই নূতন ঘরখানার পানে তাকাইয়া সে ভাবিতেছিল—ইহা মেরামত করিবার কোনো আবশ্যকই ছিল না, আজ যে কোনো উপায় পাইলে সে এখান হইতে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত।

মিলির ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা তাহাকে আঘাত দিয়াছে বড় কম নয়। এই ঘর নিমাইয়েরই একান্ত চেষ্টায় তৈয়ারী হইয়াছে; যদিও মিলির জ্যেঠামণি সমস্ত টাকা দিয়াছেন, তথাপি তিনি যে নিমাইয়ের কথাতেই টাকা দিয়াছেন, একথা মিলি আজ জানাইয়া দিয়াছে। কথাগুলি পুঁটুর মায়ের অন্তরে খোঁচা দিতেছিল, সকাল হইতে সে তাই বার বার অন্যমনস্ক হইতেছিল।

কাল সমস্ত রাত্রি পুঁটুর মা ঘুমাইতে পারে নাই, অপনার অজ্ঞাতে চোখের জল ঝরিয়া ঝরিয়া তাহার উপাধান ভিজিয়া গেছে। শতবার, সহস্রবার সে নিজেকে প্রশ্ন করিয়াছে—কেন, কেন সে স্বেচ্ছায় এই অপমান মাথা পাতিয়া লইয়াছে,—কেন সে ঘর তৈয়ারী করিতে রাজী হইল, কেন সে এখানে রহিল? সে পুঁটুকে লইয়া পথে বাহির হইত, ভিক্ষা করিয়া খাইত, সে পথ তাহার রুদ্ধ করিত কে?

ভিখারিণীর আবার অপমান—আত্মমর্য্যাদা বোধ—

হাসি পায়।

উদরে অন্ন জুটিলেই যথেষ্ট, মান ইজ্জতে কোনো দরকার ছিল না। আজ সে যে মাসিক সাহায্য পায়, শম্ভুনাথ যে মাথা গুঁজিবার মত ঘরখানা তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন ইহার জন্য দায়ী নিমাই,—

এই কথাটা মনে হইতে মৃদুলার গা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল; সে পত্রখানা তুলিয়া লইলেও খুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

(২০)

পত্রের নীচে যে নামটা ছিল তাহার পানে চোখ পড়িতে মৃদুলা চমকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল।

ডক্টর ঘোষাল—সেদিনকার মণিময় ঘোষাল তাহাকে পত্র দিয়াছে,—ইহাও কি সম্ভব?

মণিময়—মণিময়—

মৃদুলা চক্ষু মুদিল।

একবার সে মনে করিয়া লইল—সেই মণিময়, একদিন সে অতি নিকটে আসিয়াছিল, তাহাকে জীবনের সঙ্গিনী করিতে চাহিয়াছিল, নিজের সমস্ত ভার তাহাকে দিতে চাহিয়াছিল। মৃদুলা সেদিন তাহাকে একান্ত মনে

কামনা করিয়াছিল, মণিময়ের উপযুক্ত স্ত্রী হইবার জন্য সে কায়মনে চেষ্টা করিয়াছিল; হয়তো হইতও তাহাই, তাহার একান্ত কামনা কখনই ব্যর্থ হইত না, কিন্তু হইল না কিছুই এবং হইল না কেবল সমাজের নিষ্ঠুর অনুশাসনে—।

নিষ্ঠুর অনুশাসন,—

মৃদুলার চোখের জল শুকাইয়া যায়, সে চোখে আগুন জ্বলে।

দুঃখও হয়—হাসিও পায়; মানুষের নিজের গায়ে যখন হাত পড়ে, ব্যথা পায়, তখনই সে সতর্ক হইয়া উঠে। দেখা যায় সভাসমিতিতে, বাহিরে পাঁচজনের কাজে যে অত্যন্ত বেপরোয়া, সে অন্তরে অনেকখানি কাপুরুষ, অনেকখানি দুর্ব্বল। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে যাহারা খুব উদার ও অগ্রগামী, নিজেদের সম্বন্ধে তাহারা ঠিক ততখানি সচেতন; নিজেদের চিরন্তন সংস্কার সম্বন্ধে তাহারা তেমনই সতর্ক।

মৃদুলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

সন্তানের নিকট চিরপূজিতা জননী, সন্তানের চিরহিতৈষিণী মা, তুমি কেবল নিজেকেই ধ্বংস কর নাই, নিজের ইহকাল পরকালই ঘুচাও নাই, তোমার সন্তানেরও ইহজনমটা—সুদূর অতীত হইতে সুরু করিয়া বর্ত্তমান ব্যাপিয়া সমস্ত ভবিষ্যৎটাই নিজের হাতে নিকষকালো অন্ধকার দিয়া লেপিয়া দিয়াছ। হয়তো আজও তুমি বাঁচিয়া আছ, নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্যে নিজের অদৃষ্টজাল নিজেই বুনিয়া চলিয়াছ। তোমার ভবিষ্যৎ আছে—অতীত নাই, তাই সন্তানের সম্বন্ধে তুমি উদাসীনা, তবুও সন্তানের অদৃষ্ট যে অলক্ষ্যে তোমারই অদৃষ্টজালের সহিত জড়াইয়া গেছে—তোমার কাজের ফল যে তোমার সন্তানকেই ভোগ করিতে হইতেছে তাহা তো তুমি জানো না নারি!

কেন সে মরিল না? অষ্টবজ্র কি ঘুমাইয়াছিল, পায়ের তলায় পৃথিবী

কেন তুফাঁক হইয়া সে নারীকে গ্রহণ করিল না, পায়ের কাছে বিষধর সাপ কেন ফণা তুলিল না, সমস্ত বিষটা সে নারীর সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া দিল না ?

সন্তানের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিয়া সে নারী গেল কোথায়, যদি কোনোদিন মৃত্নলার সহিত তাহার দেখা হয়, মৃত্নলা কৈফিয়ৎ চাহিবে— তাহাকে জগতে আনিয়া তাহার জীবনকে চিরকালের মত অন্ধকারে আবৃত করিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল কেন ? তাহার মত নারী অনায়াসে একটি শিশুকে হত্যা করিতে পারিত ; যে সংসার ত্যাগ করিয়া যায়, তাহার পক্ষে এ কাজ এমন কিছু শক্ত নয়। যে বিষ সে ঢালিয়া রাখিয়া গিয়াছে, এ বিষে একা কেবল মৃত্নলাই জ্বলিবে না, তাহার কন্যাও জ্বলিবে— তাহার পুত্রকন্যাও ইহার ফল ভোগ করিবে—তুর্নিবার লজ্জা—সে তুর্নিবার লাঞ্ছনা—

মৃত্নলা চোখ মুদিল—।

তাহাকে আসিতে হইয়াছে এই ঘরে—যাহার বেড়ার ওধারে পথের লোক দেখা যায়, চালার ফাঁক দিয়া অজস্র জল ঝরে,—পরের সাহায্যে— দয়ার দানে তাহাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। তাহার কন্যাকেও যাইতে হইবে এইরূপই কোনো ঘরে, তাহারই মত অন্নবস্ত্রের কষ্ট পুঁটুকেও সহ্য করিতে হইবে, চিরদিন অপরাধ গোপনের প্রচেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে।

পুঁটুর ভবিষ্যৎ—

মায়ের মতই নিবিড় অন্ধকার সে ভবিষ্যৎ তাহাতে পুঁটুর মায়ের এতটুকু সন্দেহ নাই।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃত্নলা পত্রখানা খুলিল—

ডক্টর ঘোষালের দীর্ঘ পত্র।

তিনি লিখিয়াছেন—

আমাকে সেদিন ওখানে তোমার মেয়ের চিকিৎসার জন্মে আসতে দেখে তুমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছ মৃদুল ; আমিও আশ্চর্য্য বড় কম হই নি, কেননা পূর্ব্ববঙ্গের একটী মেয়েকে এই মুর্শিদাবাদ জেলার একটি গণ্ডগ্রামে দেখবার আশা মোটেই করি নি।

হ্যাঁ, দেখাটা একেবারেই আশ্চর্য্য রকম, ধারণার সম্পূর্ণ বাইরে, কল্পনাও কোনোদিন করি নি। গোকর্ণে যে সভা হয়েছিল তাতে যোগ দিতে আমার বন্ধুর সঙ্গে মোটরে যখন যাচ্ছিলুম, তখনই দেখতে পেলুম তোমাকে,—তুমি স্নান করে এক কলসী জল নিয়ে সবে উঠছিলে, তোমার পাশে ছিল তোমারই মেয়ে পুঁটু।

আমি হঠাৎ তোমায় দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। বিশ্বাস কর মৃদুল, আমি এর আগে তোমায় অনেক খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও কারও কাছে তোমার এতটুকু সন্ধান পাই নি। দেশে শুনেছিলুম তুমি তোমার বাপের সঙ্গে কোথায় চলে গেছ, কেউ সে সন্ধান জানে না। তোমার বিয়ে হয়েছে কিনা, কোথায় আছ, এ সব খবর কেউ আমাকে দেয় নি।

কিন্তু কথাই আছে একাগ্রতায় অসাধ্য সাধন হয়, কিছুই দূরে থাকে না, দূর নিকটতম হয়,—অজ্ঞাতকেও জানবার, চিনবার স্থযোগ ও স্থবিধা দেয়। তাই আমার মনের একাগ্র কামনা সফল হয়েছে, দীর্ঘকাল পরে তোমার দেখা আমি পেয়েছি, আমার অন্তরের লক্ষ্মী মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে আমার একাগ্র সাধনায়।

সেদিনকার কথা মনে পড়ে কি মৃদুল, যেদিন তুমি দাঁড়িয়েছিলে অর্ঘ্য সাজিয়ে আমার সামনে, আমি নিতে গিয়ে নিতে পারলুম না আমার পিতামাতার জন্মে। সেদিন যাঁরা সমাজের রক্তচক্ষুর ভয় দেখিয়েছিলেন, সামনে বাধা জাগিয়েছিলেন, আজ তাঁরা কোথায়? একদিন আমার মায়ের চোখের জল আমায় দুর্ব্বল করে তুলেছিল, সেই

দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে আমি আমার সব হারিয়েছি, আমার সে অভাব পূর্ণ হলো না।

আজ আমার সেই হারানো দিনের কথা মনে পড়ে—যে দিন তুমি ছিলে অনায়াসলভ্য, আমার প্রতীক্ষায় ছিল তোমার সাজানো বরণডালা, তোমার বহু আশায় রচিত ফুলের মালা। সেই মালা কিনা অবশেষে পড়লো কপর্দ্দকহীন ভিখারী যাদব চক্রবর্ত্তীর গলায়,—কুৎসিত অপদার্থ বৃদ্ধ—

রাগ করো না মৃদুল; হয়তো সেদিনে সে তোমার পরম উপকারী বন্ধুর কাজই করেছিল। তোমার মৃত্যুশয্যাশায়ী পিতাকে সে দারুণ দুর্ভাবনা হতে মুক্ত করেছিল, তোমাকে ভেসে চলে যেতে দেয় নি; একটা কুঁড়ে ঘরও তার ছিল, যেখানে সে তোমায় এনে স্ত্রীর মর্য্যাদা দিয়ে স্থাপন করেছিল।

তাই বলে তুমি তাকে ভালোবাসতে পারো না মৃদুল, কৃতজ্ঞ হতে পারো। আমিও তার প্রতি কৃতজ্ঞ, তার আত্মার উদ্দেশ্যে আমি আজ একটা নমস্কার পাঠাচ্ছি। সে তোমায় এনে বেশীদিন বাঁচে নি, তোমায় তার বোঝা বয়ে বেশীদিন বেড়াতেও হয় নি।

তুমি বিধবা, কিন্তু এই তোমার পরম ও চরম মুক্তি। তোমার ভগবান তোমায় বন্ধন দিয়েও মুক্ত করে দিয়েছেন, এর জন্যে তুমি তোমার ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানাও মৃদুল।

দীর্ঘ দিন মাস বৎসরের পরে অভীপ্সিতা আমার, আমি তোমার দেখা পেয়েছি, আমার অতি কাছে তোমায় পেয়েছি, আর কেউই তোমায় আমার কাছ হতে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আজ ভাবছি, কয়েকটা বৎসর আগে যদি 'এই' সাহসটি আমার আসতো—

মৃদুল, আমার সেদিনকার অপরাধ ক্ষমা করো; আজ আমি তোমাকে

আবার আমার কাছে পেতে চাই, আনতে চাই, তোমার মেয়েকে মানুষ করে গড়ে তুলতে চাই—যাতে তোমার ব্যর্থ জীবন ওকে দিয়েই পূর্ণ হয়ে ওঠে। আসবে কি মৃদুল,—আমার কাছে ফিরে আসবে কি ?

তোমার কোনো ভয় নেই,—তোমার ধর্ম্ম আমি এতটুকু আঘাত করবো না, তোমার ব্রহ্মচর্য্য অটুট থাকবে। আমি কেবল তোমায় আমার কাছে এনে রাখতে চাই—কারণ অতীতেই আমি তোমায় শুধু ভালোবাসি নি, আমার বর্ত্তমানেও আমি তোমায় তেমনই গভীরতম ভালোবাসি। পার্থক্য—সেদিনকার ভালোবাসা ছিল তোমার শুধু মন নয়, বিশেষ করে তোমার সৌন্দর্য্যময় দেহটিকে কেন্দ্র করে, আজ তুমি দেহাতীত—আমার আয়ত্ত্বের বাইরে। তোমার ভয় নেই—আমি তোমায় অপবিত্র করবো না, আমায় এটুকু বিশ্বাস তুমি করতে পারো আমারই তালোবাসার জন্য, আমার প্রেম অভেদ্য বর্ম্মের মতই তোমায় ঘিরে থাকবে।

আমার ভালোবাসার পাত্রীকে আমি আমারই কাছে এনে রাখতে চাই—সে কেবল তারই জন্যে। আমি জানি,—আমি দেখেছি সর্ব্বস্বহারা বিধবা তুমি, একমাত্র অবলম্বন তোমার মেয়ে—তোমার পুঁটু ; আমি তোমায় ভরসা দিচ্ছি ওকে আমি মানুষ করব, যাতে তোমার ভবিষ্যৎ অন্ততঃপক্ষে এতটুকু শান্তিপ্রদ হয়, আমি তা করব।"

আমায় পত্রপাঠ জানিয়ো তুমি গ্রাম ছেড়ে এখানে আসতে পারবে কিনা ; নিজের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ হারিয়েছ, তোমার মেয়ের ভবিষ্যৎ গড়তে চাও কিনা। তোমার পত্র পেলে আমি তোমাদের এখানে আনবার ব্যবস্থা করব এ কথা মনে করে যাতে উত্তরটা শীঘ্র পাই তাই করো।

মণিময়।

পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া যায়, মৃদুলা দুই হাতে কপাল চাপিয়া ধরে।

মণিময় তাহাকে পত্র লিখিয়াছে, তাহাকে যাইতে বলিয়াছে, বলিয়াছে কেবল তাহার ভবিষ্যৎ যাহাতে শান্তিময় হয় তাহার জন্য সে পুঁটুকে শিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবে।

পুঁটু—, এই পুঁটুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই মৃদুলা আকুল হইয়া উঠে। তাহারই মত পুঁটুর ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিবে, তাহারই মত পরের দয়ার দানে পুঁটু বাঁচিবে—এ কথা ভাবিতেও মৃদুলা শিহরিয়া উঠে। খানিক আগেও সে ভাবিতেছিল তাহার মায়ের কাজের জের তাহার কন্যাকেও টানিয়া চলিতে হইবে, মুক্তি তাহারও নাই।

সন্তানের জন্য মায়ের আত্মত্যাগ, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন এ দৃষ্টান্ত যথেষ্ট মেলে। এককালে মৃদুলা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, আজ সে উড়াইতে পারে না। নিজের বুকে হাত রাখিয়া সে স্বীকার করে সবই সম্ভব, সন্তানের জন্য মা নিজেকেও ধ্বংস করিতে পারে—মা সব পারে।

লোকে নিন্দা করিবে, বলিবে পুঁটুর মা গৃহত্যাগ করিয়াছে ; কলঙ্ক তাহার হইবেই। কিন্তু তা হোক, পুঁটুর মা মৃদুলা তাহাতে ভয় পাইবে না। সে পথের সন্ধানে ফিরিতেছিল,—ভগবান এই মুহূর্ত্তে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। এই আশীর্ব্বাদ সে ফিরাইতে পারিবে না, পুঁটুর ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া পুঁটুর মা মরিতেও প্রস্তুত।

পুঁটু মানুষ হইবে—

মৃদুলার দুইটি চোখে স্বপনের জাল নামিয়া আসে, সে জাগিয়া স্বপ্ন দেখে।

তাহার জীবনের লক্ষ্য হারাইয়া গেছে, তবু সে লক্ষ্যের কথা ভুলে নাই। একদিন তাহার মনে কতখানি উচ্চ আশাই না ছিল, সে সব কয়টি ডিগ্রী লইবে, সে মানুষ হইবে, নিজের পায়ে নিজে ভর দিয়া দাঁড়াইবে।

এই কি সেই মৃদুলা ?

সৌন্দর্য্যে সে সকলের শ্রেষ্ঠা ছিল, গানে সে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল ; কি আবৃত্তি, কি খেলায়, কি সাঁতারে,—সর্ব্বোপরি লেখাপড়ায় সে সকলের উপরে স্থান লাভ করিয়াছিল,—এই কি সেই মৃদুলা ? আজ সে ইচ্ছা করিয়াই সব ভুলিয়া গেছে, নিজের নামটা সে নিজেই স্মরণ করিতে পারে না, তবু তাহার অতীত মরে নাই, তাহার অতীত জাগে নিশীথে নিস্তব্ধ শয্যায়—বাহিরের সব কিছু গোলমাল তখন স্তিমিত হইয়া আসে, মৃদুলার বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সব মুছিয়া যায়, জাগিয়া থাকে একমাত্র সেই মরা অতীত—সেই মুখর অতীত।

মৃদুলা মরিয়া গিয়াছিল, তাহাকে বাঁচাইল কে, কেন বাঁচাইল ?

নিজের স্বপ্নকে সফল করিতে চায় আজ সে কন্যার জীবনের মধ্যে। উপায় সে পাইয়াছে, ভগবানের যে দান সে পাইয়াছে তাহা সে ফিরাইয়া দিবে না, সে মাথা পাতিয়া লইবে।

মৃদুলা স্বপ্ন দেখে—পুঁটু মানুষ হইয়াছে, কৃতিত্বের সহিত সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সব কয়টি ডিগ্রী আয়ত্ত করিয়াছে, সে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। পুঁটুর খুব বড় ঘরে শিক্ষিত উপার্জ্জনশীল ছেলের সহিত বিবাহ হইয়াছে, পুঁটুর ঘর চাঁদের টুকরা ছেলেমেয়েতে পূর্ণ,—তাহারা মৃদুলার দৌহিত্র, দৌহিত্রী—

মৃদুলা স্বপ্নে ডুবিয়া যায়, বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হয়।

সে স্বপ্ন দেখে নিমাইয়ের মত স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ একটি শিক্ষিত ছেলের—যাহার মুখের মা আহ্বানে তাহার বুক ভরিয়া উঠিবে।

"মা—"

পুঁটুর আহ্বানে তন্দ্রা টুটিয়া যায়।

কোথায় কলিকাতা আর কোথায় ক্ষুদ্র গোকর্ণ গ্রাম। পুঁটু ছোট্ট

পুঁটুই আছে, সে আজও বড় হয় নাই; মৃদুলা আজও সেই কুঁড়ে ঘরেই আছে।

পুঁটু জিজ্ঞাসা করে, "কে চিঠি লিখেছে মা—"

পুঁটুকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া পুঁটুর মা বলে, "তোর মামাবাবু পত্র দিয়েছেন পুঁটু, তোকে তিনি কলকাতায় নিয়ে যাবেন, লেখাপড়া শিখাবেন, মানুষ করবেন,—তুই যাবি তো পুঁটু— ?"

"আমার মামা—?"

পৃথিবীর কোথাও যে তাহাদের কোনো আত্মীয়স্বজন আছে, তাহা পুঁটু জানে না। মামা, কাকা, জ্যেঠা প্রভৃতি কাহারও নাম সে এ পর্য্যন্ত শুনে নাই, আজ তাই সে একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "আমার মামাবাবু কই মা, মামাবাবু থাকলে এতদিন আসেননি কেন?"

আত্মবিস্মৃতা মৃদুলা বলিতে যাইতেছিল, যে-ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিয়াছেন তিনিই তাহার মামাবাবু, কিন্তু বলিতে গিয়া সে থামিয়া গেল, মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, "আছে তোর এক মামাবাবু, তিনি কলকাতায় থাকেন, মস্ত বড়লোক, মস্ত বড় গাড়ী বাড়ী, নাম করলে সবাই চেনে—"

বলিতে বলিতে সে স্তব্ধ হইয়া যায়, তাহার মন তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে ঝিমায়।

তখনই সে সচকিত হইয়া উঠে—"একটা কথা, এ সব কথা যেন কাউকে বলিস নে পুঁটু, খবরদার—খুব সাবধান।"

উৎসুক পুঁটু জিজ্ঞাসা করিল, "বললে কি হবে মা?"

মৃদুলা কেবল নিঃশ্বাস ফেলে,—কথা বলিতে পারে না।

সেই দিনই সে পুঁটুকে দিয়া একখানা খাম কিনিয়া আনিয়া ডক্টর ঘোষালকে পত্র লিখিয়া দিল।

সে স্পষ্টই জানাইল সে যাইতে রাজী, এবং কোনদিন যাইতে হইবে জানাইলে সে চলিয়া যাইবে। তাহার যাইবার জন্য কোনো ব্যবস্থা করিতে হইবে না, দিন এবং সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে সে সেইদিন সেই সময় রওনা হইবে।

দীর্ঘ দিনের পরিচিত গ্রাম,—এতদিন এখানে থাকিয়া গ্রামের উপর তাহার মায়া পড়িয়া গেছে।

ঘাটের পথে মৃদুলা চারিদিক পানে তাকাইয়া দেখে, নৃসিংহদেবের মন্দিরে মাথা নোয়ায়, চক্ষু মুদিয়া মনে মনে বারবার বলে, অপরাধ নিয়ো না ঠাকুর, আমার অপরাধ নিয়ো না। আমার পুঁটুর যেন মঙ্গল হয়, আমি তোমার কাছে সেই প্রার্থনা করি; আমায় পথ দেখিয়ো ঠাকুর, পথ দেখিয়ো।

(২১)

শম্ভুনাথের কানে আসিয়া যখন এ কথা পৌছাইল পুঁটুর মা পুঁটুকে লইয়া কাল সন্ধ্যাবেলায় একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে গোকর্ণ ত্যাগ করিয়াছে, তখন তিনি কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

দেবনাথ চৌধুরী একটা হাই তুলিয়া তুড়ি দিলেন, বলিলেন, "হরিবল, হরিবল; পেটে পেটে এতও ছিল—যার মানে ডুবে ডুবে জল খাওয়া, কেউ এতটুকু কিছু বুঝতে পারলুম না।"

সদয় ভট্টাচার্য্য আস্ফালন করিয়া বেড়াইলেন, "হবে না,—এ যে হতেই হবে। আমি অনেক আগেই বলেছিলুম না ঠিক এই রকমটিই ঘটবে। পুঁটুর মা যে এতদিন এখানে টিঁকে ছিল এই আশ্চর্য্য কথা। ওই আমাদের জীবন দত্ত, সে পুঁটুর মার কথা সব জানে, ওকে এ কথাটা বলবার অবকাশটাও কেউ দিলে না, এমনই তো এদেশের লোক।

জীবন দত্ত ব্যবসায়ী লোক, বাড়ী গোকর্ণ হইলেও কাজ কর্ম্মের জন্য তাহাকে সমস্ত বাংলায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কাপড়ের ব্যবসা এখানেই শুধু তাহার এক চেটিয়া নয়, বাংলার বিভিন্ন স্থানে তাহার কাপড়ের দোকান আছে।

জীবন দত্ত সম্প্রতি ঢাকা হইতে ফিরিয়াছে, এবং এতকাল বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিয়া সে যে-সত্য আবিষ্কার করিতে পারে নাই, এবারে সেই সত্য আবিষ্কার করিয়াছে। ঢাকায় গিয়া সে পুঁটুর মায়ের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছে, এমন কি পুঁটুর কুলত্যাগিনী দিদিমাকেও সে কলিকাতার চিৎপুরে আবিষ্কার করিয়াছে।

গ্রামের মাতব্বর দেব চৌধুরী, জ্ঞান চৌধুরী, শোভন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সদলবলে শম্ভুনাথ চৌধুরীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শম্ভুনাথ তখন তারণের মুণ্ডপাত করিতেছিলেন, তারণ নাকি আজকাল তাঁহার কথা শুনে না, তিনি তাহাকে পূর্ব্বে যাইতে বলিলে সে সোজা পশ্চিমে যায়; নিয়মিত তামাক পাওয়া যায় না ইত্যাদি। ইহার পরে আগে সে তবু শুইয়া বসিয়া ঘুমাইত, উপস্থিত সে নাকি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বেশ একটু ঘুমাইয়া লয়।

তারণ অবনতমুখে দাঁড়াইয়াছিল, যাহা দেখিয়া বেশ বুঝা যায় শম্ভুনাথের অভিযোগ মিথ্যা নয়—তিরস্কার করিবার এমন কি জুতা মারিবার অধিকার পর্য্যন্ত তাঁহার আছে।

অভ্যাগতদের দেখিয়া শম্ভুনাথ সোজা হইয়া বসিলেন, বলিলেন, "এসো সব—বসো। ওরে হতভাগা, এখনও কাঠ মেরে দাঁড়িয়ে রইলি যে; দেখছিস ফরাসটা ওদিকে গুটিয়ে গেছে, তবু যদি ঠিক করে দিস।"

তারণ তাড়াতাড়ি চাদর ঠিক করিয়া দিল, তামাক সাজিয়া আনিয়া গড়গড়ার উপর বসাইয়া দিল। শম্ভুনাথ জোরে জোরে তামাক টানিতে

টানিতে বলিলেন, "ওই যে আমাদের ঘরের মেয়েরা বলে না—"ইল্লত যায় না ধুলে, আর স্বভাব যায় না ম'লে,—তোর হয়েছে তাই তারণ। হাজার হোক, জাতের স্বভাব যাবে কোথায়—তোর রক্তের ধারা বদলাবে কি করে? তোর ইচ্ছে, তুই আমায় হাড়ে হাড়ে জব্দ করবি—তাই না এই জ্বর নিয়ে কাজ করবি অথচ এক ফোঁটা ওষুধ খাবি নে। কে তোকে বলেছে জ্বর নিয়ে আমার কাজ করতে শুনি? আমি তোকে বার বার শুয়ে থাকতে বলেছি, আমার কথা কানে না নিয়ে ফের এতগুলো কলকে সাজিয়েছিস, ফরাস পেতেছিস, পুকুর হতে জল পর্য্যন্ত তুলেছিস। ওষুধের শিশিতে যেমন ওষুধ ভরা তেমনই রয়েছে, এক দাগ ওষুধ পর্য্যন্ত খাস নি।"

সবিনয়ে তারণ বলিল, "আঙ্গুলে করে একটু মুখে দিয়েছিলুম বাবু, বড্ড তেতো লাগলো কিনা—"

"তেতো—" শম্ভুনাথ সঙ্গে সঙ্গে ঝঙ্কার ছাড়িলেন—"ওরে লবাব পুত্তুর আমার, ওষুধ খাননি, চেকে দেখে শিশি তুলে রেখেছেন। শুনলে দেবনাথ, আমার তারণ চন্দরের কথা শোন। আরও বল তোমরা,—এই তারণকে নিয়ে আমার হাড় পর্য্যন্ত জ্বলে গেল। আজ কয়দিন সমান জ্বর, একটিবার ডাক্তার দেখায় নি তবু, চুপচাপ জ্বরে ভুগছে। আমি নিজে ডাক্তার ডেকে দেখালুম, ওষুধ এনে দিলুম, তবু আমার তারণচন্দর একদাগ ওষুধ খান নি, তেতো বলে তুলে রেখেছেন। তারপর অসুখটি যখন বাড়াবাড়ি হবে, বিছনা ছেড়ে যখন উঠতে পারবিনে, তখন তোকে দেখবে কে, তোর পেছনে খাটবে কে তাই শুনি? শেষটায় অমনি করে ভুগে ভুগে যখন মরবি, তখন লোকজনই বা পাবো কোথায়? তিন কুলেতো কেউ নেই, মুখাগ্নি করবে কে, শ্রাদ্ধই বা করবে কে? এর পর ভূত হয়ে আমারই ঘরের ছাদে বসে থাকবি তো হতভাগা কোথাকার?

তোকে হাজার বার জুতো মারলেও আমার রাগ যায় না তারণ, চিরটাকাল আমায় জ্বালিয়ে আসছিস, মরেও জ্বালাবি।"

অত্যন্ত জোরে জোরে তিনি তামাক টানিতে লাগিলেন। তারণ সবিনয়ে মাথা নত করিয়া বাহির হইয়া গেল, একেবারে গেল না, দরজার পাশে আদেশের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

এতক্ষণে কথা বলিবার অবকাশ পাইয়া দেবনাথ চৌধুরী বলিলেন, "ছোটলোকদের অমনিই হয়। আপনি যে ওর ভালো করছেন তা বুঝবার ক্ষমতাই যদি ওর থাকবে তবে আর ছোটলোক বলেছে কেন? যাক,—যেতে দিন ওর কথা, এখন—"

অসহিষ্ণু শম্ভুনাথ বলিলেন, "যেতে দেই কি করে বল। ওকে আমি শায়েস্তা করব তবে আমার নাম শম্ভুনাথ চৌধুরী। এত লোককে ঢিট করলুম, একটা চাকরকে পারব না?"

শোভন মুখোপাধ্যায় ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু আমরা এসেছি একটা বিশেষ দরকারে চৌধুরী মশাই। তারণ আপনার ঘরের লোক, ওর কথা পরে হলেও চলবে, কিন্তু এই যে আপনারই মৃত কর্ম্মচারীর বউটী মেয়েটাকে নিয়ে আপনারই আশ্রয়ে পড়েছিল, সে এমনভাবে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হল, এ খোঁজটা আপনাকেই করতে হবে না কি?"

শম্ভুনাথ সোজা হইয়া বসিলেন, গড়গড়াটাকে সরাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "ও, আপনারা সেইজন্য বলতে এসেছেন বুঝি, কিন্তু এ খোঁজ করতেই বা হবে কেন,—মা লক্ষ্মী কিছু কাঁচা মেয়ে নন, বয়েসও তাঁর যথেষ্ট হয়েছে, পালানোর সময় তাঁর আর নেই, কাজেই তা নিয়ে মাথা ঘামানো অনর্থক। তাঁর কোনো আত্মীয়ের বাড়ীতে গেছেন, দুদিন বাদে হোক, দুমাস বাদে হোক আবার তাঁর স্বামীর ভিটেয় ফিরে আসবেন। এ ভিটে ছেড়ে বেশী

দিন তাঁর আর কোথাও থাকা চলবে না—হাজার হোক স্বামীর ভিটে,—তাঁর পরম তীর্থস্থান।”

প্রসন্ন হাসি ও তৃপ্তিতে তাঁহার মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

দেবনাথ অপ্রসন্নমুখে বলিলেন, “কিন্তু সবাই জানে—আপনিও বেশ জানেন তাঁর তিন কুলে কেউ নেই।”

শম্ভুনাথ রাগ করিয়া বলিলেন, “তাহলে বলছো আমি মিথ্যা কথা বলছি।”

দেবনাথ সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, “আমার অতখানি সাহস নেই চৌধুরী মশাই, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন এ কথা কেউই বলতে পারবে না। আমি বলছি—একটা মানুষের আগাগোড়া জীবনের কথা আপনি কতটুকুই বা জানেন চৌধুরী মশাই, যাতে—”

“জানি জানি, বউমার আত্মিনাড়ীর খবর আমি জানি বাপু, তোমাদের সে সব নিয়ে মাথা গরম করতে হবে না, নিশ্চিন্তভাবে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোও গিয়ে যাও—”

বলিতে বলিতে শম্ভুনাথ হাঁক দিলেন, “তারণ কোথায় রে, তামাকটা বদলে দিয়ে যা বাবা—”

তারণ দরজার পাশেই বসিয়াছিল, আসিয়া তামাক বদলাইয়া দিল। অন্যের অজ্ঞাতে চাপাস্বরে শম্ভুনাথ বলিলেন, “ওষুধটা আগে খেয়ে নিগে যা তারণ, আমায় আর জ্বালাস নে। বেশী তেতো লাগে, আগে একটু হত্তুকি চিবিয়ে নিয়ে তারপরে ওষুধ খেলে আর মোটে তেতো লাগবে না—দেখ গিয়ে।”

“যে আজ্ঞে—” বলিয়া তারণ বাহির হইয়া গেলে শম্ভুনাথ আবার অভ্যাগতদের দিকে ফিরিলেন।

জ্ঞানচৌধুরী বলিলেন, “আপনি আপনার বউমার কোনো কথাই

জানেন না চৌধুরী মশাই, দৈবক্রমে আমরা সে সব কথা জানতে পেরেছি। ওঁর মা ওঁকে ছোট রেখে চলে গেছে, সে চিৎপুর রোডে অতি জঘন্য স্থানে জঘন্য জীবন যাপন করে।"

শম্ভুনাথ আরক্তমুখে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "থাক থাক জ্ঞান, একজন স্ত্রীলোকের নামে এ রকম জঘন্য উক্তি করো না, তাতে মনের উদারতার বিকাশ পায় না। মিথ্যে করে কারও নামে এতটুকু কথা বলা আমি ঘৃণা করি, কোনো হৃদয়বান লোকে তা করতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস। আর তোমাদের চিনতে তো আমার বাকি নেই, তোমাদের জন্যে বউমাকে কি কষ্টটাই না সইতে হয়েছে, সব আমি জানি। সতী লক্ষ্মী যে মেয়েটী শাঁখা সিঁদূর নিয়ে স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরেছে তার নামে কলঙ্ক যারা রটায়, সতী সাধ্বী তারই মেয়েকে যারা পথচ্যুত করবার চেষ্টা করে তাদের আমি কোনোদিনই মানুষ বলতে পারি নে।"

জ্ঞানচৌধুরীর কান দুইটি লাল হইয়া উঠিল, বলিলেন, "আপনার কাছে আমরা মানুষ না হলেও মনুষ্যত্বের দাবী কোনোদিন ছাড়ব না চৌধুরী মশাই। আজ আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস না করুন, একদিন আপনাকে এ বিশ্বাস করতেই হবে, সে দিন আপনার অবিশ্বাস করবার উপায় থাকবে না জানবেন।"

তাঁহারা উঠিলেন, নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন।

"তারণ, ওহে তারণ চন্দর, দয়া করে একবার এ দিকে এসো দেখি—"

শম্ভুনাথের কণ্ঠস্বর কেমন যেন বিকৃত হইয়া গেছে।

তারণ দরজার উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

বিকৃতমুখে শম্ভুনাথ বলিলেন, "বলি, দিন দিন কি তামাক সাজতে শিখছো নাকি, কলকের আগুণ যে নিভে গেছে।"

তারণ অন্য কলিকায় আগুণ দিয়া ফুঁ দিয়া ধরাইয়া গড়গড়ার উপরে বসাইয়া দিল। অন্যমনস্কভাবে তামাক টানিতে টানিতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, নিমাই আজ সকাল হইতে এত বেলা পর্য্যন্ত আসে নাই। শম্ভুনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিমাই এসেছে ?"

তারণ উত্তর দিল, "না—"

"হুঁ—"

বলিয়া শম্ভুনাথ খানিক চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, "আজ মোটেই আসে নি ?"

তারণ বলিল, "ঘণ্টা দুই আগে এসে একবার আপনার কথা জিজ্ঞাসা করে তখনই বার হয়ে গেলেন।"

গড়গড়ার নলটা সজোরে ছুড়িয়া ফেলিয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "আর কিছু নয়, সে বউমারই সন্ধানে গেছে। কিন্তু কী দরকার ছিল বউমার সন্ধান করতে যাওয়ার—তুইই বল তারণ। বড় জ্বালায় জ্বলছিল তাই দুদিন কোনোও আত্মীয়ের বাড়ী হয়তো জুড়োতে গেছে। তোরা বলবি—কাউকে বলে যায় নি, কিন্তু বললে কি আর রক্ষে ছিল,—গাঁয়ের এই সব বন্ধুরা তার চলার পথ বন্ধ করে ফেলতো হাজারটা বেড়া দিয়ে। আমি বলছি বউমা আসবে, দু চার দিন পরেই ফিরবে, তুই দেখে নিস তারণ—আমার কথা যদি মিথ্যে হয়। আমার মন বলছে অমন লক্ষ্মী প্রতিমা কখনও নষ্ট হতে পারে না, গোলাপ ফুল স্বেচ্ছায় কখনও অধমের পায়ের অর্ঘ্য হয়ে পড়তে পারে না, দেবতার পায়েই পড়ে।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তারণ বলিল, "আমিও তা বিশ্বাস করি নে বাবু, তবে আমার মনে হচ্ছে মা লক্ষ্মী কেবল নিমাইবাবুকে বাঁচানোর জন্যেই চলে গেছেন।"

"নিমাইকে বাঁচানোর জন্যে,—তুই বলছিস কি তারণ ?"

শম্ভুনাথ এতখানি হাঁ করিয়া ফেলিলেন।

তারণ বলিল, "লোকে অমন দেবতার মত চরিত্র নিমাইবাবুকে কী কথাটাই না বলছে বাবু? বউমা মেয়ের অসুখের সময় কতবার বলেছেন —পুঁটু একটু ভালো হলেই আমি চলে যাব তারণ,—যেদিকে দু চোখ যায় আমি যাব, কেউ আমায় ফিরাতে পারবে না; সবই সহ্যি হতো বাবু, কিন্তু আমার মহামায়া মা পর্য্যন্ত যখন নিমাইবাবুর নাম নিয়ে বউমাকে পাঁচটা কথা শুনিয়ে দিলেন—"

ব্যাকুলকণ্ঠে শম্ভুনাথ বলিয়া উঠিলেন, "মহামায়া বলেছে,—কী বলেছে তারণ?"

তারণ উত্তর দিল, "ওই যে বললুম, নিমাইবাবুর নাম নিয়ে বউমাকে সেদিন অনেক কথা বললেন—

"আঃ, থাম থাম তারণ—থাম—"

শম্ভুনাথ দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিলেন।

মহামায়া দুর্ভাগিনী পুঁটুর মাকে অপমানকর কথা বলিতে পারে, এ ধারণা তিনি করিতে পারেন না। তাঁহার বংশের মেয়ে, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী মহামায়া—তাঁহারই মাসিক সাহায্যে বাঁচিয়া আছে যে লোক, তাহাকে কথা শুনায়, উপহাস করে এ কথা তিনি যেন ভাবিতেই পারেন না। দুর্জ্জেয় নারী চরিত্র, শম্ভুনাথের বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

তারণ সবিনয়ে বলিল, "এখানে থাকলে পাছে নিমাইবাবুর সঙ্গে মহামায়ার বিয়েতে কোনো গোলমাল হয়—বাধা পড়ে, সেই ভয়েই বউমা চলে গেছে, বিয়ের পরে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।

শম্ভুনাথ তারণের মুখের উপর দৃষ্টিস্থাপন করিয়া বলিলেন, "তুই ঠিক জানিস তারণ, বউমা ঠিক এই কথা তোকে বলেছে?"

তারণ মাথা নাড়িল, "না বাবু, বউমা এ সম্পর্কে কোনোদিন একটি কথাও বলেনি, কেবল বলেছিল পুঁটু ভালো হলে চলে যাবে। আমি সেদিন বউমার মুখ দেখেছি বাবু, মড়ার মত সাদা, নিঃশ্বাসও যেন বয়নি।"

শম্ভুনাথ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলেন, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তুই এখন যা, নিমাইকে যদি এর মধ্যে দেখতে পাস, একবার ডেকে দিস,—বলিস আমি ডাকছি, বিশেষ দরকার।

তারণ আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

নিমাই, পুঁটুর মা, মহামায়া—সবগুলা মিলিয়া মাথার মধ্যে একটা গোলমাল বাধাইয়া দিয়াছিল, শম্ভুনাথ হাত দুখানা একবার বিস্তৃত করিয়া দিয়া একবার গভীর স্বরে হাঁক দিলেন, "তারা, সিংহবাহিনী, মা গো—"

বেশ ছিলেন তিনি, নির্ব্বিবাদে দিন কাটিয়া যাইত, সংসারের এই সব ভেজালের মধ্যে জড়াইয়া নিত্য এইসব কথা শুনিতে শুনিতে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, মনও বড় কম উত্যক্ত হয় নাই। সব ছাড়িয়া দিয়া বানপ্রস্থ লইলেই ভালো হয়, কিন্তু ছাড়িবার দিন তিনি পাইতেছেন কই ?

(২২)

মিলি যখন নিমাইকে ডাকিয়া পাঠাইল নিমাই তখন বড় কম আশ্চর্য্য হয় নাই। একই স্থানে থাকিয়া দীর্ঘ দুই তিন মাস কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ নাই, মিলি লেখাপড়া লইয়া বাহিরের সংস্রব প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছে।

নিমাই কাছারি বাড়ীতে কাজ করিতেছিল, "বলিস কাজগুলো সেরে নিয়ে দেখা করব—তাকে বল গিয়ে।"

মিলি আবার আদেশ করিয়া পাঠাইল—এখনই আসা চাই, কাজ এখন থাক—পরে হইবে।

শম্ভুনাথ বলিলেন, "তাই হোক নিমাই, তুমি যাও। হয়তো অঙ্ক মিলাতে পারছে না, কি কোনো শক্ত কথা বুঝতে পারছে না যা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে তোমার সাহায্য দরকার। তুমি যাও বাপু, কাজ এর পরে হবে এখন, নইলে আবার যা তা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে এখন।"

মিলিকে তিনি এতটুকু ভয় হয়তো করেন, তাহার প্রকৃতির পরিচয় পাইতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। একটু হাসিয়া কাগজপত্রগুলি একপাশে সরাইয়া রাখিয়া নিমাই উঠিল।

ভিতর বাড়ীতে দ্বিতলে নিজের ঘরে মিলি নিমাইয়েরই অপেক্ষা করিতেছিল। নিমাই ভিতর বাড়ীতে আসিয়া দ্বিতলে উঠিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল; দাসী জানাইল মিলি তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া যাইবার আদেশ দিয়াছেন।

নিমাই উপরে উঠিয়া গেল।

মিলি একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল, নিমাইকে দরজার উপর দাঁড়াইতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, অদূরবর্ত্তী চেয়ারখানা দেখাইয়া বলিল, "বসুন—"

মিলি বেশ গম্ভীর হইয়াছে, এই কয়েক মাসেই তাহার স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন প্রথম দর্শনেই চোখে পড়ে।

যেদিন প্রথম তাহাকে কলিকাতা হইতে গোকর্ণে আনা হয়, সেদিনকার কথা নিমাইয়ের মনে পড়িয়া গেল। সেদিনকার সেই মিলি ও এদিনকার এই মিলিতে আকাশ পাতাল ব্যবধান মনে হয়। মিলি নিজের মর্য্যাদার মূল্য বুঝিতে শিখিয়াছে, চাকর মনিব বিচার করিয়া ওজন বুঝিয়া কথা বলে।

কিন্তু এ মিলিকে নিমাই সহ্য করিতে পারে না, সেদিনকার সেই মিলিকেই তাহার ভালো লাগিয়াছিল। অর্থের প্রাচুর্য্য মানুষকে এমন করিয়া বদলাইয়া দেয়, এই পরম সত্যটাই চরম আশ্চর্য্যরূপে তাহার নিকটে ফুটিয়াছে।

নিমাই বসিল না, টেবিলে একখানা হাত রাখিয়া তাহার উপরে কতকটা ভর দিয়া মিলির চেয়েও গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "বসবার মত সময় আমার এখন নেই মহামায়া দেবী; আপনি আমায় কি দরকারে ডেকেছেন সেটা একটু তাড়াতাড়ি শুনতে পেলেই ভালো হয়।"

মিলির মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল, তিক্তকণ্ঠে সে বলিল, "মনে রাখবেন আমি মহামায়া দেবী নই, আমি মিস মিলি চৌধুরী, অনুগ্রহ করে মিস চৌধুরী নামে ডাকলেই পরম বাধিত হব।"

নিমাই সহজভাবে বলিল, "সে নামটা কলকাতায় ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি। এখানে সবাই যদি মহামায়া দেবী বলে আর একা আমিই মিস চৌধুরী বলি, সেটা লোকের কাছে বিশেষ প্রীতিপ্রদ হবে না বলে আমি মনে করি, তা' ছাড়া নামে কিছু আসে যায় না। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, মিস চৌধুরী নামের চেয়ে মহামায়া নামটাই আমাদের কাছে বড় ভালো লাগে; ওই নামটার সঙ্গে সঙ্গে একটা পবিত্র ভাবে মনটা ভরে ওঠে।"

মিলি একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "পবিত্র আর অপবিত্র এই করেই না আপনারা রসাতলে যেতে বসেছেন। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে দেখতে চান শুচি—তাই অশুচি বলে অনেক কিছুই বর্জ্জন করে চলেছেন, এই শুচি আর অশুচি বেছে বেছেই এ জাতটা অধঃপাতে গেল। যাক, আগে আমার কথার জবাব দিন,—আপনাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না কেন?"

নিমাই উত্তর দিল, "অন্তঃপুর আর সদরের মাঝখানে অনেকখানি ব্যবধান থাকে, সেটা এখানে এসে নিশ্চয়ই বুঝেছেন; আর ওরই সঙ্গে জুড়ে দিন চাকর মনিব সম্পর্কটাও। যখন যা কাজ পড়বে, হুকুম করে পাঠাবেন—আমি করে দেব। যদি হুকুম তামিল না হয় তখন বলবেন, যে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন, তা মাথা পেতে নিতেই হবে—অন্ততঃপক্ষে যতদিন এখানে কাজ করব।"

মিলির মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে একটিও কথা না বলিয়া নতমুখে বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

নিমাই শান্তকণ্ঠে বলিল, "ভারি বেয়াড়া লোক আমি, ওজন বুঝে কথা বলা আমার দ্বারা হয় না, এই আমার প্রধান দোষ; সেজন্যে অপরাধ নেবেন না মহামায়া দেবী, দয়া করে ক্ষমা করে যাবেন। এখন বলুন আপনি কী জন্যে আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, বাইবে আমার অনেক কাজ আছে।"

মিলি বইয়ের ভিতর হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া তাহার সামনে ফেলিয়া দিল।

নিমাই জিজ্ঞাসা করিল, "আমি পড়ব?"

মিলি কেবলমাত্র বলিল, "খুসি—"

হাসি চাপিয়া নিমাই পোষ্টকার্ডখানা তুলিয়া লইয়া পড়িল, তারপর সেখানা টেবিলের উপরে রাখিয়া বলিল, "আপনার সুরমাদিদি তাঁর ভাইকে এখানে পাঠাচ্ছেন, কিন্তু আমাকে কী করতে হবে বলুন।"

মিলি বলিল, "তিনি এখানে আসার পথ জানেন না, যে 'ধাবধাড়া গোবিন্দপুর' আপনাদের গ্রাম, বাইরের লোক এদিকে এলে সাতজন্ম খুঁজলেও পাবে না। গোকর্ণ নাকি একটা গ্রামের নাম—আর নাম খুঁজে পাননি—রামঃ—"

গম্ভীরভাবে নিমাই বলিল, "সেজন্যে অনুযোগ করা মিথ্যে, কারণ আপনার বা আমার জন্মের অনেক আগে এ গ্রামের নামকরণ হয়ে গেছে। এখন আপনার বা আমার মতানুসারে এ গ্রামের ভিন্ন নাম দেওয়া যেতে পারে,—কিন্তু লোকে চিনবে না। যাই হোক, তিনি তো আসছেন, আমায় কি করতে হবে তাই বলুন।"

মিলি বলিল, "আপনার গিয়ে তাঁকে আনতে হবে।"

নিমাই আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আমি গিয়ে তাঁকে আনব? দেখছি তিনি বহরমপুর কোর্ট ষ্টেশনে নামবেন, সেখান হতে তাঁকে আনতে হবে, না এখানে আসার পথের ধারে দাঁড়িয়ে তাঁকে বাস হতে নামাতে হবে?"

মিলি বিরক্ত হইয়া বলিল, "না, বাস হতে নামবার সাহায্য করবার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে না, আপনাকে বহরমপুর কোর্ট ষ্টেশনে যেতে হবে, ওখান হতে তাঁকে আনতে হবে।"

নিমাই মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "কিন্তু এখন তো বহরমপুর যাওয়ার সুবিধা আমার হবে না। এদিকে সালতামামির সময়, এসময় একদিন কি—একবেলাও আমি এখান হতে কোথাও যেতে পারব না মহামায়া দেবী, আমায় এজন্যে ক্ষমা করুন।"

মিলি বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলিল, "বুঝেছি—কিন্তু মনে রাখবেন নিমাই বাবু, আপনি না থাকলে জ্যেঠামণির জমিদারি লাটে উঠবে না; আপনি আসার আগে যেমন ছিল, পরেও ঠিক তেমনই থাকবে। রাজা বিনা রাজ্যও চলে যায়, কেউ না থাকলেও কোনো কাজ আটকায় না। তবু যদি মনে করেন আপনি কাগজপত্র না দেখলে, হিসাব না মিলালে জমিদারি বিকাবেই, তাহলে না হয় আমার কাছে পাঠাবেন, আমি দেখে দেব। বি, এ. ডিগ্রী না হয় আজও পাইনি, তবু মনে হয় দেখতে বা হিসাব মিলাতে ভুল হবে না।"

তাহার কথার খোঁচাটুকু বুকে বিঁধিল, তবু নিমাই হাসিল, বলিল, "আপনি আমায় সাংঘাতিকরকম ভুল বুঝেছেন মহামায়া দেবী। হিসাব আপনি দেখতে পারেন, কিন্তু মনে রাখবেন ইউনিভার্সিটীর পড়া আর জমিদারি সেরেস্তার কাজ একেবারেই আলাদা, কাজেই এ সব কাজ আপনার দ্বারা হবে না।"

মিলি বলিল, "কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই সেটা বোধহয় জানেন আপনি যখন বি, এ. পড়তেন, তখন নিশ্চয়ই আর পাঁচজন ছেলের মতই অনেক উচ্চাশা আপনার ছিল, নিশ্চয়ই ভাবেন নি জমিদারি হিসাবনিকাশ আপনাকে করতে হবে, অথচ পারছেনও বেশ। আপনি যখন পারছেন, আমার দ্বারা পারাও অসাধ্য হবে না, কাজেই জেনে রাখুন আমি পারব।"

ধীরকণ্ঠে নিমাই বলিল, "সেটা কিন্তু একদিনেই হয় না মহামায়া দেবী, আমাকে অনেকদিন শিক্ষানবিশী করে তবে কাজের ভার নিতে হয়েছে।"

মিলি চুপ করিয়া রহিল, খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, "সোজা কথায় বলুন না—আপনি যাবেন না—এই কথা তো?"

নিমাই সংক্ষেপে বলিল, "কতকটা দুঃসাধ্য।"

মিলি দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "একটা কথা মনে করুন, আপনি প্রথমেই বলেছেন হুকুম শুনতে বাধ্য;—আমি আপনাকে হুকুম করছি আপনাকে আজ রাত্রের বাসে বহরমপুর পৌছাতে হবে। ভোরের ট্রেনটা ধরে বিকাশবাবুকে নিয়ে একখানা ট্যাক্সি করে সকালেই চলে আসতে পারবেন. কাজও বন্ধ থাকবে না। রাত্রে আপনার এমন কোনো রাজকার্য্য নেই যাতে রাত্রে কাজ না করলে জমিদারি লাটে উঠবে।"

নিমাইয়ের ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, "যত কাজই থাক, আপনি যখন মনিব হিসাবে আদেশ করছেন, চাকর হিসাবে সে আদেশ

আমায় পালন করতেই হবে। তবে সেই কথাই রইলো,—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আজ রাত্রেই আমি বহরমপুর যাব।"

সে চলিয়া যাইতেছিল, মিলি ডাকিল—"একটু থামুন—"

নিমাই ফিরিল।

মিলি ড্রয়ার খুলিয়া একখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, "এই টাকা কয়টা রাখুন। বহরমপুর হতে বিকাশদাকে একেবারে চা খাইয়ে ট্যাক্সিতে করে আসবেন। আর যদি কিছু লাগে—"

বাধা দিয়া নিমাই বলিল, "এতে ঢের হয়ে যাবে, আর কিছু লাগবে না। তবে অনর্থক ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়ার চেয়ে বাসের ফার্ষ্ট ক্লাস রিজার্ভ করে আনাটাই ভালো হয় না কি ?"

অসন্তুষ্ট হইয়া মিলি বলিল, "বেশ কথা বলছেন। অপরিচিত একজন ভদ্রলোক, যিনি নেহাৎ দয়া করেই গোকর্ণ গ্রাম দেখতে আসছেন দুদিনের জন্যে, এতে তাঁর মর্য্যাদা না বাড়ুক, আমাদের যে যথেষ্ট বাড়বে সে কথাও আপনাকে বলতে হবে ? আমার নিজের হাত খরচের টাকা আমি যা খুশি খরচ করব, আপনি আবার যেন দয়া করে এ কথাটা জ্যেঠামণিকে বলতে যাবেন না।"

"বলব না—"

নোটখানা পকেটে রাখিয়া নিমাই বাহির হইয়া গেল।

বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতেই শম্ভুনাথ সহর্ষে বলিলেন, "কেমন,—হলো তো ? আমি আগেই বলেছি—মা মণি হয় পড়া নয় অঙ্ক নি[illegible] ফ্যাসাদে পড়েছেন, এখন তোমার সাহায্য ছাড়া আর উপায় [illegible] এই তো ব্যাপার,—অথচ আমি আগেই বলেছিলুম—বি, এ. পড়লেই বা, তবু তো নিমাই পাস করেছে, অনেক বেশী জানে, ওর কাছে পড়। তাতে কিনা সে স্পষ্ট বললে—"

সহাস্যে নিমাই বলিল, "তিনি যা বলেছেন তা আমি বুঝেছি চৌধুরী মশাই, বলেছিলেন সেকালের অর্থাৎ চার পাঁচ বছর আগে পাস করেছে যে ছেলে—সে এখনকার বি, এ. ক্লাসের পড়া পড়াতে পারবে না। অন্ততঃ পক্ষে আমি যদি এম, এ. পাস করতুম, তাহলেও না হয় চলতো, অর্থাৎ আমার পড়ানোর ক্ষমতা হতো।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "কি রকম, মহামায়া তোমায় একথা বলছে বুঝি ?"

নিমাই কাগজপত্র গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, "না, মুখের সামনে স্পষ্টকথা শুনাবেন এতখানি ছোট তিনি নন। তবে তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে সেই ভাবটিই প্রকাশ হয় কিনা—সেটা বুঝতে পারা যায়।"

শম্ভুনাথ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, "এগুলো তুলছো যে ?"

নিমাই বলিল, "একবার বহরমপুর যেতে হবে কিনা—"

শম্ভুনাথ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিলেন, "কেন ?"

পরক্ষণেই কথাটা মনে পড়িয়া গেল, "ওঃ, মহামায়ার কে বিকাশদা আসবেন বটে, কোন একটা কলেজের প্রফেসার শুনেছি। মহামায়া বলছিল ওর বিকাশদা ট্রিপল্ এম, এ. পি, আর, এস. আবার পি, এইচ, ডি., মনে কর নিমাই সে বড় কম লোক নয়। তাঁর বোনটীও মহামায়াদের কলেজের প্রফেসার, কাজেই বোঝ, ওঁদের বংশের সবাই এক একটি রত্ন। তুমি বহরমপুর গিয়ে তাঁকে উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করে আনো। আর যে দুপাঁচ দিন তিনি এখানে থাকবেন, তোমায় বাপু কোনো কাজকর্ম্ম দেখতে হবে না, আমার মানমর্য্যাদা রাখবার জন্যে তোমাকে তাঁর সঙ্গেই থাকতে হবে। এদিককার জন্যে কোনো ভাবনা নেই, আমি ত্রিপুরারীকে দিয়ে সব কাজ চালিয়ে নেব এখন।"

নিমাই কাগজপত্র গুছাইয়া রাখিয়া অপ্রসন্নমুখে বলিল, "তবে তাই

করবেন ; কিন্তু যদি এতটুকু ক্ষতি হয়, আমাকে যেন সেজন্যে জবাব না দিতে হয়।"

সে বাহির হইয়া গেল।

(২৩)

দুই দিনের জন্য গ্রাম বেড়াতে আসিয়া বিকাশ পাঁচটা দিন কাটাইয়া দিল।

মিলি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বলেছিলেন আপনার ছুটি নেই ; এই পাঁচ দিনে কোনো ক্ষতি হবে না তো ?"

বিকাশ বলিল, "মোটেই না। কিন্তু আমি যে এখানে আছি তাতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে মিলি ?"

মিস চৌধুরী ছাড়িয়া সে এখন নাম ধরিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছে।

মিলি কোলাহল তুলিল, "অসুবিধা—কি যে বলেন আপনি, বরং আপনি এখানে থাকায় আমার যথেষ্ট উপকার হল মিঃ দাস, আমার পড়াশুনা অনেক এগিয়ে গেছে, যাতে আশা করতে পারি আমি এবারই একজামিন দেব।

বিকাশ বলিল, "আমিও সে আশা করি। বি. এ. পাস না করতে পারলে কোনোমতে তুমি কোথাও নিজের স্থান করতে পারবে না। তোমার জ্যেঠামণি হঠাৎ কেন যে তোমায় পড়া ছাড়িয়ে এই পায়রার খোপের মধ্যে এনে পুরলেন তা আমি বুঝতে পারলুম না। আর কিছু দিন কলকাতায় থাকলে তুমি বি, এ. পাসটা দিতে পারতে, অন্ততঃপক্ষে একটা ডিগ্রী থাকতো।"

মুখ ভার করিয়া মিলি বলিল, "ওঁরা বলেন—বেশী লেখাপড়া শিখে কি-ই বা হবে। মেয়েরা নাকি বেশী লেখাপড়া শিখলে অধঃপাতে যায়—নিজেদের কাজ ভুলে যায়—এই ওদের ধারণা।"

অসহিষ্ণু বিকাশ উগ্রস্বরে বলিল, "তাই বটে। মেয়েরা চিরকাল বাড়ীতে বন্ধ হয়ে থাক,—বাইরের আলো বাতাস তারা যেন না পায়—লেখাপড়া যেন না করতে পারে। চিরদিন কেবল পুরুষের সেবাই করে যাক, পদসেবা হতে রান্না, বাসনমাজা, আর বছরে বছরে সন্তান এনে কোনোরকমে তাকে লালনপালন করুক, এই তো মেয়েদের কর্ত্তব্য কাজ ওঁরা বলতে চান? ওঁরা—অর্থাৎ কোন মহাপণ্ডিতেরা আজ কালকার এই নারীপ্রগতির দিনে একথা বলতে সাহস করেন বলতো? তোমার জ্যেঠামণি বললে বলতে পারেন,—সেকেলে জমিদার, লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, নারীজগতে যে কি আন্দোলন চলেছে শিক্ষা আর স্বাধীনতা নিয়ে, সে বার্ত্তা উনি জানেন না—রাখেনও না। উনি ছাড়া আর কেউ এ সব কথা বলে কি?"

মুখ বিকৃত করিয়া মিলি বলিল, "জ্যেঠামণি যার কথায় ওঠেন বসেন সেই নিমাই চন্দরের মত এই, কাজেই জ্যেঠামণিরও মত বলে জানতে হবে।"

বিকাশ একমুহূর্ত্ত গম্ভীর হইয়া গেল, কেবল মাত্র একটা শব্দ তাহার মুখে শুনা গেল—"হুঁ—"

তুলনা করিয়া সে নিমাইয়ের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কয়টি ডিগ্রী লাভ করিয়াছে, সম্মানজনক কাজ করে—এদিক দিয়া নিমাই তাহার চেয়ে অনেক ছোট, কিছু নয় বলিলেও চলে। সে বার বার তাই মিলিকে শুনাইয়া দিয়াছে—"কী জানে তোমাদের নিমাই চন্দর, তোমাকে পড়ানোর মত ক্ষমতা ওর আছে? টেনেটুনে সেকালের বি, এ. পাসটা করেছে, একালের কোর্সটা একবার দেখুক দেখি। কোনো ভদ্র সমাজে মিশবার ক্ষমতা ওর আছে? চেহারা তো পাঞ্জাবী প্যাটার্ণের, না আছে লালিত্য, না আছে কিছু, যেন একটা গুণ্ডা।"

কিন্তু এই দিক দিয়াই সে হইয়া গেছে অত্যন্ত ছোট, সেটা সে নিজেও বুঝিতে পারে। সে দেখিয়াছে গ্রামের মধ্যে নিমাই কতখানি স্থান জুড়িয়া লইয়াছে, ছোট জাতেরাও তাহাকে কতখানি হৃদ্যতার সহিত গ্রহণ করিয়াছে।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিকাশ বলিল, "তুমি মনিব, সে তোমার চাকর হয়ে তোমাকে যা না তাই বলবার স্পর্দ্ধা করে, তুমি তা সহ্য করতে পারো মিল ?"

মিলি মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু আমি কী করতে পারি বলুন মিঃ দাস,—জ্যেঠামণির যে ওঁকে নইলে এক মিনিট চলে না। যাই বলুন, লোকটার ক্ষমতা আছে, কেউ ওই লোকটার সামনে একটি কথা বলতে পারে না, সবাই এত ভয় করে। অন্যায় মোটে সইতে পারেন না, হোক না কেন মনিব, তাকেও দু কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়েন না।"

অবহেলার সঙ্গে বিকাশ বলিল, "উঃ, মস্তো বড় বীর, তা দেখলেই বোঝা যায়।"

সাত দিন থাকার প্রস্তাব করিয়া হঠাৎ পাঁচ দিনের দিন সে কলিকাতা রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

শম্ভুনাথ সবিনয়ে বলিলেন, "তোমাকে বাবা বেশী দিন ধরে রাখবার উপায় তো নেই ; তোমরা কাজের লোক, ধরে রাখা মানে তোমার কাজের ক্ষতি করা। তবে তুমি আসায় মহামায়ার তবু দু দণ্ড কথাবার্ত্তা বলার সুবিধা হয়েছিল, তুমি চলে গেলে ওরই হবে মহামুস্কিল।"

বিকাশ বলিল, "কেন, আপনাদের নিমাইবাবু তো আছেন।"

শম্ভুনাথ একটু হাসিয়া কেশশূন্য মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "নিমাইয়ের কথা বাদ দাও, বাবাজি, তার মোটে ছুটিই নেই, দিনরাত তার কাজ। আমার কাজ সে দেখবে, তা ছাড়া বাইরের সব

কাজ, যেটি না দেখবে সেটি আর হবে না—চাকরবাকরগুলো পর্য্যন্ত ফাঁকি দিতে সুরু করে। এতো গেল এখানকার কাজ, ওদিকে গ্রামের মধ্যে গিয়ে দেখ—কোথায় কার কী বিপদ পড়েছে, কার কী করতে হবে ; তাই করে দিচ্ছে। কোথায় কার অসুখ, তার সেবা করা দরকার, নিমাই সেখানে ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা হতে রাত জেগে সেবা করা পর্য্যন্ত একা করে যাচ্ছে। কোথায় কার শবদাহ হচ্ছে না, নিমাই লোকজন জুটিয়ে চললো শ্মশানে, কার বাড়ীতে বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন, নিমাই গিয়ে সব দায়িত্ব মাথায় নিয়ে এমনভাবে কাজ শেষ করলে, যার আশাও কেউ কখনও করে নি। সেদিন দেখি অহিমুদ্দি শেখের ঘরের চাল ছাইতে সুরু করেছে মটকায় উঠে—কারণ অহিমুদ্দি বিছানায় পড়ে আছে, তার ঘর সারাবার ক্ষমতা নেই। আর বল কেন—ওর কি এতটুকু সময় আছে যে গল্প করবে, কি দু দণ্ড বসবে ?"

নির্জ্জলা প্রশংসাগুলো বিকাশ সহিতে পারে না।

তবু মনকে সে সান্ত্বনা দেয়, বেচারা গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাহার মত অসীমের মধ্যে নিজেকে বিস্তৃত করিয়া দিতে পারে নাই, কারণ তাহার শিক্ষা বিকাশের চেয়ে অনেক কম, জ্ঞানও এই গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যাক, এতটুকু লইয়া খুশি হইয়া যদি থাকে, বিকাশের তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই।

প্রস্তুত হইয়াও সেদিন বিকাশের যাওয়া হইল না, মিলি বলিল বিকাশ এ কয়দিন আসিয়া এখানকার কিছুই দেখে নাই, যাইবার আগে এখানকার বিখ্যাত নৃসিংহদেব, সিংহবাহিনী প্রভৃতি পুরাতন দর্শনীয় দেবস্থানগুলি দেখিয়া যাইতে হইবে, নচেৎ তাহার গ্রাম দেখা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

সম্পূর্ণ কালাপাহাড় বিকাশ সবেগে মাথা নাড়িল।

মিলি বলিল, "বেশ তো, ঠাকুর দেবতা বলে আপনি না হয় দেখবেন

না, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কীর্ত্তি হিসাবে দেখতে তো দোষ নেই, আপনি সেইভাবেই দেখবেন চলুন। ওদিকে মাঠের দিকটা আগে দেখবেন, তারপর এগুলো দেখা যাবে।"

একান্ত অসহায়ভাবে বিকাশ বলিল, "তোমার হাতে পড়েছি, যা বলবে তা করতেই হবে, চল যেখানে যাবে।"

মিলি কেবল হাসিল মাত্র।

গ্রামের পথ ঘাট সবই মিলির বেশ পরিচিত হইয়া গিয়াছিল, সেদিনে বেলা চারটা বাজিতে রৌদ্র একটু পড়িতেই বিকাশকে লইয়া সে বাহির হইল।

গ্রামের শেষ প্রান্তের পথ, সামনে কালো জলে পূর্ণ কয়েকটী পুষ্করিণী, একটীতে অসংখ্য পদ্মফুল ফুটিয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে। পুষ্করিণীর ধারে ধারে মাঠের এখানে ওখানে অসংখ্য তালগাছ থাকিয়া দর্শককে মুগ্ধ করিয়া দিতেছে।

বিকাশ বলিল, "ভারি চমৎকার—"

মিলি বলিল, "চমৎকার বলেই তো আমি এদিকে প্রায়ই বেড়াতে আসি মিঃ দাস, গ্রামের মধ্যে যাইনে—কারও সঙ্গে পরিচয়ও নেই।"

বিকাশ বিরাগের সঙ্গে বলিল, "এ রকম সব অজ্ঞ লোকদের সঙ্গে পরিচয় না থাকাই ভালো, ওতে মনের আরও অধোগতি হয়। বাইরে কত বড় জগৎ পড়ে আছে, এরা তার কোনো খবরই রাখে না, রাখতেও চায় না—সামান্য এতটুকু একটি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গ্রামের খবর নিয়ে, পরস্পরের সুখদুঃখের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে এরা অতিমাত্রায় খুশি হয়ে ওঠে।"

পথের বাঁক ফিরিতেই সামনে পড়িল নিমাই, একটা মস্ত বড় পাকা বাঁশের লাঠি লইয়া সে এইদিকেই আসিতেছে। বিকাশের সজোর

কথাগুলি সে শুনিয়াছিল, সামনাসামনি আসিতেই সে সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছেন ;—যা বলেছেন বিকাশবাবু, একেবারে হুবহু সত্যি, এতটুকু মিথ্যের ভাঁজ পর্য্যন্ত এতে নেই। মনিষীরা বলেছেন আগে বাড়ীর সকলকে দেখ, তারপর গ্রামের, দেশের দশজনকে দেখ, শেষে যদি তোমার সামর্থ্য থাকে, বিশ্বের মাঝে নিজেকে ছড়িয়ে দাও। এইসব গ্রামের লোক, বেচারারা না পেয়েছে শিক্ষা, না জানে সভ্যতা, কাজেই বাইরে যেতে— কারও সঙ্গে মিশতে ওরা ভয় পায়, এই ছোট্ট গ্রামখানিকেই কেন্দ্র করে ওরা বেঁচে থাকে। প্রত্যেকের নাড়ির সঙ্গে প্রত্যেকের নাড়ির যোগ আছে, তাই একই স্পন্দন সবাই অনুভব করে, তাই কেউ কাউকে ছেড়ে দূরে যাওয়ার কল্পনাও করতে পারে না।"

বিকাশ মুখ মুচকাইয়া হাসিল, বলিল, "আদর্শ গ্রাম কি একেই বলতে চান? শুনেছি অনেককাল আগে লোকেরা এমন মূর্খ বা জ্ঞানহীন ছিল, কেউ যদি বলতো পৃথিবী চব্বিশঘন্টা ঘুরছে, সূর্য্য একভাবেই দাঁড়িয়ে আছে, তাকে পাগল বলতো, এমন কি হাত পা বেঁধে পাগলা গারদে ফেলে রাখতো।"

নিমাই উত্তর দিল, "কেবল অধম বাংলাদেশ আর এর বেচারী অধিবাসীদের লক্ষ্য করেই কথা বলবেন না বিকাশবাবু। ইতিহাসের পাতা উল্টে আপনিও দেখতে পেয়েছেন বোধ হয়—সূর্য্য দাঁড়িয়ে আছে আর পৃথিবী ঘুরছে এই প্রমাণ করতে গিয়ে কত মহাপণ্ডিত লোককে কত বড় শাস্তি সইতে হয়েছে?. আপনার সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ইউরোপ সেদিনকার সেই অবিশ্বাসের যুগে অনেক পণ্ডিতকে শাস্তি দিয়ে নাম কিনে রেখেছে এ কথাতো উড়িয়ে দিতে পারবেন না।"

বিকাশ লাল হইয়া বলিল, "ইউরোপ আর এ দেশের কথা একেবারে আলাদা।"

আগের মতই ধীরকণ্ঠে নিমাই বলিল, "মোটেই নয়, আলাদা কে বলে? আপনি পূর্ব্বযুগের নজির খাড়া করেছেন বলেই আমায় বাধ্য হয়ে সেই যুগকে নিয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে, নচেৎ করতুম না। আপনি যে ইউরোপের শিক্ষা সভ্যতা নিয়ে আজ গর্ব্বিত হয়েছেন, ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখবেন, সেই অতীতযুগে ওই দেশ আর ওর অধিবাসীরা আমাদের দেশবাসীর চেয়েও অশিক্ষিত, বর্ব্বর, ভদ্রতার বালাই তাদের ছিল না। তখনকার দিনে গ্যালিলিয়ো, সক্রেটিস প্রভৃতি পণ্ডিতেরা যে লাঞ্ছনা সহ্য করেছিলেন, সে কথা মনে করুন। পাগল বলে তাঁদের কাউকে করেছিল বন্দী, কাউকে দিয়েছিল ভবনদীর ওপারে পাঠিয়ে,—এই তো আপনার সুসভ্য ইউরোপের সভ্যতা—শিক্ষা। নির্ব্বিবাদে সব দোষগুলো আমার হতভাগিনী দেশমাতৃকার মাথায় চাপাবেন না, মনে করুন সেই যুগে জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিল আপনারই এই দেশ, যে আজ আপনার কাছে ধিক্কারের পাত্রী হয়েছে।"

বিকাশ আত্মদমন করিতে পারে না, অসংযতকণ্ঠে বলিল, "আজ সেই অতীতের স্মৃতি নিয়ে গৌরব করে তারাই—যারা জ্ঞানহীন—যাদের ভবিষ্যৎ নেই, অতীতটাকেই তারা বার বার নাড়াচাড়া করে। প্রকৃত জ্ঞান যার আছে, সে অতীতের সে সব কথা আলোচনা করতে লজ্জা পায় যেহেতু—"

নিমাই বাধা দিল, "থামুন, ওতে আর হেতু টেতুগুলো যোগ দেবেন না বিকাশবাবু, হেতু না বলতেই আমি কারণ বুঝেছি। আমাদের দোষ আমরা সগৌরবে স্বীকার করে নিচ্ছি—কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ তৈরী হয় ওই অতীতেরই আওতায় কিনা, তাই ওই অতীতকে নিয়েই আমরা করি অহঙ্কার। আমাদেরই দেশের একজন বিখ্যাত লেখক বলে গেছেন—যে গোবর্দ্ধনগিরি হয়েছিল, রাজা কংশকে বধ করেছিল, তারই বুকে

লাথি মেরেছিল এই দেশেরই ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ এটা হলো ব্রাহ্মণত্বের মহা অহঙ্কার। আজ সেই ব্রাহ্মণের বংশে জন্মে কেবলমাত্র পৈতের জোরে ব্রাহ্মণ অনেক কিছু পাওয়ার দাবি করে। আমি আপনার মত অত স্পষ্ট না বুঝলেও একটু একটু বুঝতে বোধহয় পারি বিকাশবাবু, একেবারে আমায় পাঁকে বসাবেন না।"

বলিতে বলিতে সে কণ্ঠস্বর খাদে নামাইয়া অনুনয়ের স্বরে বলিল, "দোহাই আপনাদের, অমন শক্ত আঘাত দিয়ে আমাদের সে আনন্দ হতে বঞ্চিত করবেন না—যে আনন্দ আমাদের কোনকালে কি কি ছিল—মনে করে পাই, দশজনের সঙ্গে একটু আলোচনা করে পাই—।"

বিকাশ মুখ ফিরাইল, নিমাইয়ের সহিত কথা বলিবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না ; চলিয়া যাইবার জন্য দুই পা অগ্রসর হইয়া সে ডাকিল, "এসো মিল।"

মিল—

প্রসন্ন স্মিত হাসিতে নিমাইয়ের মুখখানা ভরিয়া উঠিল, সে তাহার চকিত দৃষ্টি একবার মিলির মুখের উপর বুলাইয়া লইল ; সে দৃষ্টির সামনে মিলি হঠাৎ যেন কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

নিমাই সকৌতুকে বলিল, "বেশ তো চলুন না, আমিও তো ওইদিকেই যাচ্ছি।"

বিকাশ নিঃশব্দে রহিল ;—এই অপ্রিয়ভাষী লোকটার সঙ্গে পথ চলিতে বিকাশের মন চাহিতেছিল না, কোনোক্রমে এড়াইবার চেষ্টা করিল, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বেশ তো, কিন্তু আমরা এখন ওদিকে যাব না, আরও কি কি আছে, সেগুলো দেখে তারপরে ফিরব।"

মুখের কথা লুফিয়া লইয়া পরম উৎসাহে নিমাই বলিল, "চমৎকার। দেখছি আপনার শুভমতি হয়েছে এই কয়দিন মাত্র গাঁয়ের আবহাওয়ায়

এসে। ঠাকুর দেবতা এখানে যথেষ্ট আছে; আমাদের নৃসিংহবাহিনী, নৃসিংহদেব—এসব ভারি জাগ্রত ঠাকুর, ভক্তিভরে যদি প্রার্থনা করা যায় এঁরা মনের সব আশা পূর্ণ করে থাকেন।"

বিকৃতমুখে বিকাশ বলিল, "আপনাকে আমি বুঝাতে চাই, আপনাদের ওই সব ঠাকুর দেবতাকে আমি মোটেই বিশ্বাস করিনে, কাজেই আমার প্রার্থনারও দরকার নেই।"

বিস্ফারিত চোখে নিমাই বলিল, "সর্ব্বনাশ, ঠাকুর দেবতা বিশ্বাস করেন না, তাহলে পাপপুণ্য, স্বর্গ নরক—"

বিকাশ সবেগে মাথা নাড়িল, "সব গাঁজাখুরি; আমি ও সব মানি নে।"

নিমাই যেন হতাশ হইয়া বলিল, "কালাপাহাড় দি সেকেণ্ড। অবিশ্যি ফার্ষ্ট প্লেস আপনারই নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু আপনার অনেককাল আগে কালাপাহাড় জন্মে সব নষ্ট করে দিয়েছেন। যাক, সেকেণ্ড প্লেস নিন, তাতেও অনেকের কাছে নামটা করা যাবে, কারণ কালাপাহাড় জন্মেছিল কোন সেই অতীত যুগে, আর আপনি এসেছেন একেবারে বর্ত্তমানের বুকে পা ফেলে—কি বলুন মহামায়া দেবী। ভারি দুঃখ অনুভব করছি যে আমাকে আপনারা গাইড হিসাবে আপনাদের সঙ্গে নিলেন না বিকাশবাবু, তাহলে কেবল দেখানই নয়—সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটির নিখুঁত পরিচয় আপনাকে দিতে পারতুম কারণ এ গ্রামের প্রত্যেক বস্তুটির ইতিহাস আমি যত জানি, মহামায়া দেবী তা জানেন না। আচ্ছা, আসি তাহলে নমস্কার—"

লাঠিটা বগলে লইয়া হাত দুইখানা দুইবার কপালে ঠেকাইয়া সে দুজনকে নমস্কার করিল, তারপর হাতে লাঠি লইয়া তিন লম্ফে উধাও হইয়া গেল, আর তাহাকে দেখা গেল না।

অপমান,—নিদারুণ অপমান।

বিকাশের মুখখানা অসম্ভব রকম লাল হইয়া উঠিয়াছিল, আর মিলির মুখখানা অসম্ভব সাদা দেখাইতেছিল।

(২৪)

চলিয়া যাইবার জন্য বিকাশ প্রস্তুত হইল।

এবার ট্যাক্সি আনিতে হইল না, নিমাইকে তাহার সহিত বহরমপুর যাইতে হইল না, বাসে যাইবে বলিয়া সে প্রস্তুত হইল।

পথের ধারে চলন্ত বাস থামাইয়া বিকাশকে তাহাতে উঠাইয়া দিতে দিতে নিমাই জিজ্ঞাসা করিল, "আবার আসবেন তো বিকাশবাবু?"

"আবার—"

যে রাগ বিকাশ এ কয়দিন মনের গোপনতলে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, অকস্মাৎ অগ্ন্যুদ্গমের মত তাহা ফাটিয়া পড়িল—

"আবার আসব আপনাদের এই গাঁয়ে, সেই কথা আবার জিজ্ঞাসা করছেন, স্পর্দ্ধাওতো বড় কম নয়। অনেক ছোটলোক দেখেছি—তারা ছোট বংশেই জন্মে থাকে, লেখাপড়ার ধার তারা ধারে না বলেই তাদের সকল দোষ ক্ষমা করা চলে, কিন্তু ভদ্রবংশে জন্মে লেখাপড়া শিখে মানুষ যে এমন অভদ্র ছোটলোক হয় তা জানলুম আপনাদের এই দেশে এসে। যাবেন একবার কলকাতায়—আমাদের ওখানে ভদ্রতা কাকে বলে শিখে আসবেন। দুপাতা পড়লে বা কোনো রকমে ঘুস দিয়ে ডিগ্রীটা যোগাড় করলেই যদি হতো তা হলে—"

ক্রোধে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

অত্যন্ত বিস্ময়ের সুরে নিমাই বলিল, "ঘুস দিয়ে ডিগ্রী নেওয়া যায় নাকি—তা তো জানতুম না। আপনি এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে আছেন, এ সব বিষয় আপনার যতটা জানা আছে, আমরা তা কি করে জানব

বলুন ? আমি কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আর যাঁরা শিক্ষকতা কাজে লেগে আছেন তাঁদের সম্বন্ধে মস্ত উঁচু ধারণাই করতুম। যাক, ভাগ্যে আপনি বললেন তাই নিজের ভুলটা বুঝতে পারলুম। এই ড্রাইভার—রোখো—রোখো—"

বাসচালক গাড়ীর গতি হ্রাস করিতেই নিমাই এক লাফে উঠিয়া পড়িল। বিকাশের পাশে যে খালি সিটটা পড়িয়াছিল, তাহাতে বসিতে বসিতে সহাস্য মুখে বলিল, "যাই হোক, চমৎকার লাগলো—আপনার মুখের নির্জ্জলা সত্যি কথাগুলো—এমন স্পষ্টভাবে বলবার সাহস এ পর্য্যন্ত কারও হয়নি, ভীরু কাপুরুষের মত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তারা কথা বলে। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, আপনি সাহসী বটে, দেখতে রোগা হলেও সত্য কথা স্পষ্টভাবে বলার সাহস আপনার আছে। ঠিক এই জন্যেই উঠে পড়লুম বিকাশবাবু, আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেশ খানিক দূর যাওয়া যাবে এখন।"

বিকাশের মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছিল, সে একটু নড়িয়া চড়িয়া সরিয়া বসিল।

নিমাই বলিল, "চুপ করে গেলেন যে, কথা বলুন।"

বিকাশ গম্ভীরমুখে বলিল, "আপনার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা আমার এখন নেই।"

নিমাই বলিল, "কিন্তু ছোটলোক, অভদ্র এতগুলো কথা যে আমাদের গাঁয়ের লোককে বলে গেলেন—আমি কৈফিয়ৎ চাইলে দেবেন না ?"

বিকাশ মাথা নাড়িল, "দিতে বাধ্য নই।"

নিমাই একটু হাসিল, বলিল, "কিন্তু আমাদের যা না তাই বলে যাওয়ার অধিকারও আপনার নেই। আজই হঠাৎ পথে চলতে অতর্কিতে আপনার কথা কানে এলো—আপনি আমাদের চোর ডাকাত যা না তাই

বলেছেন। আমাদের অসভ্য ছোটলোক বলেছেন, ভদ্রতা শিখাবার জন্যে কলকাতায় নিমন্ত্রণও করেছেন। আমরা হয়তো আপনাদের তুলনায় ছোটলোক, কিন্তু আপনাদের কলকাতার সভ্যতার চেয়ে অনেক বেশী ভদ্রতা জ্ঞান আমাদের আছে—সেটা আপনি বিবেচনা না করতে পারেন—আর যে কেউ করবে। আপনার কদর্য্য উক্তি যে আমাকেই লক্ষ্য করে, সেটা আমার বুঝতে বাকি নেই বিকাশবাবু। একটা কথা শুনে রাখুন, বাংলায় কয়টা বছর এসে থাকলেও আসলে আমি পাঞ্জাবী; ওখানে জন্মেছি আর ওখানকার জল হাওয়াতেই আমি মানুষ হয়েছি। আমার বাপ মায়ের স্বাস্থ্যও আপনার বাপ মায়ের মত ক্ষণভঙ্গুর ছিল না, সে জন্যে আমি বিশেষ করে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আপনাদের মত একপা চলতে হাঁপিয়ে পড়িনে, প্রচুর খেয়েও হজম করতে পারি।”

বিকাশ তাহার পানে চাহিল না, পাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিমাই ডাকিল—“ও মশাই—শুনছেন—?”

বিকাশ তাহার পানে তাকাইল।

নিমাই কোমলকণ্ঠে বলিল, “আসল কথা—প্রচুর খান যাতে গায়ে জোর হবে, লোকে চেহারাখানার পানে তাকিয়ে দেখবে। চামচ মেপে ভিটামিন খেয়ে এই চেহারা হয়েছে, একটা ফুঁ দিলে উড়ে যান, আমাদের ওসব বরদাস্ত হয় না। আমরা খাই মোটা লাল চালের ভাত, শাক সবজি, পুকুরের টাটকা মাছ আর প্রচুর ঘি দুধ,—আপনাদের মত না খেয়ে পাকস্থলী শুকিয়ে যায় নি। সোজা কথায় বলি—কলকাতায় ফিরে গিয়ে খানিকটা করে হাঁটবেন, আর প্রচুর খেয়ে যাবেন, ব্যায়াম করবেন, দেখবেন—খাঁটি আফগানি চেহারা হবে, লোকে দেখে হিংসা করবে?”

সে উঠিল, বলিল, “আপনাকে অনেক ত্যক্ত করলুম, এবার আসি; কিছু মনে করবেন না, গেঁয়ো চাষা বলে ক্ষমা করে যাবেন।”

একটা নমস্কার করিয়া বাস থামাইয়া সে নামিয়া গেল—বিকাশ মুখ বাড়াইয়া দেখিল নিমাই হন হন করিয়া চলিয়াছে।

কাছারি বাড়ী ফিরিয়া নিমাই দেখিল শম্ভুনাথ হাতে লাঠি ও সঙ্গে তারণকে লইয়া বাহির হইতেছেন, তাহার মুখে ব্যস্ততার ভাব।

নিমাইকে দেখিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "শুনেছো নিমাই, বউমা নাকি ফিরেছে।"

"বউমা—"

নিমাই যেন আকাশ হইতে পড়ে—"বউমা কে?"

শম্ভুনাথ আশ্চর্য্যভাবে তাহার পানে খানিক তাকাইয়া রহিলেন, তারপর বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, "তুমিও যে তেমনি লোক হে, একেবারে গাছ হতে পড়লে—যেন এ নামই তুমি কোনোদিন শোন নি। বউমা আবার কে,—বউমাকে তুমি চেনো না? এই যে কিছুদিন আগে বউমা তার মেয়েকে নিয়ে কোথায় চলে গেছে, তুমিই আগে আমায় সে খবর দিয়েছিলে না?"

পুঁটুর মা—

শম্ভুনাথকে আর বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না, নিমাই বুঝিয়াছে, চিনিয়াছে। কিন্তু পুঁটুর মা,—সে একদিন যেমন গিয়াছিল তেমনই হঠাৎ ফিরিয়াছে, ইহাও কি সম্ভব?

শম্ভুনাথ বলিতেছিলেন, "এইমাত্র তারণ এসে আমায় খবর দিলে, সে সকাল বেলায় ওদিকে গিয়েছিল, হঠাৎ বারাণ্ডায় পুঁটুর মত একটী মেয়েকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে যায়। পুঁটুর মা বার হয়ে এসে ওর সঙ্গে দুএকটা কথাও বলেছে।"

মহোৎসাহে তারণ বলিল, "আমি তো আগে চিনতেই পারিনি। আর কি সে ছিরি আছে বাবু—সে রং পর্য্যন্ত নেই, মুখে সে হাসি পর্য্যন্ত

নেই। মা লক্ষ্মীকে দেখলেই মনে হয়—এই কয়টা মাস না জানি কি সাংঘাতিক ব্যারামেই ভুগে এসেছে। অমন যে গোলাপ ফুলের মত রং—ময়লা হয়ে গেছে, চোখের নীচে কালি পড়েছে, গালের হাড় এতখানি করে উঁচু হয়েছে।”

একটু থামিয়া সে বলিল, “কথা কি বলতে পারলে—? একটা কথা বলতে গিয়ে কেঁদে উঠে ছুটে ঘরের ভেতর চলে গেল, আর বার হতেই পারলে না?”

নিমাইয়ের মুখখানা শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, শম্ভুনাথের পানে তাকাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল “আপনি এত তাড়াতাড়ি ভাবে যাচ্ছেন কোথায়?”

শম্ভুনাথ যেন থতমত খাইয়া গেলেন, নিমাই যে এমন শক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিবে তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। একটু থামিয়া লাঠিটা এ হাত হইতে অন্য হাতে লইয়া বলিলেন, “বউমা যে এলো, তাকে একটিবার দেখে আসা উচিত নয় কি?”

নিমাই মাথা নাড়িল, “মোটেই উচিত নয়।”

শম্ভুনাথ হঠাৎ গরম হইয়া উঠিলেন, চোখ পাকাইয়া বলিলেন, “কেন উচিত নয় শুনি—?”

নিমাই বলিল, “এতদিন যে মেয়েছেলে কোথায় কাটিয়ে এলো, তার সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ না নিয়েই আপনি যাবেন তাদের বাড়ীতে?”

শম্ভুনাথ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “কোথায় আবার গিয়েছিল? গিয়েছিল নিশ্চয়ই তার কোনো আত্মীয়ের কাছে, পথে তো যায় নি। এখানকার লোকেরা আদাজল খেয়ে যে রকমভাবে তার পেছনে লেগেছিল, তাতে করে তার এখান হতে চলে যাওয়াই উচিত হয়েছিল নিমাই। তুমি যে কিছু জানো না তা নয়, তোমাকে নিয়েও তো দেশে বড় কম কথা উঠে নি—তাও তোমার অজানা নেই।”

অসহিষ্ণুভাবে নিমাই বলিল, "আপনি পুঁটুর মায়ের বেশী গুণ ব্যাখ্যা আর নাই বা করলেন চৌধুরী মশাই। আমাকে যে যাই বলুক আমি তাতে এতটুকু ভয় পায়নি, কারণ আমি জানতুম মিথ্যে কথা আর সেঁচা জল এদের স্থায়ীত্ব একই সমান।"

সে আরও বলিত কিন্তু শম্ভুনাথ বাধা দিলেন, একখানা হাত তুলিয়া বলিলেন, "আঃ, থামো নিমাই, তুমি একবার মুখ খুললে আর থামবে না তা আমি জানি। বাজে বকতে তুমি যেমন পারো, এমন আর কয়জন পারে তা জানিনে বাপু। তোমার ততখানি সাহস থাকতে পারে কারণ তুমি পুরুষ,—যত যাই কর না কেন—তোমার কলঙ্ক ধুয়ে যেতে বেশীক্ষণ লাগবে না, কিন্তু তার পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব। যদিই তার কোনো আত্মীয়ের বাড়ী দু দিনের জন্যে গিয়ে থাকে—তাই বলে আর সে তার স্বামীর ভিটেয় ফিরবে না, তোমরা তাকে নেবে না—ঘৃণা করে সরিয়ে দেবে—এ যে অন্যায় বিচার। আমাকেও তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে দেবে না—এও যে অন্যায় আবদার।"

নিমাইয়ের মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল, মুহূর্ত্তকাল সে নীরব হইয়া রহিল, তারপর বলিল, "অন্যায় বিচার বা আপনার কাছে অন্যায় আবদার নয় চৌধুরী মশাই, এ অতি ন্যায়সঙ্গত কথা। আমি বেশ জানি, পুঁটুর মার তিন কুলে কেউ নেই, তবু সে কোথায় গিয়ে এ কয়মাস কাটিয়ে এলো, সে খোঁজটাও নেওয়া দরকার নয় মনে করেন কি?"

শম্ভুনাথ রাগতভাবে বলিলেন, "গাঁয়ের লোকের চেয়ে তুমিও বড় কম যাও না নিমাই, বরং দু ডিগ্রী ওপরে তোমার টেম্পারেচার চড়ে। অনাথা বিধবা, একটী ছোট্ট মেয়েকে অবলম্বন করে বেঁচে আছে, তার স্বামীর ভিটেয় বাস করছে; আমি তাকে আট টাকা করে' মাসিক সাহায্য করছি, এটা দেখে গাঁয়ের লোকের যেমন চোখ টাটায়, তোমারও তার

চেয়ে বড় কম টাটায় না দেখছি। তোমার আর আমাদের মহামায়ার দুজনেরই একসমান কথা। বাড়ীর আশে পাশে এত জায়গা জমি পড়ে আছে, মহামায়া জিদ ধরেছে ওই বিধবার স্বামীর ভিটে ভেঙ্গে সমতল করে ওই জায়গায় সে গোলাপ ফুলের গাছ লাগাবে, ওতে নাকি খুব বড় গোলাপ ফুটবে। শোন একবার আবদারখানা,—আকাশের চাঁদ ধরা গল্পেই শুনেছি—চোখে দেখিনি, আমাদের মহামায়ার চাঁদ ধরা চোখে দেখছি। আচ্ছা, ওই যে একটা লোকের পিতৃপুরুষের ভিটে, তার অনাথা স্ত্রীকন্যাকে ও যে তাড়িয়ে দিয়ে ফুলগাছ লাগাবে, সে ফুল কি ওদের বুকের রক্তে রাঙা হয়ে ফুটবে না, সে ফুল দেখে ও মেয়ের বুকে কি আঘাত লাগবে না?"

তিনি একটা দম লইলেন, বলিলেন, "এ পাপ মানুষে সইলেও ধর্ম্মে কখনও সইবে? তোমরা আজকালকার ছেলেমেয়ে, বেশী লেখাপড়া শিখেছো, তোমরা ধর্ম্ম না মানলেও আমরা মানি বাপু। আমরা জানি—গরীবের পরে অত্যাচার অবাধে করতে পারা যায়, মানুষকে যা তা বলে ফাঁকি দেওয়া চলে, কিন্তু সেই যে একজন অলক্ষ্যে বসে তাকিয়ে আছেন, তাঁর চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। কী বলিস তারণ, তাই-ই বল—ফুল তো দেবতার পূজোর জন্যেই ফোটে,—কিন্তু ওই ফুল কোনোদিন দেবতার পায়ে দেওয়া চলবে?"

তারণ নিমাইয়ের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া আস্তে আস্তে মাথা নাড়িল, "—তাই কি হয় বাবু, ও ফুলে কখনও পূজা দেওয়া যায়? চক্কোত্তির আত্মা তার পিতৃপুরুষের সব আত্মা শাপমণ্যি দেবে কি বড় কম? জ্যান্ত মানুষের শাপমণ্যি উড়িয়ে দেওয়া চলে কিন্তু মরা মানুষের শাপমণ্যি—বাবা—"

নিমাই রুক্ষদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিবামাত্র সে আড়ষ্ট হইয়া গেল।

নিমাই শম্ভুনাথের পানে তাকাইয়া বলিল, "আপনার মহামায়া কী

বলেছেন না বলেছেন তা আপনিই জানেন চৌধুরী মশাই, তা নিয়ে কোনো কথা বলার দরকার আমার নেই, করলেও সেটা একেবারে অনধিকার চর্চ্চা হবে। আমি শুধু একটা কথা বলছি—আপনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারবেন, আপনার বউমা কোনো আত্মীয়ের বাড়ী যান নি, তিনি কলকাতায় ডক্টর ঘোষালের কাছে গিয়েছিলেন।"

"ডাক্তার ঘোষালের কাছে—অ্যাঁ, তুমি বলছো কি নিমাই—"

শম্ভুনাথ নিষ্পলকে মুহূর্ত্তকাল নিমাইয়ের পানে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নিমাই, তুমি স্বপ্ন দেখছো, নইলে কে আমাদের পুঁটুর মা আর কে ডাক্তার ঘোষাল, তাদের মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক পাতাচ্ছো? কোথায় ডাক্তার ঘোষাল—বিখ্যাত বড় ডাক্তার,—যার নাম করলে সবাই চিনবে, আর কোথায় আমাদের পুঁটুর মা, দুজনের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। তুমি কী যা তা বলছো নিমাই,—যা বলবে একটু বুঝে বলো।"

দৃঢ়কণ্ঠে নিমাই বলিল, "আমার মাথা খারাপ হয়নি চৌধুরী মশাই, আমি স্বপ্নও দেখছিনে বা মিথ্যে করে একটী অনাথা বিধবার নামে কলঙ্কও দিচ্ছিনে। আমি অনেক আগে হতেই সব জানি, আপনাকে কোনো কথা বলিনি, আপনি বার বার আমায় পুঁটুর মায়ের খোঁজ করতে আদেশ দিয়েছেন, আমি সেই জন্যেই খোঁজ করিনি। এখানে সে সব কথা বলব না, আপনি ঘরে আসুন, আমি সব বলছি।"

শম্ভুনাথকে ঘরে টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসাইয়া নিমাই তাঁহার সামনে বসিল; বলিল, "খোঁজ না করার জন্যে আপনি আমাকে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু আমি কোনো কথাতেই কান দেই নি। আমি জানতুম পুঁটুর মা আর কোনোদিনই ফিরবে না, তার গতজীবনের কলঙ্ককাহিনী এই কলঙ্কের মধ্যে হারিয়ে যাবে, আপনিও এই দারুণ কলঙ্কের একটা

কথা শুনবার দায় হতে মুক্তি পাবেন, কিন্তু ভবিতব্য অলঙ্ঘনীয় বলেই তা আর হয়ে উঠলো না।"

নিঃশব্দে শম্ভুনাথ বসিয়া রহিলেন, তামাক চাহিবার মত মনের অবস্থা তাঁহার তখন ছিল না।

নিমাই ডক্টর ঘোষালের পূর্ব্বজীবনী বিবৃত করিল, পুঁটুর মায়ের নাম এবং সত্যকার পরিচয় শুনাইয়া দিল, শেষকালে বলিল, "ডক্টর ঘোষাল বিন্দুমাত্র পরিচয় না নিয়েই যখন অতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে গরীব বিধবার মেয়ের চিকিৎসার ভার নিলেন, তার পথ্যের ভার নিলেন, তারপর বহরমপুর হতে এই গোকর্ণে নিজে এলেন, আমার তখনই কেমন যেন একটু সন্দেহ হয়েছিল চৌধুরী মশাই। ইচ্ছা না থাকলেও কৌতূহলই আমায় ইচ্ছুক করালে পুঁটুর মা এবং ডক্টর ঘোষালের পূর্ব্বজীবনী সংগ্রহ করার জন্যে। আমি জানতে পারলুম এই পুঁটুর মা ঢাকার বিখ্যাত মেয়ে মৃদুলা বোস, আমি শুনলুম তার মায়ের কলঙ্ক কাহিনী—"

হঠাৎ একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া শম্ভুনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

নিমাই জিজ্ঞাসা করিল, "যাচ্ছেন কোথায় ?"

গর্জ্জন করিয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "আমি জবাব চাই, কৈফিয়ৎ চাই ; এত সহজে এত বড় ব্যাপারকে যেতে দিতে পারব না।"

নিমাই প্রমাদ গণিল, বলিল, "কিসের কৈফিয়ৎ চান ?"

মুখ বিকৃত করিয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "কিসের কৈফিয়ৎ চাই তাও বুঝতে পারছো না ? এর জন্যে দোষ দেওয়া উচিত তোমায় নিমাই, তুমিই যত নষ্টের গোড়া। নিজে কিছুই জানো না, জাত নেই—সন্ধ্যাহ্নিক নেই, নিজে তো অধঃপাতে গেছোই, আমায় শুধু নষ্ট করলে।"

সর্পের মত তিনি ফুলিতে লাগিলেন,—

"আমি—?"

নিমাই আকাশ হইতে পড়িল।

শম্ভুনাথ জোর করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ তুমিই, আমি ব্রাহ্মণ, জীবনে কোনোদিন স্বজাত ছাড়া কারও হাতে খাইনি, স্বপাকে খেয়েছি তবু কারও সাহায্য নেইনি। তুমি জেনেছো—সে কায়স্থের মেয়ে, তার মা কুলত্যাগিনী। তবু জেনে শুনেও আমাকে বল নি।"

নিমাই বলিল, "আমি জানবার অনেক আগে হতে পুঁটুর মা আপনার কাজ করছিল।"

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "হুঁ, তোমার দোষ নেই। কিন্তু সে,—সে কায়স্থের মেয়ে, তার মা কুলত্যাগিনী, হয়তো তার জন্মও নিবিড় রহস্যে ঢাকা, সে সব কথা গোপন করে সে কেন আমার ধর্ম্ম নষ্ট করলে আমি সেই কৈফিয়ৎ চাই।"

সর্পের মত তিনি গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

নিমাই তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া বসাইল, বলিল, "এ নিয়ে আর কেলেঙ্কারী করতে যাবেন না চৌধুরী মশাই। আপনার আত্মীয়েরা হাসবে, চারিদিকে সকলেই হাসবে, টিটকারি দেবে, পারবেন সে সব সহ্য করতে? এ পর্য্যন্ত সকলে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, একা আপনিই তার পক্ষ নিয়ে তাকে সকল আপদবিপদ হতে রক্ষা করে এসেছেন, সেটা লোকে জোর গলায় বলতে ছাড়বে না। তারপর পুঁটুর মায়ের দিকটাও একবার ভাবুন, তার দিকেও একবার দেখুন। সাময়িক মোহে, লোভে বা আকর্ষণে পুঁটুর মা ডক্টর ঘোষালের কাছে গিয়েছিল,—মানুষ যে সব সময়ই দেবতা হয়ে থাকতে পারে তাতো নয় চৌধুরী মশাই, দেবতাদেরও কত সময় কত ভুলচুক হয়েছে শুনেছি, তরুণী বিধবা পুঁটুর মা—তারপরে সে দরিদ্র, আপনারই সাহায্যে সে কোনোরকমে বেঁচে আছে,—এ অবস্থায় প্রলোভন জয় করা হয়তো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, তাই সে

গিয়েছিল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে ফিরেছে, তার স্বামীর ঘরেই সে ফিরেছে, শাস্তিতে তাকে তার ওই তীর্থে থাকতে দিন, তার স্বামীর ভিটেয় প্রদীপ জ্বালতে দিন। আপনার ভয়ে যারা একদিন ওই মেয়েটীকে এড়িয়ে গেছে, আজ তারা বাঘের মতই লাফিয়ে পড়বে ওর পরে, তারপর ওর অবস্থা কী হবে সেটা একবার ভেবে দেখুন।"

বিকৃতমুখে শম্ভুনাথ বলিলেন, "ওর অবস্থা ভাববার দরকার আমার নেই বলেই জানি নিমাই; ও যেখানেই যাক আমার তাতে কি?"

শান্তকণ্ঠে নিমাই বলিল, "না, সে আর কোথাও যাবে না, যাওয়ার পথ হতে সে ফিরেছে, অনুতাপ না হলে সে সেই সুখৈশ্বর্য্যের মধ্য হতে ফিরে এই দারিদ্র্যকেই বরণ করতো না। না, আপনি তা পারেন না চৌধুরী মশাই, যে অনাথা মেয়েটী সব হারিয়েও একটা কুটো আশ্রয় করে বাঁচতে চায়, তার সেই কুটোটা কেড়ে নিয়ে আপনি তাকে ডুবিয়ে মারতে পারেন না। আপনি আমার সদাশয় মনিব, আপনাকে আমি দেবতার মত দেখি, আজও আপনি আমার সামনে দেবতার মতই প্রকাশ থাকুন চৌধুরী মশাই, মানুষ হয়েও আপনার কৃতকাজে আপনি যে মানুষের অনেক উপরে সে পরিচয় আপনি দিন। আমার চোখে আপনি অতি বড়, অতি মহৎ,—সে আদর্শকে আপনি ছোট করবেন না—আমি হাতযোড় করছি চৌধুরী মশাই।"

শম্ভুনাথ কী বলিবেন মনে করিয়া দৃপ্তনেত্রে নিমাইয়ের পানে তাকাইলেন, কিন্তু সে কথা-ই মনে হইল না। আস্তে আস্তে তাঁহার চোখের আগুন নিভিয়া আসিল। বৃদ্ধ আত্মহারাভাবে নিমাইয়ের সবল হাত দুখানা টানিয়া লইয়া নিজের মুখের উপর চাপা দিলেন, তাঁহার চোখের জলে নিমাইয়ের করতল ভিজিয়া উঠিল।

অবহেলিতা বিশ্বের ঘৃণিতা মৃদুলা—সে আবার ফিরিয়াছে।

একদিন গভীর রাত্রে ঘুমন্ত কন্যাকে জাগাইয়া সে তাহাকে লইয়া পথে নামিয়াছিল। কৃষ্ণা দশমীর রাত্রিতে চাঁদ সামনের রাতে জাগে নাই,—শেষ রাত্রের পাণ্ডুর চাঁদের আলো পথের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেই আলোয় পথ চিনিয়া মৃদুলা চলিয়াছিল। শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাস তাহার উষ্ণ মস্তিষ্কে, গাত্রে শীতল স্পর্শ দিয়াছিল। পুঁটু নিঃশব্দে মায়ের হাত ধরিয়া অজ্ঞাত মামার বাড়ী চলিয়াছিল।

পুঁটুর মা সে দিন গ্রাম হইতে বহুদূরে হাঁটিয়া গিয়া বাসে উঠিয়া খাগড়া ঘাট ষ্টেশনে পৌঁছাইয়াছিল, অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সে হাওড়ার টিকিট কিনিয়া কন্যাকে লইয়া সে ট্রেণে উঠিয়া একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল।

কি ভাবে, কেমন করিয়া সে হাওড়ায় পৌঁছাইয়াছিল ডক্টর ঘোষালের সঙ্গে কি ভাবে ভবানীপুরে তাহারই জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসায় পৌঁছাইয়াছিল, তাহা সে মনে করিতে পারে না।

সে যেন অভিভূত অবস্থা; মন্ত্রমুগ্ধ মানুষ যেমনভাবে কাজ করিয়া যায়, সেও তেমনই ভাবে চলিয়াছিল, ভালোমন্দ ভাবে নাই, ভবিষ্যতে কী হইবে তাহাও দেখে নাই।

মৃদুলা সে দিনের কথা ভুলিতে চায়, কিন্তু কেহ কি তাহা পারে? তাহার ভবিষ্যৎ চিরান্ধকার, এক কথায় সে বলিয়া দিতে পারে তাহার ভবিষ্যতে কী আছে; জ্বালাময় বর্ত্তমান ভুলিয়া সে দেখিতে চায় তাহার অতীতকে, কিন্তু সেখানেই বা কী সঞ্চিত আছে? মৃদুলা আবার ফিরিয়াছে।

সর্ব্বস্বহারা ভিখারিণী যেমন ভাবে ক্লান্ত পদে ফিরে তেমনই ভাবে সে ফিরিল। ফিরিল তাহারই সেই ত্যক্ত গৃহে, যে গৃহে আর কোনোদিনই ফিরিবেনা বলিয়া সে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল।

যেমন করিয়া সে গোকর্ণ ত্যাগ করিয়াছিল, তেমনই ভাবে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সে যখন হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল, সেই সময় তাহাকে ফিরাইয়া লইবার জন্য ডক্টর ঘোষাল আসিয়াছিল। বেদনাপূর্ণকণ্ঠে সে বার বার অনুনয় করিয়াছিল—"আর গোকর্ণে ফিরে যেয়ো না মৃদুল, কেন স্বেচ্ছায় আবার সেই দুঃখ ভোগ করতে যাচ্ছো? ফিরে চল আমার ঘরে, তুমি যা বলবে আমি তাই করবো, তোমার জীবনকে সুখময় করতে আমার যথাসর্ব্বস্ব দেব।"

মৃদুলা সে অনুনয়ে কর্ণপাতও করে নাই।

মণিময় আবার বলিয়াছিল, "যে ঘর ছেড়ে চলে এসেছো মৃদুল, সে ঘরে আর তোমার স্থান নেই, সে কথাটা যাওয়ার আগে একটি বার ভেবে দেখ। কলঙ্কে সে দেশ ছেয়ে গেছে, সেখানে তোমায় কেউ গ্রহণ করবে না, তোমাকে অনেক কষ্ট সইতে হবে।"

দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া মৃদুলা উত্তর দিয়াছিল, "হোক, তবু আমি ফিরব না। আমায় কেউ না ডাকুক, আমার স্বামীর ভিটে আছে, সে দরজা কেউ বন্ধ করতে পারবে না, আমি সেই ভিটেয় ফিরব। তুমি ফিরে যাও, মনে করো—মৃদুলা মরে গেছে।"

মণিময় ভয় দেখাইয়াছে, মৃদুলা হাতযোড় করিয়াছে।

ইহারই পরে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল, মৃদুলা নিশ্চিন্ত মনে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছিল।

বেচারা পুঁটু—

মায়ের পানে তাকাইয়া সে একটা কথাও বলিতে পারে নাই। খানিকক্ষণ বাদে তাকাইয়া দেখিয়াছিল, তাহার মা গাড়ীর জানালায় মাথা রাখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

পুঁটু কারণ জানে না। এ পর্য্যন্ত কোনো কারণই সে জানে নাই,

তাহার শিশুচিত্তে সব কিছুই আবছা থাকিয়া গিয়াছে। সে জানিয়াছে সে দেশে ফিরিতেছে—এই পর্য্যন্ত। মা কেন কলিকাতায় আসিল, কেনই বা দেশে ফিরিয়া চলিল তাহাও পুঁটু জানে না, জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয় নাই বলিয়াই সে জিজ্ঞাসা করে নাই।

সে যখন গ্রামে প্রবেশ করিতেছিল তখন কেহ কেহ তাহাকে দেখিয়াছে। রামা বাগদীর স্ত্রী কী একটা কথা জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল, মৃদুলার কানে সে কথা যায় নাই; পুঁটু একবার ফিরিয়া চাহিয়াছিল, সেও কোনো উত্তর দেয় নাই।

গৃহ, গৃহ, সুখময় সোনার গৃহ—

এই গৃহকে আকড়াইয়া আছে কত স্নেহ, কত মমতা, কত ভালোবাসা, কত পুরাতন দিনের স্মৃতি,—

মৃদুলা দূরে গিয়া থাকিতে পারে নাই, সর্ব্বস্ব হারাইয়া ভিখারিণী মৃদুলা আজ ফিরিল সেই সেদিনকার পরিত্যক্ত ঘরে।

মেঝের উপর সে লুটাইয়া পড়িল, নিঃশব্দে চোখের জলে ঘরের মাটি ভিজিয়া উঠিল, কত শতশত বিন্দু চোখের জল ঝরিয়া পড়িল কে জানে।

কিন্তু সে মৃদুলা মরিয়াছে, এ তাহার ছায়া মাত্র।

মাগো—

মৃদুলা কাঁদে—দুর্ভাগিনী পতিতা মা, তোমারই রক্তের উন্মাদনা জাগিয়াছিল তোমার কন্যার দেহে, প্রতি ধমনীতে, তোমারই ধ্বংসইচ্ছা জাগিয়াছিল তাহার মনে, প্রতি রক্ত কণিকায় জাগিয়াছিল দুর্নিবার লালসা, তাই মৃদুলা আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, সে পুড়িয়াছে, সে ছাই হইয়া গেছে। সেই ছাইয়ের বিবর্ণতা জাগিয়াছে তাহার গণ্ডে, ওষ্ঠে;—তাহার ললাটে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে; তাহার দৃষ্টিতে ফুটিয়াছে সব হারানোর ব্যথা।

হতভাগিনি নারি, তাহার অজস্র চোখের জলে কলঙ্ক আজ ধুইবে না, অনুতাপে তাহার গ্লানি দূর হইবে না।

পল্লীগ্রামের মেয়েরা একটা প্রবাদ বাক্য বলে—

মরবে মেয়ে, উড়বে ছাই,
তবে মেয়ের কলঙ্ক নাই।

মৃদুলা ভাবে—সে তো মরিয়াছে, দেহ কেন ছাই হইয়া যায় নাই।

তাহারই রক্তমাংসে, তাহারই বাসনা কামনায় গড়ানো মেয়ে তাহারই পথ ধরিবে না কি? রক্তের উন্মাদনা একদিন তাহার মধ্যেও জাগিবে,—বংশের ধারা যাইবে কোথায়।

হাতখানা ঘুমন্ত পুঁটুর গায়ে গিয়া পড়ে, মৃদুলা চমকাইয়া উঠিয়া হাত টানিয়া নেয়।

এই মেয়েটী আজও ছোট, আজও শিশু, সংসারের কিছু বুঝে না, কোনো পরিচয় সে পায় নাই, সে জলে ধোওয়া নির্ম্মল, নিষ্পাপ যূঁইফুল; আজও তাহার দলগুলি অমলিন—উজ্জ্বল।

একদিন সংসারের ঝড়ে ইহার শুভ্রদলে পড়িবে ধূলা, কলঙ্ক মলিন যূঁইফুলটি হতাদরে একদিন ঝরিয়া পড়িবে ধরণীর ধূলার উপরে, পথিক তাহাকে পায়ে দলিয়া যাইবে।

নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে সে, সে যে কোনদিন ফুটিয়া ছিল, সে কথা কেহই মনে করিবে না।

চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে, মেয়েটার গলা টিপিয়া মারিতে প্রবৃত্তি জাগে।

সে কি,—মৃদুলা কি পাগল হইয়া গেল?

মৃদুলা নিজের চুল ধরিয়া টানে, নিজের হাত নিজে কামড়াইয়া রক্তাক্ত করিয়া তোলে,—মৃদুলা হাঁপাইতে থাকে।

পুঁটুও যেন কেমনধারা হইয়া গেছে, মায়ের কাছে আসিতে সে ভয় পায়, মাকে সে এড়াইয়া চলে। মাকে সে মা বলিয়া কদাচিৎ ডাকে,— অনেক দূরে দূরে সে থাকে।

সে দিন সন্ধ্যার পরে—

ঘরের এককোনে টিপ টিপ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। সে আলোকে ঘরের ভিতরকার অন্ধকার দূর হইতে পারে নাই, বরং ভীষণতা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

পুঁটু বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে।

নিকটে বসিয়া আছে মৃদুলা,—একখানা হাত গালে রাখিয়া বসিয়া সে ভাবিতেছে। ভাবনা তাহার অনন্ত,—ভাবনা বর্ত্তমান লইয়া নয়, অতীত ও ভবিষ্যৎ লইয়া। দুর্জ্ঞেয় ও অনাগত ভবিষ্যৎ—অতীত চলিয়া গেছে।

রুদ্ধ দরজায় কে যেন করাঘাত করে, কাহার মৃদু কণ্ঠস্বর শুনা যায়— "পুঁটু—"

মৃদুলা চমকাইয়া উঠিয়া বিবর্ণ হইয়া যায়—।

কে আসিবে, কে ডাকিবে? সে বর্ত্তমানে বাঁচিয়া নাই, সে ভূতপূর্ব্ব, সে অতীত; ভবিষ্যৎ—নিদারুণ ভবিষ্যৎ, জ্বালাময় বর্ত্তমান—

মুহূর্ত্তের ভুলে কী নিদারুণ অধঃপতন, কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে সে; স্বর্গ হইতে নরকে হঠাৎ একদিন একক্ষণে সে ধুপ করিয়া পড়িয়া গেছে। এই ভুলের জের তাহাকে টানিয়া চলিতে হইতেছে, চলিতে হইবেও আজীবন।

দীর্ঘ জীবন, শাস্তি ভোগ করিতে হইবে বলিয়াই মাঝখানে ছেদ নাই। এই দীর্ঘকাল, বৎসর, মাস, প্রতিদিন এবং প্রতিটি মুহূর্ত্ত সে শুধু ভাবিবে— কী করিয়াছে সে, দেবতার উৎসর্গ ফুলকে পথের ধারের পঙ্কিল নর্দ্দমায় কেমন করিয়া সে ফেলিয়াছে?

নারী—দুর্ভাগা নারী, মুহূর্ত্তের পদস্খলনে সে গভীর পঙ্কে পড়িয়া যায়, উঠিবার কোনো উপায় থাকে না।

দেবতা—ওগো দেবতা—

মৃদুলা দুটি হাত যোড় করিয়া ললাটে রাখে—চোখে জল নাই, তাহার অন্তরে কে আগুন জ্বালিয়াছে, সে আগুনে চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছে। মৃদুলা আর্ত্ত হইয়া উঠে—বলে, কি প্রায়শ্চিত্ত করিবে সে? তুষের আগুন স্বেচ্ছায় সে বুকের মধ্যে জ্বালিয়াছে, সে আগুন নিভে না; অল্প অল্প জ্বলে, দীর্ঘকাল ধরিয়া পুড়িয়া পুড়িয়া সব কিছুই ভস্মে পরিণত করে। দেবতা, ওগো করুণাময় দেবতা, বল—তুমি বল সে কী করিবে, বল সে কী করিলে মুক্তি পাইবে।

দেবতার সাড়া মেলে না—

নিস্তব্ধতার মধ্যে বাহিরে আবার কে ডাকে—"পুঁটু—"

পুঁটু ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, "নিমাই দা এসেছেন মা, দরজা খুলে দেই।"

আর্ত্তকণ্ঠে মৃদুলা বলিয়া বসিল, "ওরে না না, দরজা খুলিস নে পুঁটু, আমি মুখ দেখাতে পারব না, আমি ওদের কাউকে সইতে পারব না।"

কিন্তু পুঁটু কথা শুনিল না, দ্রুতহস্তে দরজা খুলিয়া দিল।

দরজার সামনে দাঁড়াইয়া নিমাই। পিছনে তাহার অন্ধকার, ঘরের ভিতরকার প্রদীপের আলো তাহার সারা অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বারেক তাহার পানে তাকাইয়া মৃদুলা উপুড় হইয়া দুই বাহুর মধ্যে মুখখানা গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

কলঙ্কিনী—কলঙ্কিনী মৃদুলা। সে যে-মুখ লইয়া সেদিনেও নিমাইয়ের সামনে দাঁড়াইয়াছে, সে মুখ তাহার আজ কলঙ্ক কালিমা মাখা, সে মুখ নিমাইকে দেখাইতে সে লজ্জা পায়। সে আজ ধরিত্রীর বুকে আশ্রয় চায়,

মাটির বুকে মুখ রাখিয়া সে গুমরিয়া বলে—একদিন সতী সীতার দুঃখে বিচলিত হইয়া তাহাকে তুমি নিজের বক্ষে গ্রহণ করিয়াছিলে, আজ অসতী মৃদুলাকেও তোমার শীতল বক্ষে স্থান দাও, ঘৃণা করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিয়ো না।

নিমাই একবার ভূলুণ্ঠিতা নারীর পানে তাকাইল, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস সে রোধ করিতে পারিল না।

পুঁটু ডাকিল, "আসুন নিমাইদা—"

নিমাই মাথা নাড়িল, বলিল, "না, আমার কাজ আছে। তুমি একটু বাইরে এসো পুঁটু, এই টাকা কয়টা নাও।"

"টাকা—?"

মৃদুলা উঠিয়া বসিল, দীর্ঘ চুলগুলি খুলিয়া গিয়াছিল, দুইহাতে সেগুলি জড়াইয়া মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের টাকা—?"

নিমাই বলিল, "আমি কাজের জন্যে দিনের বেলায় আসতে পারি নি; চৌধুরী মশাই সকাল বেলা আমার কাছে আপনার খরচের টাকা দিয়ে রেখেছেন, সেই টাকা আমি দিতে এসেছি।"

"খরচের টাকা"—অদ্ভুত একটু হাসি মৃদুলার ওষ্ঠে ভাসিয়া উঠিল, সে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু আমি তো টাকা নেওয়ার উপযুক্ত পাত্রী নই, আমি—"

নিমাই দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আপনি নিজেকে উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত যাই মনে করুন, তিনি নিয়মিতভাবে আপনাকে প্রতিশ্রুত টাকা দিয়ে যাবেন, কারণ এ কেবল আপনার জন্যেই আপনাকে সাহায্য করা নয়, তাঁর মৃত কর্ম্মচারীর পরিবারকে সাহায্য মাত্র। দানের পাত্রাপাত্র বিচার করা চলে না তা জানেন তো?"

মৃদুলা মুখ ফিরাইল, তাহার অধরোষ্ঠ কাঁপিতেছিল, সে আর একটিও কথা বলিতে পারিল না।

নিমাই টাকা কয়টি পুঁটুর হাতে দিতে গেল, পুঁটু সরিয়া দাঁড়াইল।

অগত্যা দরজার উপর টাকা রাখিয়া নিমাই বলিল, "এই টাকা রইলো, তুলে নেবেন। পয়সার দরকার মানুষের সব সময়েই হয় এ কথাটা ভুলে যাবেন না, কাজেই আবার যেন ফেরত দিয়ে পাঠাবেন না। আর এখন হয়তো আপনি কারও সাহায্য পাবেন না, সেই জন্যেই বলছি কাল সকালে আমার বাড়ীর চাকর মধুকে এখানে পাঠিয়ে দেব, আপনার যা কিছু দরকার তাকে দিয়ে আনিয়ে নেবেন। নিজে যতদূরই কষ্ট সইতে পারেন, না খেয়েও মরতে পারেন, তা বলে ছোট মেয়েটাকে মারবেন না এ কথা বলে যাচ্ছি।"

সে নামিয়া যাইতেছিল, রুদ্ধকণ্ঠে মৃদুলা ডাকিল, "আমার একটা কথা আছে—"

নিমাই ফিরিল, জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে বলছেন?"

কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া আসিয়া মৃদুলা দরজার উপর আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আমি জানি এ টাকা চৌধুরী মশাই স্বেচ্ছায় দেন নি, এ টাকা আদায় করেছো তুমি; পাছে কেউ উপহাসের হাসি হাসে—তাই কারও হাতে দিয়ে পাঠাও নি, নিজে হাতে করে এনেছ। কাল মধুকে পাঠিয়ে বাজার হাট করাবার ব্যবস্থাও তুমি করেছো—কিন্তু—"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, সে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "চৌধুরী মশাইয়ের এমন কিছু মাথাব্যথা পড়েনি যার জন্যে আমি ফিরেছি শুনেই টাকা পাঠাবেন। যাই হোক, যে তরফ হতেই টাকা আসুক, আমি তো এটাকা নেওয়ার অধিকারিণী নই। ফাঁকি দিয়ে এতখানি বিশ্বাস রাখতে আমি পারব না,—না, কিছুতেই পারব না।"

নিমাই বলিল, "আমি আগেই বলেছি—দাতা পাত্রাপাত্র ভেদ করে দান করে না, দান করে তার আনন্দ হয়, মনে তৃপ্তি পায় বলেই দান করে। আপনি এটাকা নেওয়ার অধিকারিণী কিনা সে কথা যেদিন চৌধুরী মশাইয়ের সঙ্গে আপনার দেখা হবে সেদিন তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন। আমার সোজা বুদ্ধিতে আমি বুঝি—চৌধুরী মশাই তাঁর মৃত কর্ম্মচারীর বিধবা স্ত্রী আর মেয়েকে সাহায্য করে তাঁর কর্ত্তব্য পালন করেছেন, আমিও আমার মনিবের আদেশ পালন করতে টাকা এনে পৌছে দিয়েছি, এর মধ্যে লাভ লোকসান, ফাঁকি ইত্যাদি কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। আপনি যতদিন এখানে থাকবেন, তাঁর কর্ত্তব্য তিনি যথাযথ পালন করে যাবেন—এই কথাটাই আমাকে বার বার করে আপনাকে জানিয়ে দেওয়ার আদেশ তিনি দিয়েছেন।"

মৃত্নলার ঠোঁট দুখানা কাঁপিতেছিল, সে আস্তে আস্তে শ্বেতশুভ্র হাত দুখানা ললাটে রাখিল, মৃত্নকণ্ঠে বলিল, "তিনি দেবতা।"

নিমাই হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "দেবতা কিনা তা জানিনে, তবে তিনি মানুষের অনেক উপরে, সে হিসাবে তাঁকে মহামানব বলতে পারা যায়, এটুকু আমি বলতে পারি।"

আস্তে আস্তে সে বারাণ্ডা হইতে নামিয়া গেল, দূরে অন্ধকার যেখানে জমাট বাঁধিয়া আছে, চলিতে চলিতে সেই জমাট বাঁধা অন্ধকারের বুকে সে হারাইয়া গেল।

পথের উপর দুজন লোকের ছায়ামূর্ত্তি দেখা যাইতেছিল, তাহাদের অস্ফুট গুঞ্জন শব্দ মৃত্নলার কানে ভাসিয়া আসিল।

দরজা বন্ধ করিয়া সে পুঁটুর পানে ফিরিল, নিশ্চিন্তভাবে সে কাত হইয়া শুইয়াছে।

দয়ার পাত্রী মৃত্নলা—

দয়াভিক্ষা করিবার যে ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকে, মৃদুলার তাহা ছিল। সে দয়া চাহিয়াছে; মুখ নত করিয়াছে, ভিক্ষার সঙ্কোচের সঙ্গে দাবিও যেন তাহার ছিল। কিন্তু আজ?

ভিক্ষা চাহিবার, দান লইবারও অধিকার তাহার নাই। আজ তাহার চারিদিক ঘেরিয়াছে ত্বনিয়ার লজ্জা, ত্বনিয়ার সঙ্কোচ; মাথা তুলিয়া সমানভাবে চাহিবার অধিকার সে হারাইয়াছে।

এত দীনা, এত হীনা সে—

মৃদুলা চোখ মুদিল—।

(২৬)

মিলি শুনিল মৃদুলা ফিরিয়াছে।

তারণ কি কাজে তাড়াতাড়ি ভিতর বাড়ীতে আসিয়াছিল, জ্যেঠামণির ঘর হইতে বাহির হইবার সময় মিলির চোখ তাহার উপর পড়িল।— তারণের হাতে কাগজ জড়ানো কি, মিলি লক্ষ্য করিল পাশ দিয়া চকচকে সুন্দর শাড়ির পাড় দেখা যায়। উৎসুকভাবে মিলি বলিল, "ও গুলো কি—দেখি তারণ?"

সঙ্কুচিত হইয়া তারণ বাণ্ডিলটা মিলির প্রসারিত হাতের উপর রাখিয়া বিড়বিড় করিয়া কী বলিল বুঝা গেল না। বাণ্ডিলটা খুলিতেই মিলির চোখে পড়িল একজোড়া থান এবং একজোড়া রঙিন শাড়ি।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "এসব যাচ্ছে কোথায়?"

তারণ মাথা চুলকাইয়া বলিল, "পুঁটুকে দিতে যাচ্ছি।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মিলি বলিল, "মানে—?"

তারণ বলিল, "শাড়িটা পুঁটুর আর থান পুঁটুর মায়ের।"

বাণ্ডিলটা নামাইয়া রাখিয়া মিলি কেবল বলিল—"ও—"

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, "মাসে কত জোড়া করে কাপড় বিলানো হয় শুনি ?"

তারণ উজ্জ্বলমুখে বলিল, "তা অনেক মা লক্ষ্মি, গাঁয়ের কত অনাথ অনাথা যে আমাদের বাবুর কাছ হতে কাপড় পায়, খেতে পায় তার ঠিক নেই, সে সব নাম বলতে গেলে মস্ত বড়ো বই হয়ে যায়। বাবুর একখানা খাতা আছে মা, একদিন বরং সেখানা দেখো—যতলোক সাহায্য পায় সকলের নাম তাতে লেখা আছে। প্রতি মাসে দু টাকা, চার টাকা, আট টাকা করে সাহায্য তো আছেই, আর বছর বছর কত কাপড়ের গাঁটরি যে আসে তার ঠিক নেই। অথচ যারা পায় তারা আর নিমাইবাবু ছাড়া আর কেউ এ সব কথা জানে না; তুমি যে বাড়ীর মেয়ে—তুমিই এ কথা আজও শোন নি।"

মিলি বলিল, "দান করলেই পুণ্য হয় না তারণ, দানের পাত্র বিবেচনা করে তবে দান করা চাই, তাতে বরং গরীবের উপকার হয়, দানেরও সার্থকতা হয়। পুঁটুর মাদের সমস্ত কাপড়ই বোধ হয় এখান হতে দেওয়া হয় ?"

তারণ সগর্ব্বে বলিল, "নিশ্চয়—"।

মিলি জিজ্ঞাসা করিল, "কলকাতা হতে কাপড় আনায় কে, নিমাইবাবু বোধ হয় ?"

অত্যন্ত খুসিমুখে তারণ বলিল, "তা নয় তো কে ? অমন 'চারি চৌপাটে' লোক দেখা যায় না। ওই যে কথায় বলে—'যে দিকে জল পড়ে, সেই দিকে ছাতি ধরে—' আমাদের নিমাইবাবু ঠিক তাই। বাবু তো আপনভোলা লোক, কোনো কথাই মনে থাকে না, নিমাইবাবু আছেন তাই রক্ষে, নইলে কত লোক না খেতে পেয়ে মরে যেতো। এই তো সে দিনকার কথা, পুঁটুর মা ফিরে এসেছে জেনে আর তার

সব কথা শুনে বাবু তো রেগে আগুন, তখনই অপমান করে গাঁয়ের বার করে দিতে চাচ্ছিলেন, নিমাইবাবু কত করে বুঝিয়ে তাঁকে ঠাণ্ডা করলেন, আবার পুঁটুর মায়ের পাওনা খরচ কাপড় চোপড় দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন, তা দেখে আমিই অবাক হয়ে গেলুম— ।”

“অবাক—”

মিলি হাসিতে গেল, হাসি ফুটিল না, কেবল তাহার মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল।

বলিল, “আমার জ্যেঠামণিকে নেহাৎ ভালো মানুষ পেয়ে তোমাদের নিমাইবাবু ওঁকে খেলাচ্ছেন ভালো; যা খুশি তাই করিয়ে নিচ্ছেন। আজ যদি সমস্ত জমিদারিটাও ওঁকে লেখাপড়া করে দিতে বলেন, জ্যেঠামণি তাও দেবেন। জ্যেঠামণি যদি শক্ত লোক হতেন ব্যাপারটা বুঝতে দেরী হতো না তারণ। কে পুঁটুর মা—যে তার জন্যে আবার মাসিক সাহায্য নেওয়া হয়েছে, তার জন্যে এই দামী কাপড় আনা হয়েছে? একটা পতিতা মেয়ে—যে সব ছেড়ে চলে গিয়েছিল, আবার কী মনে করে ফিরেছে, তার জন্যে নিমাইবাবুরই বা এত মাথা ব্যথা কেন— ?”

আশ্চর্য্য—মিলির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে, সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরায়।

তারণ বিস্মিত হইয়া মিলির পানে তাকাইয়া রহিল। পায়ের কাছে পতিত কাপড়ের বাণ্ডিলটা পা দিয়া দূরে ঠেলিয়া দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে মিলি বলিল, “ভালোমানুষ জ্যেঠামণিকে পেয়ে ওঁর মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা হচ্ছে —আমি তা কিছু বুঝি নে?”

তারণ আস্তে আস্তে কাপড়ের বাণ্ডিলটা কুড়াইয়া লইল—আস্তে আস্তে বলিল, “কিন্তু এর জন্যে নিমাইবাবুকে দোষ দেওয়া চলে না মা

লক্ষ্মি। পুঁটুর মাকে এই সাহায্য না করলে তার কি উপায় হবে, খাবে কী—দাঁড়াবে কোথায় সেটা একবার ভাবো? এরপরে পেটের দায়ে কত অকাজ করবে, মেয়েটা পর্য্যন্ত অধঃপাতে যাবে—সেই সব ভেবেই নিমাইবাবু সাহায্য করছেন। এরপর রাষ্ট্রও হয়ে পড়বে—আমাদের বাবু—যিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ, কারও হাতে খান না, পুঁটুর মা কায়স্থের মেয়ে হয়ে তাঁকে রেঁধে পর্য্যন্ত দিয়েছে। সেটা বড় কম কেলেঙ্কারী হবে না মা, সমাজ একঘরে তো করবেই, তা ছাড়া জ্ঞাতি কুটুম্বেরা হাসবে, বাবুর এক গালে চুন এক গালে কালি দেবে। পাছে পুঁটুর মাকে উপলক্ষ্য করেই এ সব কেলেঙ্কারী বার হয় তাই নিমাইবাবু—"

বাধা দিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে মিলি বলিল, "তাই নিমাইবাবু জ্যেঠামণিকে সেই কেলেঙ্কারীর ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে ওই পতিতাকে ঘুস দিচ্ছেন—তাই এই দামী কাপড় দেওয়া হচ্ছে। ও সব কথা ছেড়ে দাও তারণ, তোমার বাবুকে তোমরা যা তা বলে বুঝাতে পারো, তাই বলে আমার চোখে ধূলো দেওয়া অত সহজে চলবে না। অজ্ঞাতে একটা ভুল মানুষ করতে পারে, সেই ভুলটাকে ঢাকতে জন্মভোর জেনে শুনে ভুল করে যাওয়া কোনও জ্ঞানী মানুষের উপযুক্ত কাজ নয়, বরং সে ভুলকে স্বীকার করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

তারণ আর কথা বাড়াইল না, সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের মতই কাপড়ের বাণ্ডিল তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

মিলি ফিরিয়া আসিল নিজের ঘরে, তখনই জ্যেঠামণির কাছে যাইবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না।

সামনে পরীক্ষা আসিয়াছে, আজ কয়দিন মিলি ভালো করিয়া পড়া করিতে পারে নাই, পুঁটুর মা ফিরিয়াছে শুনিয়া পর্য্যন্ত তাহার সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে।

কাল জ্যেঠামণি তাহাকে পরীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কবে পরীক্ষা হইবে,—বৈশাখের আগেই শেষ হইয়া যাইবে কিনা ইত্যাদি—।

তারণের মুখে কাল মিলি আভাস পাইয়াছে জ্যেঠামণি নিমাইয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা প্রায় ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন, পরীক্ষা হইয়া গেলে বৈশাখ মাসে বিবাহটা দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে চান।

মিলি সবেগে মাথা নাড়িয়াছিল—সে চিরকুমারী হইয়া থাকিবে, নিমাইকে সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না।

কথাটা স্পষ্টভাবে না বলিয়া সে প্রকারান্তরে জ্যেঠামণিকে জানাইল —পরীক্ষা দিয়েই আমি মাস দুইয়েকের মত এলাহাবাদ যাব জ্যেঠামণি, শরীরটা ভারি খারাপ হয়েছে, মাস দুই কোথাও বেড়িয়ে এলে শরীরটা ভালো হবে।"

খুব খুশি হইয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "বেশ বেশ, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। বৈশাখ মাসের প্রথমেই বিয়ের দিন আছে, ভশ্চাযমশাই দেখে বলেছেন। বিয়ের পরই তুমি নিমাইয়ের সঙ্গে এলাহাবাদে গিয়ে দু তিন মাস কাটিয়ে এসো; সে কয়টা দিন আমি না হয় কষ্টে স্পষ্টে যেমন করে হোক কাজকর্ম্ম দেখা শোনা করব—তাতে আর কি?"

তারপরই হাসিয়া বলিলেন, "না হয় একটু খারাপই হবে, তোমরা এসে তোমাদের জিনিস নিয়ে আমায় ছুটি করে দিয়ো, তখন আমি আবার বার হব। তোমাদের মত দেশভ্রমণে নয়, তীর্থভ্রমণে যাব, সঙ্গে যাবে আমার তারণ চন্দর। তোমাদের ঘরসংসার তোমরা দেখো মা, আমার তখন—"

মিলি বাধা দিল, আরক্তমুখে বলিল, "বিয়ে এখন আমি করব না জ্যেঠামণি, যখন বিয়ের সময় হবে আপনাকে তখন জানাব, আপনি

তখন বিয়ের বন্দোবস্ত করবেন—পাকা কথাও সেই সময় দেবেন—এখন নয়।"

শম্ভুনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।

আজকালকার দিনের শিক্ষিতা মেয়েদের সম্বন্ধে তিনি যা দুই একটা কথা শুনিতে পান তাহা কোনোদিনই বিশ্বাস করেন নাই, আজ যেন তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। মেয়েরা যে নিজেদের বিবাহ সম্বন্ধে এমন স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করিতে পারে, এ যেন তাঁহার ধারণারও অতীত। পরম বিস্মিত চোখে তিনি খানিকক্ষণ মিলির পানে নিষ্পলকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর শক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার মানে?" এই কঠিন কণ্ঠস্বর মিলি চেনে, তাই সে উত্তর দিল না।

শম্ভুনাথ গম্ভীরমুখে কয়েকবার তামাক টানিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন, "একটা কথা বলি মহামায়া, কেবল তুমি মনে কষ্ট পাবে বলেই আমি তোমায় আবার পড়তে দিয়েছি, তোমার পড়া বন্ধ করি নি। ঠিক এই রকমটি ঘটবে বলেই আমি তোমায় কলকাতা হতে এনেছি, তোমায় গ্রামের ধাঁজে তৈরী করতে চেয়েছি। তুমি যাই কর মহামায়া, বি, এ. ডিগ্রী পেলেও মনে রেখো তুমি মেয়ে, তোমায় অতখানি স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই। আমি চাইনে আমার ছোট ভাই আদিনাথের মেয়ে আমার মুখের সামনে তার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করে; তার শিক্ষার পরিচয় দেয়।"

মিলি তাঁহার মুখের পানে চাহিতে পারে নাই, নিঃশব্দে স্থানত্যাগ করিল।

এ গতকল্যকার কথা—

আজই সেই জ্যেঠামণি নিমাইয়ের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া পুঁটুর মাকে সাহায্য করিতেছেন দেখিয়া সে আত্মদমন করিতে পারে নাই, তারুণকেই দু কথা শুনাইয়া দিয়াছে।

সেদিন বিকাশের একখানা পত্র আসিয়াছিল—সে পত্রখানা নিমাইয়ের প্রতি কটূক্তিতে পূর্ণ।

সে লিখিয়াছিল—

আমি ওখানকার সম্বন্ধে যে ধারণা করেছিলুম, নিজের চোখে দেখে তার সত্যতা সম্বন্ধে এতটুকু অবিশ্বাস করতে পারি নি। সব চেয়ে বিস্ময়কর ঠেকলো তোমাদের নিমাইকে, তোমরা কি করে যে ওই অশিষ্ট লোকটিকে সহ্য করে ওর ব্যবহার মানিয়ে নাও তা আমি বুঝতে পারি নে।

আমার মনে হয়—সে তোমার প্রতি অনুরক্ত, আমার ধারণা কি সত্য মিল? ওই অসত্যপ্রকৃতি লোকটা যদি তোমায় এতটুকু ভালোবেসে থাকে, আমি তা সহ্য করতে পারবো না জেনো—।

তুমি জানো—আমি তোমায় ভালোবাসি এবং সেই জন্যই তোমায় একান্তভাবে পেতে চাই, সেই জন্যই সে যে তোমায় ভালোবাসবে তা আমি সহ্য করতে পারব না।

সেদিন তোমার জ্যেঠামণির সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। শুনলুম তিনি ওই বর্ব্বরটাকেই ভাবী জামাতারূপে ঠিক করেছেন, শুনে আমার মাথার বিকৃতি ঘটেছিল। নিজের নাম না দিয়ে আমার এক বন্ধুর নাম দিয়ে আমি তোমার সঙ্গে বিয়ের কথা বলেছিলুম, তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন—নিমাইয়ের চেয়ে ভালো ছেলে হলেও তিনি তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন না।

কিন্তু আমি তোমায় চাই মিল—নিজের বলে চাই—এ জন্য আমি সব কিছু করতে রাজী আছি। তোমার সমাজ তোমায় নাই নিক, তাতে কিছু আসে যায় না—আমরা ব্রাহ্ম—এ বিয়েতে কোনো বাধাই নেই।

তুমি ব্রাহ্মণ আমি কায়স্থ—তোমার জ্যেঠামণির দিক হতে—তোমার

সমাজের দিক হতে এদিক দিয়ে আপত্তি উঠলেও আমার দিক দিয়ে কোনো বাধাআপত্তি নেই।

ইত্যাদি অনেক কিছুই বিকাশ লিখিয়া গেছে,—সকল কথার মধ্যে মোট কথা—সে মিলিকে বিবাহ করিবে।

বিকাশের সহিত বিবাহ—

মিলির পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া যায়।

অসহ্য স্পর্দ্ধা বিকাশের—

কলিকাতায় মিলি কোনোদিনই বিকাশের সহিত তেমন নিবিড়ভাবে মিশে নাই কিন্তু এখানে সেই পত্র লিখিয়া বিকাশকে আনিয়াছে, বিকাশের সহিত মেলামেশা করিয়াছে—কিন্তু কেন—?

নিমাইয়ের উপর রাগ করিয়াই নহে কি,—নিমাইকে জ্বালাইবার জন্যই নহে কি? কিন্তু যাহার জন্য মিলি এতখানি আগাইয়া গেল, সে রহিল একেবারে নির্ব্বিকার, মনে হয় না তাহাকে মিলি এতটুকু আঘাত দিতে সক্ষম হইয়াছে।

মিলির চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়ে—

নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন—

মিলি নিজের উপরই রাগ করে—কেন সে বিকাশকে ডাকিল, কেন সে আগুন লইয়া খেলিতে গেল? বিকাশকে সে কোনোদিনই ভালোবাসে নাই, ভালো বাসিতেও পারিবে না। নিমাইয়ের পার্শ্বে বিকাশ, আকাশের চাঁদের সঙ্গে ধরণীর ধূলার তুলনা—? নিমাইয়ের মত উদারতা যদি বিকাশ এতটুকু পাইত, অমন মহান মন যদি সে পাইত—বিকাশ মানুষ হইত, সে সার্থক হইত। এই মহান লোককে মিলি আঘাত করিতে চায় নিজের হীন ক্রুরতা দিয়া, উত্যক্ত করিতে চায় নীচ ব্যবহার করিয়া—ছিঃ—।

মিলি দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরে,—

জানালার বাহিরে দেখা যায় অনন্ত নীলাকাশ—তাহারই নীচে অসংখ্য পাখী ভাসিয়া চলিয়াছে অনির্দ্দেশের পথে—

রাখাল বালক গোয়ালে গরু তুলিতে তুলিতে কীর্ত্তন গাহিতেছিল—

একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর
দিন দুইয়েকের মত—

মিলি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়ে—জোর করিয়া জড়তা দূর করে।

(২৭)

পথ দিয়া চলিতে মিলি হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল; পুঁটুর মায়ের ঘরে কাহার কণ্ঠস্বর শুনা যায়—নিমাইয়ের নয় কি?

দাসীকে সঙ্গে লইয়া মিলি নিমাইয়ের বাড়ীর দিকেই চলিয়াছিল, উদ্দেশ্য ছিল নিমাইয়ের পিসীমার সহিত গল্প করা। তিনি দুইদিন মিলির নিকট আসিয়াছিলেন, মিলিকে তিনি কোলে টানিয়া লইয়া ছিলেন, নিজে তাহার প্রকাণ্ড বড় চুলের রাশি বেণীর আকারে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া গেলে মিলি বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া সেই অদ্ভুত কেশবিন্যাস দেখিয়াছিল, হাসি পাইয়াছিল, তথাপি ইচ্ছা করিয়াই সে খুলে নাই; এই চুল বাঁধার মধ্যে সে অতি কোমল একটি অন্তরের স্নেহস্পর্শ লাভ করিয়াছিল।

এই সরলপ্রকৃতি মানুষটিকে মিলির বড় ভালো লাগিয়াছিল। ইঁহার কাছে মিলি নিমাইয়ের বাল্যকালের সব গল্প খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া শুনিয়াছিল, সে সব গল্প শুনিতে সে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল, ছোটবেলা হইতেই নিমাই এমনই অসীম সাহসী—এমনই ডানপিটে। পাঞ্জাবে

থাকিতে সে নাকি একবার এক ঘুসিতে এক সাহেবের নাক ভাঙ্গিয়া দিয়া ছিল, একবার নদীর দুরন্ত স্রোতে সাঁতার কাটিয়া কতদূর চলিয়া গিয়াছিল; কোথায় কোন পাহাড়ে বাঘ শিকার করিতে গিয়া অসভ্য বুনোদের কাছে পথ ভুলিয়া সাত দিন কাটাইয়া দিয়াছিল—ইত্যাদি।

এ সব বীরত্ব কাহিনী শুনিতে শুনিতে মিলির সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিয়াছিল—।

বাঙ্গালীর ভীরু অপবাদ আছে, বাঙ্গালী নাকি গা ঘামিলে পালায়, অন্তঃপুরে থাকিয়া আত্মরক্ষা করে। কিন্তু নিমাই সেই ছেলে, যে এই অপবাদ খণ্ডন করিতে সমর্থ। মনে পড়ে একদিন বিকাশের সহিত ইডেন গার্ডেনে সে বেড়াইতে গিয়াছিল—তখন সন্ধ্যার মৃদু আঁধার ধরার বুকে নামিয়া আসিয়াছিল। সেই মৃদু আঁধারে মিলি স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিল, দুইজন লোক তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে। ফিরিবার সময় সেই দুইজন লোক একেবারে মিলির উপর আসিয়া পড়ায় বিকাশ পুলিস ডাকিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার কণ্ঠে স্বর ফুটে নাই।

সেদিন বিকাশ না থাকিয়া যদি নিমাই মিলির পার্শ্বে থাকিত—?

মিলি কল্পনায় দেখে—তাহা হইলে কী হইত?

পিসীমার কাছে মিলি শুনিয়াছে—যেখানে অত্যাচার চলে সেখানে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় একা নিমাই, যেখানে ব্যথা, বেদনা, চোখের জল, সেখানে সান্ত্বনা দিতে আছে একা নিমাই।

মিলির মন শ্রদ্ধায় অবনত হয়।

পিসীমা আজ তাঁহার বাড়ীতে মিলিকে চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, মিলি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিয়াছে।

পুঁটুর মায়ের ঘরে নিমাইয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই মিলি থমকিয়া দাঁড়াইল। উৎকর্ণভাবে শুনিল নিমাই বলিতেছে, "ধর্ম্মশাস্ত্রে একটা কথা আছে—

'পাপকে ঘৃণা কর কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করো না।' পাপীকে ঘৃণা করা উচিত নয়, কারণ সেই ঘৃণাই তাকে পাপের পথে অতি দ্রুত নামিয়ে দেয়। মানুষই পাপ কাজ করে, কেউ বলতে পারে না সে জীবনে কোনো পাপ করে নি, সব মানুষই বুদ্ধ বা চৈতন্যদেব হতে পারে না। পাপ ধুয়ে যায় চোখের জলে, প্রকৃত অনুতাপের আগুনে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমি নিজের দিক দিয়ে বলতে পারি আমিও নির্দোষ নই, জীবনে কত পাপ যে সঞ্চিত হয়ে আছে—"

মিলি আর শুনিতে পারে না।

উত্তেজনায় তাহার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। নিমাইয়ের বাড়ী যাইবার বাসনা তাহার সঙ্গে সঙ্গে মিলাইয়া গেল, কোনো ক্রমে বাড়ী ফিরিতে পারিলে সে বাঁচিয়া যায়।

দাসী ডাকিল—"আসুন দিদিমণি—"

নিমাইয়ের বাড়ীর দাসী, শারদার আদেশে মিলিকে লইয়া যাইতে আসিয়াছে; শম্ভুনাথ এ কথা জানিয়াছেন এবং মিলিকে যাইবার অনুমতি দিয়াছেন। দারোয়ান সঙ্গে আসিতেছিল, মিলি তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিলিকে অগ্রসর হইতে হইল। এখন ফিরিতে গেলে অনেকেই অনেক কথা ভাবিবেন, কৈফিয়ৎ চাহিবেন, মিলি কী কৈফিয়ৎ দিবে?

শারদা তাহার প্রতীক্ষাতেই ছিলেন, সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, "এসো আমার মা লক্ষ্মি; আমার ঘরের লক্ষ্মী রূপে এসো মা, আমার ঘর আলো হয়ে উঠুক।"

মিলি মুখ ফিরাইল, নেহাৎ কথা দিয়াছে বলিয়াই সে আসিয়াছে, নচেৎ এ বাড়ীতে সে আসিত না, পথ হইতে ফিরিয়া যাইত। যে অদম্য

উৎসাহ ও আনন্দ লইয়া সে বাড়ীর বাহির হইয়াছিল, তাহা হঠাৎ পথের মাঝে নিভিয়া গেছে।

শারদা চা তৈয়ারী করিতে উঠিলেন, বলিলেন, "তুমি ঘুরে ফিরে ঘর বাড়ী দেখ মা, আমি চা করে আনি, তার মধ্যে নিমাইও এসে পড়বে এখন। তাকে আমি আজ সকাল সকালই ফিরতে বলেছি, এখনই এলো বলে।"

মিলি প্রথমেই যে ঘরটায় প্রবেশ করিল, সেটা নিমাইয়ের—দেখিয়া তাহাই মনে হয়। একপাশে একটা আলনায় নিমাইয়ের কাপড় জামাগুলা এলোমেলোভাবে পড়িয়া আছে, একপাটি জুতা সামনে ও একপাটি খাটের তলায় উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে দেখা গেল। বৃদ্ধা পিসীমা কোনোমতেই কোনো কিছু সুসংবদ্ধ করিতে পারেন নাই, কারণ মানুষটাই ভীষণ এলোমেলো, নীতি বা শৃঙ্খলার ধার সে ধারে না।

কাপড় জামা কয়টা গুছাইয়া রাখার দুর্নিবার ইচ্ছা মনে জাগিয়াছিল, মিলি নিজেকে সংযত করিল ; ছিঃ, কেন সে করিবে, নিমাই তাহার কে ?

টেবিলের উপর কয়েকখানা বই পড়িয়াছিল, মিলি সেইগুলি লইয়া একে একে দেখিতে লাগিল।

দৈবক্রমে একখানা বইয়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল পুঁটুর মায়ের একখানা পত্র।

মিলির হাত কাঁপিয়া উঠিল,—পড়িবে না মনে করিয়াও সে পত্র পড়িল। পুঁটুর মা নিমাইকে তাহার সহিত একবার দেখা করার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছে।

মিলি দাঁতে ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিল, ঠিক সেই মুহূর্তে হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল নিমাই—

"বাঃ, এই যে আপনি এসেছেন মহামায়া দেবী, সত্যি এর জন্যে আমি

ভারি আনন্দিত হয়েছি। আপনার এই নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখে। নিয়ম মানুষের জীবন শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, তাই না আপনার মত নিয়মানুবর্ত্তিতা বজায় রাখবার অনেকবার অনেক চেষ্টা করেও কিছুতে পারলুম না, ঠিক বেনিয়ম হয়ে যাবেই, কিছু মনে করবেন না মহামায়া দেবী, চিরটাকাল ভেতো বাঙ্গালী হয়েই রইলুম, জীবনে উন্নতি করতে পারলুম না।"

গায়ের জামা খুলিয়া আলনার উপর রাখিয়া সে উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিল, "কোথায় গো পিসীমা, খাবার দাবার যা আছে এখানেই নিয়ে এসো, বেজায় ক্ষিধে পেয়েছে। আজ যে সেই সকাল হতে নাম না জানা হরেক রকমের পিঠে তৈরী করলে, সে কি কেবল তুলে রাখবার জন্যেই ? দেওয়ার নামও করছো না যে।"

নিমাইয়ের সুগৌর সুস্পষ্ট নগ্নগাত্র মিলির দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল, ভদ্রতার খাতিরে সে চোখ ফিরাইবার চেষ্টা করিল।

তাহার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া নিমাই অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিল, "কিছু মনে করবেন না মহামায়া দেবী, পাড়াগাঁয়ের লোক আমরা, প্রকৃতির সঙ্গে বাধ্য হয়ে নিজেদের মিল করে চলতে হয়। সেই জন্যেই ভদ্রতার খাতিরে এই গরমেও গায়ে সাতগণ্ডা জামা চড়িয়ে রাখতে পারিনে। ভদ্রতা রাখতে গিয়ে অনর্থক এত কষ্ট পেতে হয় যা আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। বাধ্য হয়ে আপনার সামনেই আমায় গা আলগা করতে হল—এ অপরাধ আশা করছি মার্জ্জনা করবেন।"

খাবারের থালা হাতে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে শারদা বলিলেন, "তবু গায়ে পাতলা গেঞ্জিটা রাখলেও কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো নিমাই ?"

নিমাই মিলির পানে তাকাইয়া বলিল, "এই দেখুন পিসীমার আবদার, ভদ্রতা রক্ষার বালাই। এ কেবল আপনারই জন্যে মহামায়া দেবী, তাই

যে পিসীমা গরমে গায় জামা দেখলে রাগ করে নিজেই খুলে দেন, সেই পিসীমা কিনা নিজেই আমাকে গা খুলতে বারণ করছেন।"

মিলি বলিল, "থাক, আমার জন্যে আপনার অত বড় কষ্ট সইতে হবে না।"

নিমাই পিসীমার পানে তাকাইয়া বলিল, "শোন পিসীমা, যার জন্যে তোমার এত চক্ষু লজ্জা—তাঁরই মুখের কথা শুনে আশ্বস্ত হও। বাস্তবিক আমি আপনার কাছে পরম কৃতজ্ঞ হয়ে রইলুম মহামায়া দেবী, দারুণ গরমে অবিরত ঘামবার কলঙ্ক হতে আপনি আমায় মুক্তি দিলেন।"

পিসীমার হাত হইতে খাবারের থালাটা টান দিয়া লইয়া সে টপাটপ খাবারগুলা নিঃশেষ করিতে করিতে বলিল, "অতি চমৎকার হয়েছে তোমার এই পাটিসাপটা পিসীমা,—খেয়ে দেখবেন মহামায়া দেবী, একবার খেলে আর জীবনে ভুলতে পারবেন না। আমার এই পিসীমাটি কম সে কম হাজার রকমের পিঠে জানেন, তার মধ্যে এই পাটিসাপটাটি আমার কাছে ভারি মুখরোচক লাগে। হাজার হোক—সেকেলে মানুষ তো, রাঁধতে বাড়তে, লোককে খাওয়াতে এঁদের জুড়িদার আর নেই। আপনাদের একালের মেয়েদের কিন্তু এসব শিখে নেওয়া উচিত। যাক, আগে খেয়ে নিন, তারপর এর সমালোচনা করা যাবে এখন। দাও পিসীমা, ওঁর থালাটাও নামিয়ে দাও—খেয়ে নিন মহামায়া দেবী।"

মিলি গম্ভীর মুখে একটু হাসিল মাত্র।

শারদা বলিলেন, "নাও মা, আমি চা আনছি। একসঙ্গে আনলে জুড়িয়ে যাবে বলে আনিনি।"

মিলি বলিল, "আমি খাবার খেয়ে এসেছি, কেবল চা খাব মাত্র। আপনি এগুলো তুলে নিন, একখানা মাত্র আমার হাতে দিন।"

নিমাই যেন আকাশ হইতে পড়িল,—"সেকি, এমন সব খাবার আপনি

খাবেন না, কি ভয়ানক কথা বলুন তো? আচ্ছা, আমি নামগুলো বলে যাচ্ছি, নাম শুনে যেটা আপনার ইচ্ছে হবে খাবেন। এর নাম পাটিসাপটা —আমার সব চেয়ে প্রিয় খাদ্য; এর নাম রসবড়া, ভাজাপুলি, রসের পুলি, গোকুল পিঠে—"

শারদা ধমক দিলেন, তুই থাম নিমাই, কেবল বাজে বকছিস যাতে লোকে জ্বালাতন হয়ে ওঠে। একদণ্ড যদি তোর মুখের কামাই যায়,— কেবল আবোল তাবোল বকিস।"

নিমাই সবেগে মাথা নাড়িল—বলিল, "কথাটাকে বাজে বলো না পিসীমা, বাজে কি কাজের সেটা মহামায়া দেবী বেশ বুঝছেন। ওঁকে বেশী জিদ করে খাইয়ো না পিসীমা, নিজে ইচ্ছে করে যা পারবেন তাই খান, জোর জবরদস্তি করে লাভ কি? ওঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওঁর খাওয়ায় রুচি নেই, শেষটায় বোঝার পরে শাকের আঁটি চাপিয়ে তুমি ওঁর শরীরটা খারাপ করে দিতে চাও নাকি? অমন কাজটি করবেন না মহামায়া দেবী, বরং থালাখানা আমায় দান করুন, আমি সদ্ব্যবহার করছি।"

মিনিট দুইয়ের মধ্যেই সে মিলির থালাখানা নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিল। পিসীমা গালে হাত দিয়া নিঃশব্দে তাকাইয়া রহিলেন, মিলি মুখ টিপিয়া হাসিল।

শারদা একটা দম লইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুই কী ছেলে তাই একবার বল দেখি নিমাই, তোকে নিয়ে যে হলো বেজায় জ্বালা, বিষম বিপদ।"

নিমাই মিলির পানে তাকাইয়া বলিল, "শুনুন ওঁর কেবল জ্বালাই নয়, আমায় নিয়ে আবার বিপদও ঘটলো। খেলুম আমি, তোমার বিপদ ঘটলো কিসে পিসীমা? বেশী খেয়েছি বলে ভাববে, কিন্তু জানোই তো, আমি সাক্ষাৎ অগ্নিদেব, এ পেটে যা কিছু যায়, নিরাপদে সবই ভস্মে পরিণত হয়, অসুখ বিসুখের বালাই আমার আদতেই নেই।"

শারদা নিঃশব্দে চা আনিয়া দিলেন।

মিলি বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

নিমাই বলিল, "জ্যোৎস্না রাত আছে মহামায়া দেবী, আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব, কোনো ভয় নেই। আপনি ততক্ষণ পিসীমার সঙ্গে গল্প করুন, আমি চট করে একটা কাজ সেরে আসি।"

জামাটা টানিয়া লইয়া পরিতে পরিতে সে বাহির হইয়া গেল।

আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মিলি একাই বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য অপেক্ষা করে নাই।

(২৮)

দীর্ঘ দিন কাটিয়া যায়—

একদিনকার কথা—

শম্ভুনাথের নিকট কী দরকার থাকায় মৃদুলাকে তাঁহার নিকটে আসিতে হইয়াছিল। শম্ভুনাথের শরীর আজ কয়েক দিন হইতে ভালো যাইতেছিল না, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পূর্ণ বিশ্রাম লইতে হইয়াছিল, তাঁহার সমস্ত কাজ নিমাই করিতেছিল।

জ্যেঠামণিকে দেখিতে গিয়া মৃদুলাকে দরজার বাহিরে অত্যন্ত দীনার মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মিলি নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না। সে বেশ বুঝিয়াছিল এসব নিমায়েরই কারসাজি। বৃদ্ধ জ্যেঠামণির এই অসুস্থতার সময় দরদ জানাইয়া সেবা করিবার অছিলায় সে-ই মৃদুলাকে এখানে পাঠাইয়াছে।

মাঝে দুই মাস সে এখানে ছিল না, একজামিন দেওয়ার জন্য কলিকাতায় গিয়াছিল। মাসীমা কিছুকাল আগে মারা গিয়াছেন, সে-আশ্রয় না পাইয়া মিলি একটি ছাত্রীভবনে নিজের স্থান ঠিক করিয়া লইয়াছিল এবং সেখান হইতেই পরীক্ষা দিয়াছিল।

পরীক্ষান্তে তাহার এলাহাবাদ বা শান্তিনিকেতন কোথাও যাওয়া হয় নাই, সে যত সত্বর পারে বাড়ী ফিরিয়াছে। এখানে আসিয়াই সে মৃদুলার খোঁজ লইয়া জানিয়াছিল সে আর কোথাও বাহির হয় না, নিজের ঘরেই থাকে।

সেদিন শম্ভুনাথের দরজার কাছে নতমুখী মৃদুলাকে পাইয়া সে অপমান বড় কম করে নাই। মৃদুলা নতমুখে দাঁড়াইয়া সব শুনিয়া গিয়াছিল, নিঃশব্দে সব সহ্য করিয়াছিল। মিলি যখন তাহাকে সেই মুহূর্ত্তে স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছিল, তখন সে তেমনই নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছিল।

শয্যায় শায়িত শম্ভুনাথ সবই শুনিয়াছিলেন। মিলি যখন ঘরে আসিয়া তাঁহার কপালে হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন বোধ করছেন জ্যেঠামণি, মাথায় আর কোনো যন্ত্রনা হচ্ছে কি?"

তখন তিনি চোখ মেলিলেন; ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "ভালোই আছি মা, আজ জ্বরটা আসেনি বলেই মাথায় যন্ত্রনা নেই। বাইরে অত গোলমাল শুনলুম,—কী হয়েছিল, কে এসেছিল মহামায়া?"

মিলি উত্তর দিল, "পুঁটুর মা এসেছিল, আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।"

"ও—" বলিয়া শম্ভুনাথ চুপ করিলেন।

মিলি বলিয়া চলিল, "আমি গতমাস হতে ওর খরচ বন্ধ করে দিয়েছি, বলেছি—ওসব আবদার আর চলবে না। এরকম দানে পুণ্য হয় না জ্যেঠামণি, পাপের প্রশ্রয় দিয়ে পাপের ভাগী হতে হয়। পরের খরচে স্বচ্ছন্দে দিন চলে যায়, মাথায় যত অসার কল্পনা, বদ চিন্তা জাগে। একটা কথাই আছে 'অলস মস্তিষ্ক সয়তানের আবাস স্থল';—সেই শয়তানের হাত হতে আত্মরক্ষা করবার সুযোগ আমি ওকে দিয়েছি জ্যেঠামণি।"

আজকাল প্রায় সমস্ত কাজের ভার মিলি নিজের মাথায় লইয়াছে, দীর্ঘ দিনে সে জমিদারির কাজ অনেক বুঝিয়া শিখিয়া লইয়াছে। শম্ভুনাথের দানের খাতাখানা লইয়া গ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা পাইয়া নিজে অনুসন্ধান করিয়া যাহারা যথার্থ উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী তাহাদের বৃত্তি ঠিক রাখিয়াছে, বরং দুই একটাকা বাড়াইয়াও দিয়াছে। যাহারা অনুপযুক্ত, কেবল ফাঁকি দিয়া আজও দান গ্রহণ করে বলিয়া তাহার ধারণা হইয়াছে, তাহাদের সাহায্য করা সে বন্ধ করিয়াছে।

ইহা লইয়া নিমাইয়ের সহিত তাহার বড় কম মনান্তর হয় নাই। আঘাতের পর আঘাত পাইয়া নিমাই এখন মিলির কোনো কাজেই বাধা দেয় না, মিলি নিজের ইচ্ছামত কাজ করিয়া চলিয়াছে। এতদিন সে কাজও ছাড়িয়া দিত, কেবল নিরীহপ্রকৃতি শম্ভুনাথের পানে চাহিয়া কাজ ছাড়ে নাই। শম্ভুনাথকে সে কোনো কথা জানায় না, নীরবে আসে, নিজের কাজ সারিয়া নীরবেই চলিয়া যায়; আগেকার মত হাসিখুসি, আনন্দ তাহার মধ্যে ছিল না।

শম্ভুনাথ তাহার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন; তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে হাসিয়া সে-প্রশ্ন উড়াইয়া দিয়াছিল,—বলিয়াছিল, বাংলাদেশ তাহার সহ্য হইতেছে না, হয়তো তাহাকে আবার পাঞ্জাবে ফিরিতে হইবে।

বিবাহের কথা মিলির পরীক্ষার তাড়ায় চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, সম্প্রতি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে, মিলি সম্মানের সহিত পাস করিয়াছে এবং আজকাল সে কেবল মিস মিলি চৌধুরী নয়, মিস মিলি চৌধুরী, বি, এ. বলিয়া সাইন করে।

শম্ভুনাথ আবার একদিন বিবাহের কথা তুলিয়া ছিলেন। মিলি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল "পরীক্ষার জন্যে বড় খাটতে

হয়েছে জ্যেঠামণি, আমায় দুই মাস বিশ্রাম নিতে দিন, এর মধ্যে আমি এদিককার কাজকর্ম্মগুলো ভালো করে শিখে নেই। চিরদিন আপনি কিছু জোয়াল নিয়ে চলবেন না, আপনাকে মুক্তি দেওয়া এখন আমার কর্ত্তব্য, তা ছাড়া এ সব দেখে শুনে কাজকর্ম্মগুলো শিখে রেখে দেওয়া আমার উচিত কি না আপনিই বলুন।"

তারণ বিজ্ঞের মত মাথা কাত করিয়া বলিয়াছিল, "ঠিক কথা, মা লক্ষ্মী সত্যি কথাই বলেছেন বাবু, হাজার হোক লেখাপড়া শিখেছেন তো; এতটুকু ভুল হওয়ার যো কি আছে ?"

শম্ভুনাথ ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন একথা ঠিক, কেবল বি, এ. ডিগ্রী পাইলেই যে সব কাজ শেখা যায় তাহা নহে; এ সব কাজ হাতে কলমে শেখা দরকার। পাত্র ঠিকই আছে, যে কোনো মাসে যে কোনোদিন বিবাহটা দিয়া ফেলিবেন ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলেন।

আজ যখন শুনিলেন মিলি পুঁটুর মায়ের খরচ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তখন তিনি বিবর্ণ হইয়া গেলেন, বলিলেন, "তাঁর খরচটা বন্ধ করার মানে তো বুঝলুম না। পুঁটুর বাবা আমার জমিদারির জন্যে বড় কম খাটে নি, তার জন্যে আমার অনেক উন্নতি হয়েছে; তার বিধবা আর একটা মেয়ের সাহায্যের জন্যে সামান্য যে কয় টাকা মাসিক বৃত্তি হিসাবে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল সেটা বন্ধ করার কোনো কারণ ছিল না মহামায়া।"

মিলির মুখখানা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল, "ওদের দিন চালানো যতটা মুস্কিল ভাবছেন জ্যেঠামণি, ততটা মুস্কিল মোটেই নয়। অপাত্রে দান করলে পুণ্যসঞ্চয় হয় না, স্বর্গ লাভ তো হয়-ই না বরং অধোগতি হয়ে থাকে তা তো জানেন ? পুঁটুর বাবা আপনার উপকার করতে পারেন, তার জন্যে আপনিও তাঁকে কম কিছু দেন নি—সে সব খবর আমি নিয়েছি, কিন্তু সেই জের যে আপনাকে চিরকালই টেনে

চলতে হবে তার কি মানে আছে? পুঁটুর মাকে আপনি সাহায্য করবেন কেন, সে কেন মাস মাস জমিদার সরকার হতে এতগুলো করে টাকা পাবে? যারা সত্যকার দুঃখী এসাহায্য পেলে তাদের কতটা কাজ হয় সেটা দেখেছেন কি? আমি ওর সাহায্যটা নিয়ে দিয়েছি ভূপতি কর্ম্মকারকে; সে বেচারা পক্ষাঘাতে অচল অনড় হয়ে বিছানায় পড়ে আছে, কতকগুলো ছেলেমেয়ে তার খেতে পরতে পায় না; তাদের অবস্থা দেখলে সত্যি চোখে জল আসে—কিন্তু দুর্ভাগ্য আপনার নিমাইচন্দর কোনোদিন তাদের দেখতে যান নি। তারা তাঁর কাছে অনেক আবেদন নিবেদন করেছে, সে সব কথা তার কানেও বোধ হয় যায় নি।"

অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়া শম্ভুনাথ বলিলেন—"আঃ, বোঝ না, নিমাইয়ের শরীর ভারি খারাপ, তার মনও তাই ভালো নেই।"

মিলি বিকৃত হাসিয়া বলিল, "ইচ্ছা না থাকলেই মানুষ হেতু খুঁজে বেড়ায়। যাক, তার জন্যে আপনার নিমাইচন্দরকে আমি কিছু বলছি নে জ্যেঠামণি, আমার নিজের তরফের কথাটাই আপনাকে জানাচ্ছি।"

শম্ভুনাথ মাথা চুলকাইলেন, হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল তাঁহার শরীর অসুস্থ এবং তিনি বিছানায় শুইয়া দুই দিন যাবৎ দুধ সাগু খাইতেছেন; চিঁচিঁ করিয়া ডাকিলেন, "তারণ পা খানাতে একটু হাত বুলিয়ে দে বাপু,—"

তারণের আগে মিলিই পায়ের কাছে বসিল এবং পা খানা নিজের কোলে তুলিয়া লইয়া নরম হাতখানা বুলাইতে লাগিল। বি, এ. পাস মেয়ে—শম্ভুনাথ একেবারে আঁতকাইয়া উঠেন—"হাঁ হাঁ, তুমি কেন মা, তুমি কেন—তারণ দিচ্ছে—।"

মিলি বলিল, "কেন জ্যেঠামণি, আমি তো পা টিপতেও পারি। আপনি আমাকে একটা কথাও বলেন না, একটা ফরমাসও করেন না,

তাই আমার বড় রাগ হয়, দুঃখও হয় এই ভেবে—সত্যি যদি আপনি আমায় নিজের মেয়ে মনে করতেন, আপনার সুখ, দুঃখ, বেদনা সব কথাই আমায় জানাতেন। কিন্তু আপনি আমায় এদিক হতে একেবারে বাদ দিয়ে গেছেন জ্যেঠামণি, কোনোদিন নিজেকে আমার কাছে ধরা দিলেন না। তারণ আপনার যে অধিকার পেলে আমি আপনার মেয়ে হয়ে সে অধিকার পেলুম না, আমায় কেবল যক্ষের মত আপনার বিষয়-সম্পত্তি আগলাবার জন্যেই নিলেন।"

আড়ষ্ট শম্ভুনাথ, মিলির মুখে এ সব কী কথা—এ যে ভূতের মুখে রাম নাম—।

পায়ের উপর টপ করিয়া কি পড়িতেই তিনি চমকাইয়া উঠিয়া বসিলেন,—

এক ফোঁটা জল এবং সে যে মিলিরই চোখের জল তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

শম্ভুনাথ আর্ত্তকণ্ঠে কেবল ডাকিলেন—মহামায়া—

মিলি একটা উত্তরও দিল না।

(২৯)

একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, একটা শব্দ হইতেই তাহা ছুটিয়া গেল; চোখ মেলিয়া শম্ভুনাথ দেখিলেন মিলি চলিয়া গিয়াছে, তারণ তাঁহার পাশে বসিয়া বাতাস দিতেছে।

শম্ভুনাথ ডাকিলেন, "তারণ—"

তারণ উত্তর দিল, "বলুন বাবু।"

কণ্ঠস্বর খাদে নামাইয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "ব্যাপার কী বল দেখি তারণ, মহামায়া সত্যিই কি ওদের খরচ বন্ধ করে দিয়েছে?"

তারণ মাথা চুলকাইয়া বলিল, "তাই তো শুনছি।"

"আহা, তবে তো বেজায় কষ্ট হচ্ছে ওদের, বেচারী বিধবা—তারপরে একটা মেয়ে—"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমাকে আবার পাপপুণ্যের উপদেশ দিতে আসে—শোন কথা একবার! ওর বাপকে হাতে করে মানুষ করলুম, ও কিনা আজ নিজেকে কত বড় জ্ঞানী মনে করে। পাপপুণ্য তুই আমায় বুঝাবি কি, তোর চেয়ে আমার বয়েস কত বেশী সেটা একবার দেখেছিস?"

তারণের পানে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, "ওদের দিন কি ভাবে চলছে জানিস কিছু—খোঁজ রাখিস, না কেবল খেয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটাস;—পরের খবর রাখার দরকার কিছু আছে বলে মনে করিসনে?"

তারণ চুপ করিয়া রহিল, এ সময় কথার উত্তর দিতে গেলে হিতে বিপরীত হইবে।

শম্ভুনাথ উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, একথা কি ঠিক আমাদের নিমাই ওদের সব খরচপত্র চালাচ্ছে?"

তারণ বলিল, "আমি তা জানিনে বাবু—।"

দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, "তা জানবে কেন লবাব পুত্তুর গাড়োয়ান, তুমি পিঠে খাও ফোঁড় গণো না। তুমি শুধু খাবে আর ঘুমাবে—এই তোমার কাজ, কোথায় কী হল না হল সে খবরটা নিলে তোমার যে অনেক সময় যাবে। কী রাজকার্য্যই পেয়েছিস তারণ, দিনগুলো বেশ যাচ্ছে যা হোক।"

উপুড় হইয়া পড়িয়া তিনি ঘনঘন হাঁপাইতে লাগিলেন।

তারণ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "পুঁটুর মাকে একবার ডেকে আনব বাবু?"

শম্ভুনাথ সোজা চিৎ হইয়া পড়িলেন, "তা বইকি, সব করেছো, এখন ওইটি করতেই বাকি আছে। বেটা ঘরের ঢেঁকি কুমীর—নেমক হারাম কোথাকার, যাতে আমার সর্ব্বনাশ হয় তাই করবার চেষ্টা তোমার—তা আমি বুঝিনে? চিরকাল আমি মানুষ চরিয়ে আসছি, মানুষ চিনতে আমার বাকি নেই। সেই যে মেয়েটা—ভুল করে যদি চলে গিয়েই থাকে, তার জের কি সারা জীবনটাই তাকে টেনে চলতে হবে, এই কি তার নিয়তি? সে ফিরে এসেছে, সে অনুতপ্ত হয়েছে, এই দুঃখ কষ্ট, অপমান সব সইবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে— সয়েও যাচ্ছে, তার দিকে আর কেউ না চাক, তোর চাওয়া কি উচিত ছিল না তারণ? এই যে খানিক আগে হয়তো তার মাসিক সাহায্যের কথা বলতে আমার দরজায় কী অপমানটাই না সইল, তা কি কানে শুনতে পাস নি? তারপর আধঘণ্টাও যায় নি, তুই কিনা তাকে আবার আমার নাম করে ডেকে আনতে চাস; নিরেট মুখ্যু কোথাকার, তোর জ্ঞানবুদ্ধি ষাট বছর বয়েস হলেও হবে না এ আমি এক কলমে লিখে দিচ্ছি।"

তারণ নিঃশব্দে বাতাস করিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শম্ভুনাথ বালিসের তলা হইতে একখানা দশটাকার নোট বাহির করিলেন, সেখানা মুড়িয়া ছোট করিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "এই নে, এটা তোর কোঁচার এক খুঁটে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে সাঁ করে ওদের বাড়ী চলে যা,—একেবারে পুঁটুর মার হাতে দিবি; একটি কথাও বলবি নে, দিয়েই চলে আসবি। যদি কেউ দেখতে পায়, শুনতে পায়, মহামায়ার কানে যদি একথা যায়, তা হলে তোর নিস্তার নেই মনে রাখিস, জুতো মেরে তোর হাড়গুলো গুঁড়িয়ে দেব।"

তারণের মুখখানা পরম প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল, সে নোট খানা ট্যাঁকে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "কেউ জানতে পারবে না বাবু; আপনার

আশীর্ব্বাদে তারণের কাজ কাকে বকেও জানতে পারে না, মানুষ তো ছার। মা লক্ষ্মীর কানে যদি একথা পৌছায় আপনি জুতো মেরে আমার মুখ ছিঁড়ে দেবেন, আমি একটি টুঁ শব্দ করব না।”

যাইবার জন্য দরজা পর্য্যন্ত গিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল, মিলি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

তারণের সর্ব্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া সে শান্তকণ্ঠে বলিল, “কোথায় এমন ব্যস্তভাবে যাওয়া হচ্ছে তারণ ? জ্যেঠামণি একা থাকবেন এই অসুস্থ অবস্থায় এটা তোমার উচিত নয়।”

তারণ উত্তর দিবার আগেই বৃদ্ধ শম্ভুনাথ মহাব্যস্তভাবে দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, “ওর বিশেষ দরকার পড়েছে তাই একবার বাইরে যেতে হচ্ছে। আমাকে বলে যাচ্ছে, আমি হুকুম দিয়েছি। অসুস্থ আমি এমন কিছু নই, ধরতে গেলে আমি বেশ ভালোই আছি এখন—তোমরাই আমাকে ধরে বেঁধে আড়ষ্ট করে শুইয়ে রেখেছো। আমার সঙ্গে সঙ্গে তারণের পর্য্যন্ত সব কাজ বন্ধ হয়েছে। তুই যা তারণ, তাড়াতাড়ি করে চলে আসবি, একটু দেরী যেন না হয়।”

মিলি একটু হাসিয়া বলিল, “আপনার দরকার আমি বুঝেছি জ্যেঠামণি—”

অকস্মাৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়া শম্ভুনাথ বলিলেন, “তুমি বুঝেছো—?”

মিলি বলিল, “বুঝেছি বই কি। কেউ বুঝি খবর দিয়ে গেছে মথুরা সাহার দোকানে ভালো অম্বুরী তামাক এসেছে, সেই দরকারেই তারণ ছুটেছে—কেমন—নয় কি ?”

তারণ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, নিজে হইতে কী যে বলা চলে তাহাই সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। নানা আজগুবি উত্তর সে ঠিক

করিতেছিল, কিন্তু কোনটা যে ঠিক সমীচীন হইবে তাহাই কেবল ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

শম্ভুনাথও বাঁচিয়া গেলেন, বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, মথ্‌রো সাহা এসে সকালেই জানিয়ে গেছে। যা তারণ, তবু সংয়ের মত দাঁড়িয়ে রইলি—?"

তারণ মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল।

মিলি জ্যেঠামণির মাথার কাছে বসিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "আমাকে লুকানোর কোনো দরকার নেই জ্যেঠামণি, আমি সত্যই সব জানি। ব্যাগটা ফেলে গেছি বলে নিতে আসছিলুম, হঠাৎ শুনতে পেলুম আপনি তারণকে টাকা নিয়ে পৌছে দিয়ে আসবার কথা বলছেন। আমি কি জোর করে বারণ করব জ্যেঠামণি,—সত্যি যদি আপনার প্রাণ কাঁদে—আপনি দেবেন বই কি। আমি সাহায্য বন্ধ করেছিলুম, তার কারণ পুঁটুর মার অভাব নেই।"

শম্ভুনাথ বিস্ময়ে বলিলেন, "অভাব নেই ?"

দৃঢ়কণ্ঠে মিলি বলিল,—"না, আপনার নিমাইচন্দর ওদের সমস্ত ভার নিয়েছেন, সর্ব্বদা দেখাশুনা করছেন—এসব খবর আপনি রাখেন কি ?"

বলিতে বলিতে তাহার মুখ, সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরও বিকৃত হইয়া উঠিল ; মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, "আমি সমস্ত খবর না নিয়ে একজনের সাহায্য বন্ধ করিনি জ্যেঠামণি, শুধু শুধু কারও অভিশাপ আমি কুড়াই নি। আপনি জানেন না—নিমাইবাবু পুঁটুর মাকে এখানে পাঠিয়েছিলেন—আপনার হাতে পায়ে ধরবার জন্যে। আমি জানি—সে দুফোঁটা চোখের জল ফেললেই আপনি গলে যাবেন—সেইজন্যেই তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি।"

শম্ভুনাথ নিঃশব্দে মিলির বিবর্ণ মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। মিলির অন্তরে যে ঝড় বহিতেছিল, মুখে তাহারই ছায়া দেখা যায়—।

তারণ ফিরিয়া আসিল।

তাহার মুখের পানে তাকাইয়া মিলি বলিল, "কী হল, পুঁটুর মা টাকা নিয়েছে কি ?"

তারণ একবার মাত্র মিলির পানে তাকাইয়া চোখ নত করিল।

মিলি বলিল, "আমি আগেই জানি—সে এ টাকা নেবে না—সে ফেরত দেবে।"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল—

"ওষুধটা আর আধঘণ্টা পরে খাওয়াতে হবে তারণ, আমাকে একবার ডেকো—আমি এসে খাইয়ে যাব এখন।"

সে বাহির হইয়া গেল।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শম্ভুনাথ ডাকিলেন—"তারণ—"

তারণ দশটাকার নোটখানা সামনে রাখিল।

(৩০)

গ্রামে টেকা অবশেষে দুষ্কর হইয়া উঠিল।

মৃদুলা ভাবে এখন উপায় কি, মেয়েটাকে লইয়া সে কোথায় যাইবে—কী করিবে ?

দেবনাথ চৌধুরী প্রকাশ্যভাবে তাহার নিকট জঘন্য প্রস্তাব করিলেন, গ্রামের ছেলেরা উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল বড় কম নয়।

মৃদুলা ঘরের ভিতর আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিল।

মুক্তির উপায় তাহার নাই। স্বেচ্ছায় সে যে বন্ধন মানিয়া লইয়াছে, এ বন্ধন কাটিবার কল্পনাও অসহ্য মনে হয়।

সে মরিতে পারে, কিন্তু পুঁটু—

পুঁটুকে সে কাহার হাতে দিয়া যাইবে ?

মৃদুলা ভাবে—।

পুঁটুর অদৃষ্টে যাহাই থাক হইবে, পুঁটুর জন্য সে এ সব অত্যাচার আর সহ্য করিতে পারে না। সে আছে বলিয়াই পুঁটুকে সকলে ঘৃণা করিতেছে, সে না থাকিলে দুঃখিনী বলিয়া পুঁটুকে সকলেই দয়া করিবে, কেহ না কেহ তাহার ভার লইবে, ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব একটি মানুষ যে না খাইয়া মরিবে তাহা কেহই দেখিবে না। পুঁটুর ভবিষ্যৎ পুঁটুরই থাক, পুঁটুর মা তাহার বর্ত্তমান লইয়া সরিয়া যাক—অতীত হোক।

কাজে যাইবার পথে সেদিন প্রত্যহকার মত নিমাই যখন আসিয়াছিল, তখনও মৃদুলা শুইয়াছিল।

পুঁটু ডাকিল "মা, নিমাইদা এসেছেন—।"

মৃদুলা উঠিয়া বসিল।

রুক্ষ চুলগুলি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেগুলি দুই হাতে জড়াইয়া বাঁধিয়া সে মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল। এই চুলের রাশি সে কতবার কাটিতে গিয়াছে, পুঁটু কাঁদিয়া কাটিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছে।

কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া সে ডাকিল, "এসো, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা দরকারী কথা আছে বাবা—।"

অনেকদিন পরে সে আবার নিমাইকে এই স্নেহসম্বোধন করিল। নিমাই দরজার উপর দাঁড়াইয়াছিল, ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আপনি নাকি কোথায় চলে যাবেন পুঁটু বলছিল? আবার কোথায় যাওয়া ঠিক করছেন বলুন দেখি? না না, ওসব পাগলামী আর করবেন না, যেমন আছেন তেমনই আপনাকে থাকতে হবে, একথা আপনাকে বলে রাখছি।"

মৃদুলা হাসিতে গিয়া ঝর ঝর করিয়া কতকটা চোখের জল ফেলিল, বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "এত অপমান সয়ে আরও এখানে থাকতে বল নিমাই, —আমার যে অসহ্য হয়ে উঠেছে বাবা, আর একমুহূর্ত্ত আমি এখানে টিকতে

পারছিনে। যাওয়ার জায়গার কি অভাব আছে? দুনিয়া কেন,—দুনিয়ার বাইরেও তো অনেক জায়গা আছে যেখানে গেলে মানুষের সকল জ্বালা জুড়িয়ে যায়।"

নিমাই মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, "জ্বালা যেখান হতে ওঠে, সেইখানেই তো নিবৃত্ত হতে পারে?"

মৃদুলা মাথা নাড়িল, বলিল, "তা হয় কই? কাটা ঘায়ে ওষুধ দিতে না দিতে লোকে যে আবার খুঁচিয়ে দেয়, তাতে জ্বালা যন্ত্রণা না কমে আরও যে দ্বিগুণ জ্বলে ওঠে।"

নিমাই বলিল, "বুঝেছি, কিন্তু আপনি তো জ্বালা জুড়াবেন, আপনার পুঁটুর কোনো ব্যবস্থা করে রেখে যাবেন না,—ওকে কোথায়—কার হাতে দিয়ে যাবেন?"

পুঁটুর ব্যবস্থা,—

মৃদুলা চোখ মুছিতে লাগিল, যতবার চোখ মুছে, অবাধ্য চোখের জল ততবারই ঝরিয়া পড়ে। কান্নাঝরা স্বরে সে বলিল, "ওকে আমি তোমাদের হাতে দিয়ে যাচ্ছি নিমাই, ওর জীবনের পথ নির্দ্দেশ করবে তোমরাই; দেখে শুনে ওর বিয়ে দিয়ো, তোমাদের সংস্পর্শে রেখে ওকে মানুষ করো, আমার মত ওর জীবনের পথ যেন দুর্গম না হয়। ওর রক্ত বিশুদ্ধ, ও ওর বাপের মেয়ে, ওর মা সতী ছিল, মায়ের কলঙ্ককালিমার মধ্যে ওর জন্ম হয় নি। সুশিক্ষা আর সৎসাহচর্য্য পেলে ও তোমার দেশের আদর্শ মেয়ে সীতা সাবিত্রী হতে পারবে, যাদের অতীত ও বর্ত্তমান মহিমামণ্ডিত, ভবিষ্যৎ যাদের জন্য ইতিহাস সঞ্চয় করছে।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "তোমরা আজ বিশ্বাস করবে কিনা জানিনে, আমি ওকে মানুষ করবার আশা নিয়েই কলকাতায় গিয়েছিলুম। আমার দুর্ভাগ্য ওকে মানুষ করবার কোনো উপায় আমি

খুঁজে পেলুম না, এতটুকুর ভুলে নিজের যথাসর্ব্বস্ব হারিয়ে আমি ফিরলুম আমারই সেই ত্যক্ত স্থানে। আজ আমায় সব কথা বলতে দাও, আমায় বাধা দিয়ো না নিমাই, আমি—"

নিমাই অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "আপনি আর যার কাছে খুশি আপনার স্বীকারোক্তি দেবেন, মিনতি করছি আমায় কিছু বলবেন না।"

মৃদুলা অদ্ভুত হাসি হাসিল, "তা বললে কি হয়,—মায়ের কলঙ্ক সন্তানকে শুনতে হয়, সইতেও হয়। অন্যের কাছে বলি বা না বলি, তোমায় যখন পেয়েছি, আমার কাহিনী আমায় বলতে দাও। আমি যতক্ষণ অন্ততঃ একজনের কাছেও আমার পাপের কাহিনী না বলতে পারব ততক্ষণ শান্তি পাব না। হ্যাঁ, শোন, আমি গিয়েছিলুম আমার পুঁটুর জন্যে—সে বড় হবে, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, এই আশা আমার মনে জেগেছিল। সে দশজনের একজন হবে, আমার জন্মগত পাপের দণ্ড যেন তাকে না বইতে হয়—শুধু সেইজন্যে নিমাই, শুধু সেইজন্যে আমি গিয়েছিলুম। কিন্তু কিছু হল না, আমি স্বেচ্ছায় বাঘের গুহায় প্রবেশ করেছিলুম, সে আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে আমায় কাঙালিনীর অধম করলে।"

নিমাই অন্যমনস্কভাবে কোনদিকে তাকাইয়া রহিল। মৃদুলা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিতে লাগিল, "সাময়িক দুর্ব্বলতা আমার এসেছিল, যে মুহূর্ত্তে আমার নিজের কথাও আমার মনে ছিল না। সেই মুহূর্ত্তে আমি হারিয়ে ফেললুম আমার সব, আমার বর্ত্তমান, আমার অতীত, আমার ভবিষ্যৎ—"

নিমাই বলিল, "আপনি কি শুধু এই সব কথাই বলবেন?"

মৃদুলা বলিল, "না, এইখানেই আমি শেষ করছি। কিন্তু এই বর্ত্তমান আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে নিমাই, আমি নিজেকে নিজে ঘৃণা

করি অথচ কলঙ্কিনী মায়ের গর্ভজাতা হয়েও একদিন নিজেকে দেবতার নির্মাল্য বলে ধারণা করতে আমার বাধে নি। একদিন যার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে একটি কথা বলতে সাহস করে নি, আজ তারই সামনে দেবনাথ চৌধুরী, দেবল চৌধুরী, মতি হাজরার মত লোকেরাও জঘন্য প্রস্তাব করে, বিদ্রূপ করে—"

নিমাই চেঁচাইয়া উঠিল, "এ অসহ্য—"

আর্দ্রকণ্ঠে মৃদুলা বলিল—"তাই, আর সেইজন্যেই আমি সরে যেতে চাচ্ছি বাবা। আমার কেউ নেই যে আমাকে রক্ষা করতে পারে, যে বুক পেতে সকল আঘাত সয়ে আমাকে আড়াল করে রাখতে পারে।"

মৃদুলার ফুলের পাপড়ির মত অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল।

নিমাই অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর মাথা তুলিল, "আপনাকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমায় দিন, আমি আপনাকে রক্ষা করব।"

মৃদুলা বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "পাগল, আমাকে আশ্রয় দিয়ে তোমার যে কতখানি লাঞ্ছনা সইতে হচ্ছে তা কি আমি জানিনে? আজ প্রত্যেকে তোমায় কী না বলছে, কত বড় অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে তবু তুমি প্রতিদিন এখানে আসছো, তাও কি আমি জানিনে? তোমার পিসীমা পর্য্যন্ত তোমায় যথেষ্ট কথা বলছেন, তোমার বাকদত্তা স্ত্রী পর্য্যন্ত—"

আরক্তমুখে নিমাই বলিয়া উঠিল, "কে আমার বাকদত্তা স্ত্রী, আপনি কার কথা বলছেন? আপনিও আর পাঁচজনের মত ভুল ধারণা করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাটা মনে করুন—আমি চাকর, তিনি আমার মনিব, তিনি আদেশদাত্রী আর আমি শুধু আদেশ পালন করে যাই। হতে পারে মহামায়া দেবী শিক্ষিতা, ধনী, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব আমি ঘুচাতে পারব না বলেই তাঁর স্বামী হতে আমি চাইনে। পিসীমা লোকের

কথা শুনে বিরক্ত হয়ে পড়েছেন তাই তিনি বাংলা ছেড়ে আমাকে নিয়ে চলে যেতে চাচ্ছেন দূর পাঞ্জাবে, যেখানকার স্বভাবের সঙ্গে আমার স্বভাব মেলে।”

“পাঞ্জাবে—”

মৃদুলা যেন তাহার শেষ অবলম্বনটুকুও হারাইয়া ফেলে।

নিমাই দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, “হ্যাঁ পাঞ্জাবে, আমি নিজেই সেখানে যেতে চাই কারণ বাংলার জলবায়ু আমার স্বভাবের অনুকূল নয়, বাংলাকে আমি সইতে পারছিনে। আপনি নিশ্চিন্ত হোন, সেখানে কেবল আমি আমার পিসীমাকেই নিয়ে যাব না, আপনাকেও আপনার উপযুক্ত সম্মান দিয়ে নিয়ে যাব।”

মৃদুলা মলিন হাসিল, বলিল, “আমার উপযুক্ত সম্মানটা কী?”

নিমাই উত্তর দিল, “আমার মায়ের আসন আপনি গ্রহণ করুন মা, আপনার ছেলের ঘরে আপনি নিঃসঙ্কোচে যেতে পারবেন। আপনার জন্যেই আমি আপনার পুঁটুকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করব, তাহলে আপনার সঙ্গে আমার সত্যকার সম্পর্ক গড়ে উঠবে মা, সে সম্পর্কতো অস্বীকার করতে পারবেন না।”

“নিমাই—”

মৃদুলা আর্তভাবে চীৎকার করিয়া উঠিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

নিমাই রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, “এ ছাড়া আপনাকে রক্ষা করবার আর যে কোনো উপায় নেই মা—”

মৃদুলা মুখ হইতে হাত সরাইল,—ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, “তাকে পতিতা মায়ের মেয়ে জেনেও স্ত্রীরূপে তুমি গ্রহণ করতে পারবে নিমাই, কোনোদিন তাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে? তার দিদিমা কুলত্যাগ করে